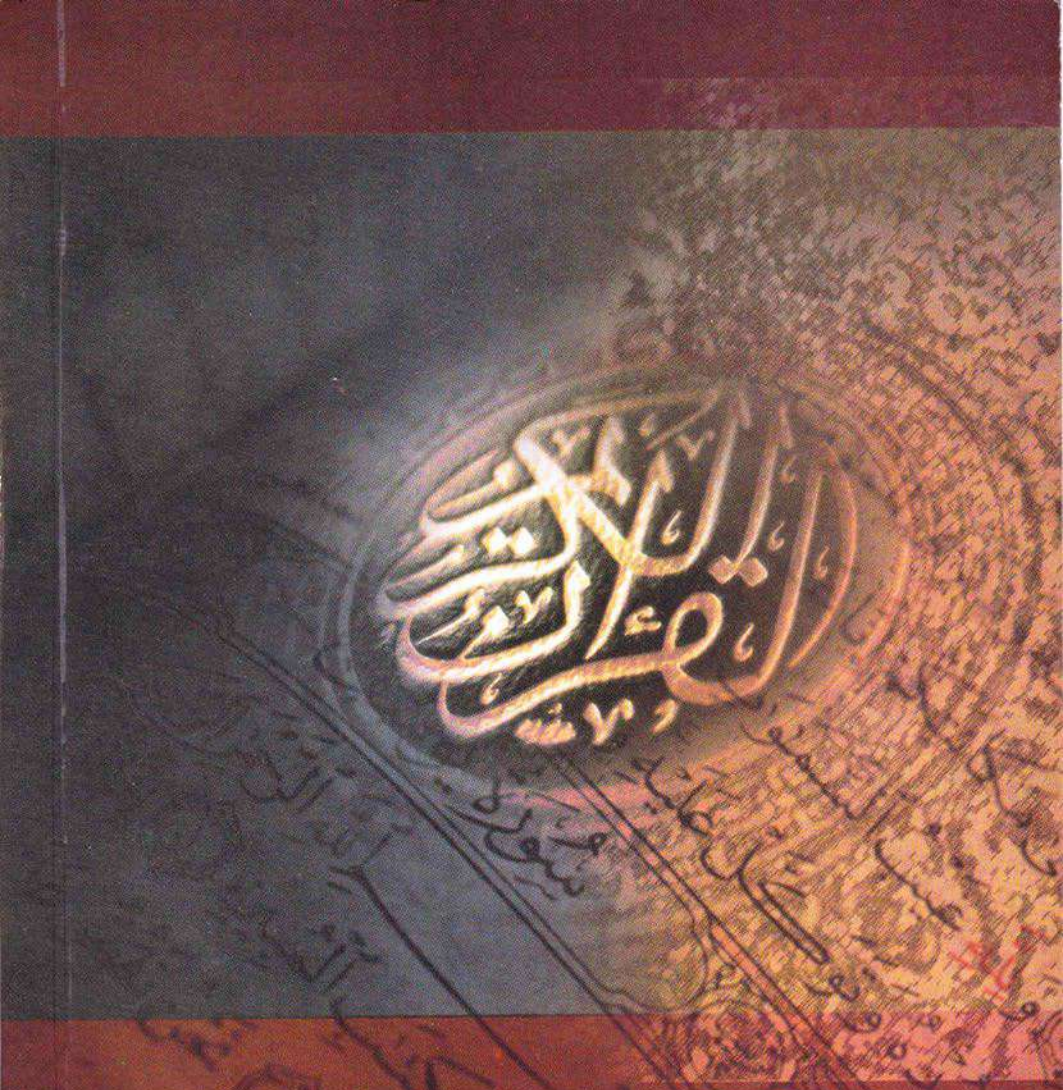


স্রষ্টার সর্বশেষ প্রত্যাদেশ
আল কুরআন

ডঃ লরেন্স বি. ব্রাউন

www.callingtotheone.com

স্রষ্টার সর্বশেষ প্রত্যাদেশ

আল কুরআন

The Qur'an

God's Last Testament

মূল:
ডঃ লরেন্স বি.ব্রাউন

ভাষান্তর:
উম্মে তাহ্‌যিন

পরিবেশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর, ২০১১ সাল
যুলহিজ্জা, ১৪৩২ হিজরী

প্রচ্ছদ
আসমা নাজ

মুদ্রণ :
হেরা প্রিন্টার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা

পরিবেশনা
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
email : tawheedpp@gmail.com
Web : www.tawheedpublications.com

নির্ধারিত মূল্য : ১২০/-টাকা মাত্র

Distributed by:
Tawheed Publications
email : tawheedpp@gmail.com
Web : www.tawheedpublications.com
1st Edition: September 2011, Price: Tk.120 /-, US$ 10/-

ISBN No: 978-984-8766-80-2

PDF Courtesy: www.callingtotheone.com

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ﴾

"এখনও কি সময় আসেনি যে,আল্লাহর স্মরণ এবং যে সত্য তাদের নিকট এসেছে তাতে মুসলিমদের অন্তর কেঁপে উঠবে এবং তারা ঐ সব লোকের মত হবে না যাদেরকে তাদের পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল? কিন্তু কিছুকাল অতিবাহিত হতেই তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গিয়েছিল এবং অধিকাংশ লোক অবাধ্য হয়ে পড়েছিল"।

(ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, সুরাহ হাদীদ:১৬)

লেখক পরিচিতি

খ্রিষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণকারী ডঃ লরেন্স বি. ব্রাউন জীবনের পরম সত্য অনুসন্ধানের এক পর্যায়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় (Cornell University) থেকে বি.এ ডিগ্রী এবং ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় (Brown University Medical School) থেকে এম.ডি ডিগ্রী অর্জন করে তিনি জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল (George Washington University Hospital) থেকে চক্ষু চিকিৎসাবিদ্যায় রেসিডেন্সি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। আমেরিকান বিমান বাহিনীতে দীর্ঘ আট বছর চক্ষু চিকিৎসক হিসেবে তিনি কর্মরত ছিলেন। এছাড়া ডঃ ব্রাউন ইংল্যান্ডের লেইকেনহিথ বিমান বাহিনী ও ফ্লোরিডায় এগলিন বিমান বাহিনীতে (উন্মুক্ত বিশ্বের সবচেয়ে বড় সামরিক ঘাঁটি) চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞের পদে নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে তিনি পবিত্র শহর মদীনায় (সৌদি আরব) অবস্থিত মাগরাবী চক্ষু কেন্দ্রে চিকিৎসা পরিচালক ও প্রধান চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মরত আছেন।

ডঃ ব্রাউনের লেখা বইগুলোর মধ্যে অন্যতম -The First and Final Commandment - A Search for Truth in Revelation Within The Abrahamic Religions, MisGod'ed, God'ed, Bearing True Witness, The Eighth Scroll ইত্যাদি। মধ্যপ্রাচ্যে ও প্রাচ্যে ব্যপক ভ্রমণে অর্জিত মূল্যবান অভিজ্ঞতার আলোকে এ গ্রন্থগুলো রচিত হয়েছে। অনুবাদের ফলে মূল লেখনীর সাহিত্যমান অনেকখানি ক্ষুন্ন হয়। আগ্রহী পাঠক লেখকের উঁচু মানের সাহিত্যরস পুরোপুরি আস্বাদন করতে চাইলে www.leveltruth.com ওয়েবসাইট থেকে ইংরেজী ভাষায় মূল বইগুলো পড়ে নিতে পারেন।

PDF Courtesy: www.callingtotheone.com

বাংলাভাষী পাঠকদের উদ্দেশ্যে লেখকের বাণী

It is with great pleasure that I welcome the translation of this section of my book "The First and Final Commandment - A Search for Truth in Revelation Within The Abrahamic Religions", into the Bengali language. I believe one of the greatest pleasures authors can have is to see their works appreciated. Translating into a foreign language expands the number of people who will benefit, so it is my hope that this will not only prove useful to all Bengalis, but that it will also inspire others to continue this effort and spread the valuable information contained herein.

Dr. Laurence B. Brown

আমার "The First and Final Commandment - A Search for Truth in Revelation Within The Abrahamic Religions", বইটির অংশ বিশেষ নিয়ে প্রকাশিত এ বাংলা অনুবাদ গ্রন্থটিকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে স্বাগত জানাচ্ছি। আমার বিশ্বাস, কোন লেখকের জন্যে সবচেয়ে আনন্দময় ব্যাপার তখনই ঘটে যখন তার লেখনী পাঠকের কাছে সমাদৃত হতে দেখেন। ভিন্ন ভাষায় অনূদিত হলে বইয়ের পাঠকের সংখ্যা বেড়ে যায়, ফলে অনেক বেশী লোক তা থেকে উপকৃত হয়। আশা করি, এ বইটির উপকার শুধুমাত্র বাঙ্গালী পাঠকদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং এর মূল্যবান তথ্য সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবার এ প্রয়াস অন্যান্য ভাষাভাষীদের জন্যও অনুপ্রেরণার কারণ হবে।

-ডঃ লরেন্স বি. ব্রাউন

অনুবাদকের নিবেদন

সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা মহান প্রভু আল্লাহর (ﷻ) জন্য, যিনি রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) এর উপর সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। অসংখ্য সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী ও রসূল মুহাম্মদ (ﷺ) এর প্রতি, যিনি স্রষ্টার অক্ষয় বাণী মানবজাতিকে পৌছিয়ে দেবার গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন পরিপূর্ণভাবে।

ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের সুখ-সাফল্য নিহিত 'সত্য'কে জানবার ও অনুসরণ করার মধ্যে। অথচ 'সত্য কী' - তা সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী নশ্বর মানুষের পক্ষে নির্ধারণ করা অসম্ভব। তাই প্রজ্ঞাময় সৃষ্টিকর্তা মানবজাতির জন্য যুগে যুগে তাঁর বাণী সম্বলিত অগণিত আসমানীগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন সম্মানিত রসূলদের মাধ্যমে। আল্লাহর বাণী আগমনের এ ধারাবাহিক সূত্র শেষ হয়েছে 'কুরআন' অবতরণের মধ্য দিয়ে। সত্যের স্মারক কুরআন আল্লাহর পথনির্দেশনা, সত্য-মিথ্যা-ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যকারী। এ আলোকবর্তিকাকে যে পিছনে ফেলে রাখে সে ধ্বংস হয়ে যায়। কুরআন ছেড়ে যে অন্য হিদায়াত অনুসন্ধান করে আল্লাহ তাআলা তাকে পথভ্রষ্টতায় ছেড়ে দেন, আর একে যে অনুসরণ করে সেই সঠিক পথ পায়।

প্রথম থেকেই ইসলামের কট্টর সমালোচকরা মুহাম্মদ (ﷺ) এর নব্যুয়তকে অস্বীকার করার পাশাপাশি নানা অপবাদ আরোপ করে চরিত্রহানীর কৌশল প্রয়োগ করে এসেছে। অথচ কুরআন মুহাম্মদ (ﷺ) এর নবুয়্যতের জ্বলন্ত প্রমাণ। মহিমাময় কুরআন স্রষ্টার অবিকৃত বাণী বলে প্রমাণিত হলে মুহাম্মদ (ﷺ) এর নব্যুয়তের সত্যতাও আপনা আপনি দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ কুরআন এক সার্বজনীন ও চিরন্তন মু'জিযা, প্রত্যেক প্রজন্ম এর কালোত্তীর্ণ অলৌকিক নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছে। এর বিস্ময় যেন শেষ হবার নয়।

ডঃ লরেন্স বি. ব্রাউন রচিত "The First and Final Commandment - A Search for Truth in Revelation Within The Abrahamic Religions" বই থেকে মহিমাময় কুরআনের উপর লেখা কয়েকটি অধ্যায়ের অনুবাদ নিয়ে বক্ষমান বইটি প্রকাশিত হল। এ বইতে লেখক কুরআনের বিভিন্ন

ঐশী প্রমাণের উপর আলোকপাত করে সত্যাশ্রয়ী, বোধশক্তি সম্পন্ন মানুষকে সত্যের আহ্বান জানিয়েছেন। মুসলিম-অমুসলিম সবাই এ বই থেকে উপকৃত হবে বলে আশা করি। অনুবাদ গ্রন্থে ব্যবহৃত কুরআনের বঙ্গানুবাদ সংকলিত হয়েছে ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান অনূদিত "বাংলা তাফসীর - কুরআনুল করীম" থেকে।

অনুবাদটি প্রকাশের অনুমতি দেবার জন্য মূল লেখককে, প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে এবং বইটির প্রচ্ছদ পরিকল্পনার জন্য সুহৃদ আসমা নাজকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পরম করুণাময় আল্লাহর (ﷻ) কাছে প্রার্থণা, তিনি যেন আমাদের হৃদয়ের সংকল্পকে শুধুমাত্র তাঁরই জন্য বিশুদ্ধ করে দেন এবং সামান্য এ প্রয়াসটিকে গ্রহণ করে মহাবিচারের ভয়াবহ দিনে তাঁর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম করে দেন। আমীন।

উম্মে তাহ্‌যীন

২১শে রমাদান, ১৪৩১ হিজরী

৩০শে আগষ্ট, ২০১০ সাল

বিষয়সূচি

কুরআনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	9
প্রমাণ - উপক্রমণিকা	25
প্রথম প্রমাণ - কুরআনের অনির্বচনীয় আবেদন	27
দ্বিতীয় প্রমাণ - কুরআনের অনন্য সাহিত্যগুণ	37
তৃতীয় প্রমাণ - কুরআনের বর্ণনায় অতীতের ঘটনা	59
চতুর্থ প্রমাণ - ওহীর সাথে সমকালীন ঘটনার সম্পর্ক	80
পঞ্চম প্রমাণ - ওহীতে অনাগত কালের চিত্র	88
ষষ্ঠ প্রমাণ - অজানা বিষয়ের ওহী	112
আলোচিত প্রমাণের সারসংক্ষেপ	153

কুরআনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

"One reason that history repeats itself is that so many people were not listening the first time."
--Margaret Hussey

"ইতিহাসের যে পুনরাবৃত্তি ঘটে তার একটি কারণ, প্রথম বার অনেকে এতে কর্ণপাত করেনি"। -মারগারেট হাসি

কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে, ঈসা মসীহ (ﷺ) এর ধর্ম প্রচারের প্রায় ছয়'শ বছর পর। দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে কুরআনের প্রতিটি শব্দ আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ (ﷺ) এর হৃদয় ও ওষ্ঠে হুবহু স্থাপিত হয়েছিল বলে মুসলিমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। অন্যদিকে অমুসলিম সমালোচকদের মধ্যে অনেকে মুহাম্মদ (ﷺ) এর নবুয়্যতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে নানা রকম অভিযোগ উত্থাপন করেই চলেছে। তাঁর উপর অতীতের আসমানীগ্রন্থগুলো থেকে নকল, প্রতারণা, মিথ্যাচার ও অলীক কল্পনার অপবাদসহ নানা ধরনের অপপ্রচার চালানো হয়েছে। এদের কেউ বলেছে, তিনি (ﷺ) একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী ব্যক্তির বেশী আর কিছু ছিলেন না। আবার কিছু লোক এতদূর পর্যন্ত লিখেছে যে, মুহাম্মদ (ﷺ) মৃগী রোগগ্রস্ত ছিলেন; আর কুরআন হচ্ছে বিকারগ্রস্ত অবস্থায় তাঁর অসংলগ্ন কথাবার্তার সংকলিত রূপ।

ওহী অবতরণের সময় মুহাম্মদ (ﷺ)র মুখমন্ডল আর শরীরে যে ধরণের পরিবর্তন দেখা যেত, ঐতিহাসিক লিপি থেকে আমরা তার বেশ কিছু বর্ণনা পাই। নবী-পত্নী আয়েশা (رضي الله عنها) র বিবরণে দেখা যায় যে, সে সময় মুহাম্মদ (ﷺ) ভীষণভাবে ঘামতেন, প্রচন্ড শীতেও যার ব্যতিক্রম হত না। মুহাম্মদ (ﷺ) এর নিষ্কলুষ চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের চেষ্টায় যারা ব্যাপৃত, আয়েশা (رضي الله عنها) এর এ বর্ণনা থেকে তারা মনগড়া যা ইচ্ছা সিদ্ধান্তে আসতে পারে। কিন্তু এ মহান ব্যক্তিত্বের (ﷺ) বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার ব্যাপারে সংশয়হীন ব্যক্তি মাত্রই একথা স্বীকার করবে যে, ওহী লাভের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ফলে নশ্বর মানুষের অবয়বে উল্লেখযোগ্য দৈহিক লক্ষণ ফুটে ওঠা যে শুধু স্বাভাবিক তা-ই নয়, বরং সেটাই প্রত্যাশিত।

গভীর আধ্যাত্মিক বোধের মুখোমুখি হয়ে এমনিতেই মানুষ নানা রকম অস্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে, যেমন - হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি, ত্বকে শিরশিরে অনুভূতি, রোম খাড়া হওয়া, মেরুদন্ডে শীতলতা বোধ, ইন্দ্রিয়ের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। আর স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধির (জিবরীল ﷺ) সাথে সাক্ষাতের মত শক্তিশালী অভিজ্ঞতা কোন মানুষের মধ্যে যে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তা তো সহজেই অনুমেয়। সুতরাং ওহী অবতরণের সময়ে ঘর্মাক্ত ভ্রূ, মুখমন্ডলে গভীর একাগ্রতার চিহ্নসহ যে সমস্ত বর্ণনা আমরা মুহাম্মদ (ﷺ) সম্পর্কে পাই তা কোনভাবেই অস্বাভাবিক নয়। ক্লাবে বসে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে আয়েসী ভঙ্গীতে কোন নশ্বর মানুষ আসমানীদূতের সাথে সহজ-স্বচ্ছন্দভাবে আলাপচারিতা চালাবে, এমনটা কল্পনা করাই বরং কষ্টকর। বহু লোক আছে যারা অফিস-কর্তার মুখোমুখি হলে ঘামতে শুরু করেন। সমস্ত কর্তার যিনি সৃষ্টিকর্তা, সেই মহান আল্লাহর (ﷻ) মুখোমুখি হলে এরকম ব্যক্তির স্নায়বিক অবস্থা কী দাঁড়াবে তা বলা মুশকিল। তাছাড়া যারা মৃগীরোগী দেখেছেন তারা ভালভাবেই জানেন যে,বিকারগ্রস্ত অবস্থায় মৃগীরোগীর পক্ষে সুচিন্তিত, বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলাটা অকল্পনীয়। এমনকি বিকার কেটে যাবার পরও কিছুক্ষণ রোগীর পক্ষে স্বাভাবিক কথাবার্তা চালানো সম্ভব হয় না। এ প্রসঙ্গে ডব্লিউ মন্টগোমারি ওয়াট মন্তব্য করেছেন,

> "ইসলামের প্রতিপক্ষরা প্রায়ই দাবী করে যে, মুহাম্মদ মৃগী রোগগ্রস্ত ছিলেন। অথচ তাঁর উপসর্গগুলোর কোনটাই মৃগীরোগীর মত নয়। এ রোগে রোগীর দৈহিক ও মানসিক ভারসাম্য ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যায়। অথচ মুহাম্মদের কর্মক্ষমতা ও মানসিক শক্তি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্যি বলে ধরে নেয়া হলেও বলা যায় যে, অজ্ঞতা ও অন্ধ সংস্কারের উপর গড়ে ওঠা প্রতিপক্ষের এ সমস্ত যুক্তি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কেননা মৃগীরোগের মত শারীরিক অসুস্থতার সাথে ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বৈধতা কিংবা অবৈধতা প্রমাণের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না"[1] ।

---

[1] Watt, W. Montgomery. 1953. *Muhammad at Mecca*, Oxford: Carendon Press. P. 57

কুরআনের বিপক্ষে কুৎসা ও নিন্দা রটনায় অকুণ্ঠ অনেকের ভীড়ে হার্টউইগ হার্শফেল্ড অন্যতম নাম। তিনি তার "New Researches into the Composition and Exegesis of the Qoran with words" বইতে মন্তব্য করেছিলেন,-"ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কুরআন প্রকৃতপক্ষে বাইবেলেরই নকল"[2]। এমন ব্যক্তি পর্যন্ত মুহাম্মদ (ﷺ) সম্পর্কে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে,

> "ইসলামের উৎপত্তি নিয়ে মৃগীরোগ কিংবা ঐতিহাসিক তথ্যের প্রভাব সম্পর্কে যা প্রচার করা হয় তার আর কী বাকি রইল? কিছুই না। ইতিহাসে কোন মানুষ এমন সতর্ক ও সচেতন একটি বাক্যও উচ্চারণ করেনি, যেমন করেছেন মুহাম্মদ তাঁর 'ইক্‌রা'য়। তিনি যদি কেবল নবী হবার দাবী নিয়ে তা না করতেন, তবে নিঃসন্দেহে তিনি হতেন পৃথিবীর বুকে জন্মানো শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান মানুষ"[3]।

মুসলিমরা কিন্তু এ ব্যাপারে সংশয়হীন যে, মুহাম্মদ (ﷺ) এর মুখে উচ্চারিত 'ইক্‌রা' (মহিমান্বিত কুরআন, সুরাহ্ নং ৯৬) তাঁর নিজস্ব কোন রচনা নয়। তিনি (ﷺ) তো কেবল স্রষ্টার পাঠানো ওহীর পুনরাবৃত্তি করেছেন। মুসলিমদের এ বিশ্বাসের সাথে হার্শফেল্ড একমত না হলেও তিনি একথা অস্বীকার করেননি যে, মুহাম্মদ (ﷺ)এর উপর আনা মৃগীরোগ ও উন্মাদনার অভিযোগ পরিষ্কার মিথ্যা অপবাদ যা কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।

মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর প্রবঞ্চনার যে অভিযোগ আনা হয়ে থাকে, তা-ও একইভাবে খণ্ডন করা সম্ভব। প্রথম ওহী অবতরণের সময় মুহাম্মদ (ﷺ) নিজেই এ অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। জিবরীল (عليه السلام) এর সাথে প্রথম সাক্ষাতের ঘটনা এত ভীতিকর ও আকস্মিক ছিল যে, তিনি (ﷺ) দিশাহারা হয়ে আশ্রয় খুঁজতে শুরু করেন। New Catholic Encyclopedia-তে বলা হয়েছে, "মুহাম্মদ স্বয়ং এ ধরণের অভিজ্ঞতার সামনে আতঙ্কগ্রস্ত, সংশয়ী ও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিলেন। স্ত্রী-স্বজনদের কাছ থেকে আশ্বস্তি পাবার পরই তাঁর (ﷺ) প্রত্যয় জন্মালো যে, সত্যি সত্যিই তিনি পরাক্রমশালী স্রষ্টার

---

[2] Hirschfeld, Hartwig, Ph.D. 1902. *New Researches into the Composition and Exegesis of the Qoran with words*. London: Royal Asiatic Society. Preface, ii.

[3] Hirschfeld, Hartwig. P. 32

ওহী লাভ করেছেন"[4] । অথচ সত্যি সত্যি কেউ বিভ্রান্ত হয়ে থাকলে তার কাছে অকাট ভ্রান্তিও অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হবার কথা (ফলে ভ্রান্তি তার মধ্যে কোন অস্বাভবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না)। চিন্তাশক্তির অসংলগ্নতার কারণে অবাস্তব ও অদ্ভুত বিষয়ও নির্লিপ্তভাবে মেনে নেয়া বিভ্রান্ত ব্যক্তির লক্ষণ (নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ ﷺ এর ক্ষেত্রে তা ঘটেনি)।

তাছাড়া প্রথম ওহী অবতরণের দীর্ঘ বিরতির পর দ্বিতীয় ওহী অবতরণ করেছিল, কারো মতে চল্লিশ দিন আবার কারো মতে প্রায় দু বছর পর। অথচ যে ব্যক্তি উন্মাদনায় ভুগছে তার চিন্তাধারা তো অবিরাম ভ্রান্তির জগতে বিচরণ করার কথা। মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির বিক্ষিপ্ত মন সারাক্ষণ অস্বাভাবিক চিন্তাভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। উন্মাদের মস্তিষ্ক বিকৃতি যেখানে এক বা দু দিনের জন্যও সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হয় না, সেখানে সপ্তাহ খানেক বা চল্লিশ দিনের বিরতি তো আরো অবাস্তব।

উন্মাদ ব্যক্তি বিভ্রান্তিমূলক কল্পনায় নিজে প্রতারিত হলেও তার প্রবঞ্চনা কিংবা মিথ্যাচার কোনটাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুক্তি ও সময়ের ধোপে টিকে না। কেননা ইতিহাসের বুনন যত ভাঁজ খুলতে থাকে, ঘটনা ততই উদ্ঘাটিত হয়। সেই সাথে মিথ্যাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অথচ ইতিহাস আজ পর্যন্ত মুহাম্মদ (ﷺ) এর বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের কোন দাবী প্রমাণ করতে পারেনি। সত্যিকারের কোন বিদ্বান ব্যক্তিই তাঁর (ﷺ) বিরুদ্ধে এ ধরণের অপবাদকে প্রশ্রয় দেননি। যেমন টমাস কার্লাইল মন্তব্য করেছেন,

> "ধনী বিধবা খাদিজার তত্বাবধায়ক হিসেবে তিনি (মুহাম্মদ সাঃ) ব্যবসার কাজে সিরিয়া ভ্রমণ করে অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এতে খাদিজার হৃদয়ে জন্ম নেয় তাঁর (ﷺ) প্রতি সসম্ভ্রম কৃতজ্ঞতা। দু'জনার বিবাহ-বন্ধন নিয়ে আরবদের কাছ থেকে পাওয়া বর্ণনা ভীষণ মাধুর্যময় ও বিশ্বাসযোগ্য। সে সময় তিনি (ﷺ) ছিলেন পঁচিশ বছরের দৃপ্ত যুবক, আর খাদিজা চল্লিশেও আকর্ষণীয়া। বৈবাহিক জীবনে তিনি (ﷺ) স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ও শান্তিপূর্ণ ছিলেন বলে জানা যায়। খাদিজার প্রতি বিশ্বস্ত ভালবাসায় তাঁর আন্তরিকতার অভাব ছিল না। মুহাম্মদ (ﷺ) এর কুৎসা রটনাকারীদের বিরুদ্ধে যুক্তি

[4] *New Catholic Encyclopedia.* Vol 9, p. 1001

হিসেবে এটাই যথেষ্ট যে, ওহীর মাধ্যমে ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব লাভ করার আগে দীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি অন্য সবার মত সমালোচনাহীন, শান্তিপূর্ণ, স্বাভাবিক জীবন কাটিয়েছেন। খাদিজার মৃত্যুর পর তাঁর পঞ্চাশোর্ধ জীবনে একের পর এক অস্বাভাবিক ঘটনাগুলো ঘটতে দেখা যায়। এ যাবৎ সৎ জীবন যাপন করাই ছিল তাঁর জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য এবং প্রতিবেশীদের কাছে তিনি এ জন্য সুপরিচিত ছিলেন। নির্বাপিত আকাঙ্ক্ষা ও বার্ধক্যের মুখোমুখী হয়ে ভণ্ড পণ্ডিতের মত তিনি ধর্মপ্রচারের জন্য উচ্চাভিলাষী হয়ে উঠেছিলেন বলে অভিযোগকারীদের যে দাবী, তা অন্ততঃ আমি বিশ্বাস করি না।

গভীর কালো চোখ ও উন্মুক্ত হৃদয়ের অধিকারী এ মরু-সন্তানের মনে 'উচ্চাভিলাষ' নয় বরং অন্য কিছু ছিল। শান্ত ও মহান আত্মা! তিনি ছিলেন তাদেরই একজন যারা অকৃত্রিম না হয়ে পারেন না, যারা স্বভাবগতভাবেই একনিষ্ঠ, আন্তরিক....তাঁর বিরুদ্ধে প্রবঞ্চণার অপবাদ বিশ্বাসযোগ্য তো নয়ই, আপত্তিকরও বটে যা সহজে মেনে নেয়া যায় না"[5]।

বিভিন্ন সময়ে মুহাম্মদ (ﷺ) এর বিরুদ্ধে কুরআন জালিয়াতির নানারকম অভিযোগ তোলা হয়েছে। কুরআন সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা করলে এ সমস্ত অভিযোগের বৈধতা কিংবা অসারতা প্রমাণিত হয়।

আলোচনার শুরুতে বলা দরকার যে, 'কুরআন' শব্দটি মূলতঃ কোন বইকে নির্দেশ করে না। কুরআন হল 'ওহী' বা আসমানী জ্ঞান। ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, পরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে আসমানীদূত জিবরীল (عليه السلام) এ ওহী মুহাম্মদ (ﷺ) এর কাছে মৌখিকভাবে নিয়ে এসেছিলেন। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত অগণিত হাফেযের (কুরআন মুখস্থকারী) হৃদয় ও মনে মৌখিক রীতিতে কুরআন সংরক্ষিত আছে। সারা বিশ্বে আজ এরকম হাফেযের সংখ্যা কোনমতেই ৩০ মিলিয়নের কম হবে না।

মৌখিক সংরক্ষণ রীতির পাশাপশি কুরআন লিখিতভাবেও সংরক্ষিত হয়েছে। ওহী অবতরণের সময় লিপিকররা এর প্রতিটি শব্দ বিশ্বস্ততার সাথে লিখে রাখতেন।

---

[5] Carlyle, Thomas. 1841. *On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History*. London: James Fraser, Regent Street. Pp. 86-87, 89.

বস্তুতঃ কুরআনই হল একমাত্র আসমানীগ্রন্থ যা অবতরণের সময়ে লিপিবদ্ধ হয়ে আজ পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। পুরাতন ও নতুন বাইবেলের[6] মত সে যুগে কুরআনের লিপিকরদের জন্যেও লেখার সামগ্রী অপ্রতুল ছিল। ফলে হাতের কাছে সহজলভ্য যা ছিল তা দিয়েই কুরআনের বাণী প্রথম দিকে লিখে রাখা হত। যেমন, খেজুর পাতা, পশুর চামড়া, বড় আকৃতির পশুর হাড় ইত্যাদি।

মুহাম্মদ (ﷺ) এর মৃত্যুর প্রায় দু'বছর পর, প্রথম খলীফা আবু বকর (রাঃ) এর আমলে লিপিকরদের লেখা সবকয়টি বিচ্ছিন্ন পাণ্ডুলিপি সংকলিত ও একত্রিত করে কুরআনকে একটি স্বীকৃত-পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের (মুস্হাফ[7]) রূপ দেয়া হয়। কুরআন সংকলন-কাজ তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল মুহাম্মদ (ﷺ) এর বিশ্বস্ত সহচর যায়েদ ইব্ন সাবিত (রাঃ) এর উপর। পরবর্তীতে উসমান (রাঃ) এর খিলাফতের সময় (মূল মুস্হাফ অনুসরণ করে) চার থেকে আটটি কপি তৈরী করা হয়। এর প্রত্যেকটি কপি ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। এগুলোর দু'টি আজো বিদ্যমান রয়েছে – উজবেকিস্তানের তাশখন্দ এবং তুরস্কের ইস্তাম্বুলে। আজ কুরআনের এ 'মূললিপি'গুলো সমস্ত মানবজাতির জন্য লিখিত দলিল হিসেবে বর্তমান। মূল মুস্হাফের সাহায্যে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে, কুরআনের যে কোন কপির বিশুদ্ধতা যাচাই করা সম্ভব। এতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের পবিত্রগ্রন্থ প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত বিশুদ্ধ ও অবিকৃত আছে। কুরআন সংরক্ষণের এ অনবদ্য ইতিহাস কারো কারো কাছে এর বিশুদ্ধতার অলৌকিক প্রমাণ বলে মনে হয়েছে। যেমন ডঃ লরা ভ্যাগলিয়েরি মন্তব্য করেছেন,

> "কুরআনের আসমানী উৎস সম্পর্কে আরেকটি প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। অবতরণের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত, বহু শতাব্দী পরেও এর শব্দাবলী বিশুদ্ধ ও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে...."[8]।

---

[6] বাইবেল বলতে ইহুদী ও খ্রিষ্ট ধর্মে স্বীকৃত বিভিন্ন পুস্তকের সমষ্টিকে ইঙ্গিত করা হয়। তবে দু ধর্মের স্বীকৃত গ্রন্থসমষ্টি একই নয়। ইহুদীদের স্বীকৃত গ্রন্থ পুরাতন বাইবেল (The Old Testament) নামে পরিচিত। খ্রিষ্টানদের বাইবেলের মধ্যে পুরাতন বাইবেল ছাড়াও নতুন বাইবেলও (The New Testament) অন্তর্ভুক্ত।- (অনুবাদক)

[7] শাব্দিক অর্থ 'গ্রন্থ' হলেও সাধারণত 'মুসহাফ' শব্দটি ব্যবহার করা হয় গ্রন্থাকারে সংকলিত কুরআনকে নির্দেশ করতে। - (অনুবাদক)

[8] Vaglieri, Dr. Laura Veccia. Translated from Italian by Dr. Aldo Caselli, Haverford College, Pennsylvania. Originally published in Italian under the

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবীর অধ্যাপক (১৯৪৭-১৯৬৯) আর্থার জে. আরবেরী বলেছেন,

> "পড়ার কাজটি সহজ করার উদ্দেশ্যে পুরনো ঢং-এ লেখা কুরআনের মূললিপি থেকে কিছু কিছু বানান পরিবর্তন করা হয়েছিল। সামান্য এ পরিবর্তনটুকু ছাড়া বিংশ শতাব্দীতে মুদ্রিত কুরআন, ১৩০০ বছরেরও আগে উসমানের তত্ত্বাবধানে স্বীকৃত কুরআনের হুবহু অনুরূপ"[9]।

স্যার উইলিয়াম মুয়্যির এর মত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব (দু'শ বছর আগে) বলেছেন,

> "উসমানের আমলে সংরক্ষিত গ্রন্থটি আমাদের হাতে পৌছেছে অবিকৃত অবস্থায়।....পৃথিবীতে সম্ভবতঃ এরকম আর একটি গ্রন্থও নেই যা দীর্ঘ বারো'শ বছর ধরে বিশুদ্ধ ও অপরিবর্তিত রয়েছে"[10]।

এড্রিয়ান ব্রকেটের সাম্প্রতিক গবেষণায় পাওয়া যায়,

> "মুহাম্মদের মৃত্যুর পর যুগ যুগ ধরে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে কুরআন হস্তান্তরের ফলে এর আঙ্গিক বা গঠণগত কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কুরআন অভিন্ন গ্রন্থ হিসেবে বিদ্যমান, কোন ধরণের রদবদল কখনও এতে প্রবেশ করেনি কিংবা কোন অংশ এ থেকে হারিয়েও যায়নি। প্রথম দিকের খলীফাদের সময়েও একই কথা প্রযোজ্য।...কুরআনের সংরক্ষণ যেমন মৌখিকভাবে হয়েছিল, তেমনি হয়েছিল লেখনীর মাধ্যমে"[11]।

মহিমাময় কুরআনের লিপি সংকলিত হয়েছিল হাজার হাজার সাহাবাদের (যে সমস্ত মুসলিম মুহাম্মদ ﷺ এর জীবদ্দশায় তাঁর সাহচর্য পেয়েছিলেন) ঐকমত্যের ভিত্তিতে। কুরআনের কিছু না কিছু অংশ কম-বেশী এদের প্রত্যেকের মুখস্থ ছিল। কেউ কেউ ছিলেন হাফেয, যারা গোটা কুরআন কণ্ঠস্থ করেছিলেন।

---

title: Apologia dell' Islamismo (Rome, A.F. Formiggini, 1925). 1980. An Interpretation of Islam. Zurich: Islamic Foundation, pp. 41-42.

[9] Arberry, Arthur J. 1964. *The Koran Interpreted.* London: Oxford University Press. Introduction, p. xxii-xxiii.

[10] Muir, Sir William. 1923. The Life of Mohammad. Edinburgh: John Grant.

[11] Rippin, Andrew (editor). 1988. *Approaches to the History of the Interpretation of the Qur'an.* Chapter: 'Value of Hafs and Warsh Transmission,' by Adrian Brockett. Oxford: Clarendon Press. Pp. 44-45.

কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলিত হবার সময় অনেক সাহাবার নিজস্ব সংগ্রহে হাতে লেখা কুরআনের অসম্পূর্ণ কপি ছিল। কারো কারোটি (যেমন, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ, উবাই ইব্ন কা'ব ও ইব্ন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)) নির্দিষ্ট উচ্চারণ-ভঙ্গিতে লেখা হয়েছিল, ফলে কুরআন পাঠের অন্যান্য সম্ভাব্য উচ্চারণ-ভঙ্গি অনুশীলনের সুযোগ এগুলোতে ছিল না। অথচ একাধিক উচ্চারণ-ভঙ্গিতে কুরআন পাঠের সুযোগকে এর অন্যতম অলৌকিক নিদর্শন বলে মনে করা হয়। স্বাভাবিকভাবে সাহাবাদের এ সমস্ত নিজস্ব অসম্পূর্ণ কপি কুরআনের প্রামাণিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি এবং সাহাবারা নিজেরাও কখনও সেই স্বীকৃতি দাবী করেননি। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর আমলে যায়েদ ইব্ন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর তত্ত্বাবধানে কুরআনের যে সম্পূর্ণ সংকলনটি তৈরী হয়েছিল তা এরা সবাই (যেমন, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ, উবাই ইব্ন কা'ব, ইব্ন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) সহ অন্যান্য সমস্ত লিপিকর ও হাফেয) সর্বসম্মতভাবে মেনে নিয়েছিলেন।

(সম্পূর্ণ কুরআন সংকলনের পর) পশুর হাড়, চামড়া, প্যাপিরাস ইত্যাদি বস্তুতে সংরক্ষিত কুরআনের যাবতীয় অসম্পূর্ণ কপি নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছিল, যাতে ভবিষ্যতে কুরআন সম্পর্কে কোন মতবিরোধ ও সংশয় জন্ম না নেয়। সে সময় দূরদর্শী এ সিদ্ধান্তটি না নেয়া হলে পরবর্তী প্রজন্মের মুসলিমদের অজ্ঞতা বা অহমিকার শিকার হবার সম্ভাবনা ছিল। সাহাবাদের বংশধররা পারিবারিকভাবে সংরক্ষিত কপিটিকেই একমাত্র স্বীকৃত লিপি হিসেবে দাবী করত। ফলে গোত্রীয় ও ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি হবার সুযোগ ছিল। বিজ্ঞ সাহাবারা এ সম্ভাব্য বিপদের কথা চিন্তা করে শুধুমাত্র সম্পূর্ণ মুসহাফের কপিটি সংরক্ষণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁরা এদিক-সেদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কুরআনের ভগ্নাংশগুলো অগ্রাহ্য করেছিলেন যাতে সেগুলো ভবিষ্যতে কোনরকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করে।

এমন একজন সাহাবীও মিলবে না যিনি স্বীকৃত মুসহাফের ব্যাপারে ঐ সময় দ্বিমত পোষণ করেছেন। এ ব্যাপারটি মুসলিমদের জন্য রীতিমত গর্বের বিষয়। সমসাময়িক নারী-পুরুষের মধ্যে একজনও দাবী করেননি যে, সংকলিত মুসহাফে মূল কুরআনের কোন অংশ বাদ পড়েছে অথবা অতিরিক্ত কোন কিছু যোগ করা হয়েছে। আর কুরআনের হস্তলিপিগুলো যে নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল তার কারণ, সেগুলো সবকয়টি ছিল অসম্পূর্ণ। এগুলোর বর্ণনা ও বিষয়বস্তুতে কোন বৈসাদৃশ্য বা অমিল ছিল না। এ অসম্পূর্ণ লিপির মালিকরা এগুলো নষ্ট করে ফেলবার জন্য স্বেচ্ছায় মালিকানা ত্যাগ করেছিলেন। কারণ যায়েদ ইব্ন

সাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সংকলিত মুস্হাফটি অন্যান্য বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড লিপির সবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। এমন একটি অসম্পূর্ণ লিপিও বাকি ছিল না যা এতে সংযোজিত হয়নি। তাছাড়া আগেই বলা হয়েছে যে, কুরআন প্রধাণতঃ সংরক্ষিত হয়েছে লেখনীর মাধ্যমে নয় বরং অগণিত বিশ্বাসীর স্মৃতির মাধ্যমে। সে সময় কুরআনের যে সব শ্রুতিধর (হাফেয) জীবিত ছিলেন তারা ভালভাবে পরীক্ষা করে কুরআনের স্বীকৃত মুসহাফের বিশুদ্ধতা ও পূর্ণাঙ্গতা নিশ্চিত করেছেন। হাজার হাজার শ্রুতিধরের কেউ এ ব্যাপারে আপত্তি তোলেননি।

আজ দীর্ঘ চৌদ্দ'শ বছর পর কুরআনের অল্প কয়েকজন হাফেয থাকাই যেখানে বিস্ময়কর, সেখানে লক্ষ লক্ষ হাফেযের উপস্থিতি আল্লাহ (ﷻ)র পরম অনুগ্রহ বলে মুসলিমরা মনে করে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমান বিশ্বে এক বিলিয়ন খ্রিষ্টান ও বহু মিলিয়ন ইহুদীর বাস। কিন্তু এদের মধ্যে একজনও মিলবে না যিনি নিজ ধর্মের পবিত্র গ্রন্থের মূললিপিটি সম্পূর্ণ মুখস্হ করেছেন। কোন ইহুদী রাবী পাওয়া গেলেও যেতে পারে যিনি তাওরাত মুখস্হ করেছেন, তাও সেটা স্রষ্টার অবতীর্ণ মূল তাওরাত নয়। কেননা ব্যাবিলনের রাজা ৫৮৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সোলায়মান (আলাইহিস সালাম) এর উপাসনালয় লুণ্ঠন করার পর ৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে বর্তমান তাওরাত পুনর্লিখিত হয়েছিল[12]। স্মৃতি কিংবা বই আকারে বর্তমানে 'পুরাতন বাইবেলে'র যে সংস্করণটি পাওয়া যায় তা অসংখ্য মানবিক ভুল-ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ।

অন্যদিকে নতুন বাইবেলের পান্ডুলিপির কয়েক হাজার রকমভেদ আছে। খ্রিষ্টানদের মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত বিরল যিনি এর অন্ততঃ একটির অনুবাদ সম্পূর্ণ মুখস্হ করেছেন। আর নতুন বাইবেলের হাজার হাজার গ্রীক পাণ্ডুলিপির[13] একটিও মুখস্থ করেছেন - এরকম ব্যক্তি তো বলতে গেলে একেবারেই নেই।

---

[12] ব্যাবিলনের রাজা বুখতা নাস্র (Nebuchadnezzar) ৫৮৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে জেরুযালেম আক্রমণ করে সোলায়মান (O) নির্মিত উপাসনালয় ধ্বংস করে বহু ইহুদীকে দাস হিসেবে ব্যাবিলনে বন্দী করে নিয়ে যায়। পরে ৫৩৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পাসী সম্রাট সাইরাসের অনুমতি পেয়ে ইহুদীরা আবার জেরুযালেমে ফিরে আসে। তারা নতুন করে উপাসনালয় নির্মান করে এবং এ সময় তাওরাত পুনরুদ্ধারের চেষ্টা শুরু হয়। - (অনুবাদক)

[13] ঈসা (আঃ) এর মাতৃভাষা ছিল আরামাইক। অথচ নতুন বাইবেলের যে প্রাচীনতম পান্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা গ্রীক ভাষায় লিখিত, আরামাইক ভাষায় নয়। পরবর্তীতে গ্রীক থেকে ল্যাটিন, ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় নতুন বাইবেল অনূদিত হতে থাকলেও আরামাইক ভাষায় মূল পান্ডুলিপির অস্তিত্বের কোন খবর মেলেনি। - (অনুবাদক)

এমনকি ঈসা (ﷺ) এর উপর (আরামাইক ভাষায়) অবতীর্ণ মূল গসপেল (ইন্‌জিল) মুখস্থ রেখেছিলেন, এমন লোকের নাম পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যায় না। এ ধরণের কাউকে পাওয়া গেলে নিঃসন্দেহে আজ খ্রিষ্টান সমাজ অগণিত গ্রীক পান্ডুলিপির গোলকধাঁধা থেকে মুক্তি পাবার প্রচেষ্টায় ক্ষান্ত দিত। বিশ্ববাসীর সামনে তারা বুক ফুলিয়ে বলতে পারত যে, তাদের কাছে আরামাইক ভাষায় অবতীর্ণ গসপেলের (ইন্‌জিল) মূল কপিটি আছে।

সুতরাং কুরআনই হচ্ছে একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা অবতরণের সময়ে লিপিবদ্ধ হয়ে এখনও পর্যন্ত বিশুদ্ধ ও অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। বিভিন্ন অনারব ভাষায় এর অনুবাদ থাকতে পারে, কিন্তু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ মূল কুরআন এক ও অভিন্ন। বাইবেলের বিভিন্ন রকম সংস্করণ নিয়ে খ্রিষ্টান সমাজে যে বিভ্রান্তি তৈরী হয়েছে, কুরআনের বেলায় তেমনটা হয়নি। (অবতীর্ণ) মূলভাষায় পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব না থাকার ফলে বাইবেল অনুবাদের ক্ষেত্রে যে ধরণের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে তা-ও কুরআনে ঘটেনি। জনগণের নাগালের বাইরে ভ্যাটিকানের নিজস্ব লাইব্রেরীতে অথবা কিছুদিন আগে ডেড সী'র কুমরানে[14] খুঁজে পাওয়া বাইবেলের অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি নিয়ে সাধারণ খ্রিষ্টানদের মধ্যে যে সংশয় বিদ্যমান, সেটাও কুরআনের ব্যাপারে নেই। ঈসা (ﷺ) এর মৌখিক ভাষা আরামাইকের সাথে কোয়েন গ্রীক (যে ভাষায় নতুন বাইবেল প্রথম অনূদিত হয়েছিল) ভাষার কতখানি পার্থক্য হতে পারে সে নিয়ে যে কেউ সন্দিহান হতে পারে। গ্রীক থেকে ইংরেজীতে অনুবাদের সময় বাইবেলে যে ধরণের অজস্র ও বড় রকমের ভুল হয়েছে, তা যদি আরামাইক ও হিব্রু থেকে গ্রীক ভাষায় অনুবাদের সময়ও হয়ে থাকে তাহলে আজকের বাইবেলের বিশুদ্ধতা ও যথার্থতা অবশিষ্ট থাকার আর কোন আশা থাকে না।

বাইবেল ও কুরআনের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য হচ্ছে, প্রথম দিন থেকে কুরআন সবসময় সাধারণ জনগণের হাতের নাগালে ছিল। অথচ বাইবেলের বেলায় এ কথা খাটে না। যে কোন লোক কুরআন পেতে চাইলে তার জন্য সেটা অসাধ্য

---

[14] ডেড সী'র উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবিস্থত 'কুমরান' একটি প্রাচীন জনপদের ধ্বংসাবশেষ। ১৯৪৭ সালের দিকে কুমরানের আশেপাশের ১১টি গুহা থেকে হিব্রু ও আরামাইক ভাষায় অসংখ্য প্রাচীন ধর্মীয় পান্ডুলিপি আবিস্কৃত হয় যা the Dead Sea Scrolls বা 'ডেড সী পান্ডুলিপি' নামে পরিচিত। এ লিপিগুলো কোন অজ্ঞাত কারণে বাইবেলে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। - (অনুবাদক)

কিছু ছিল না। অন্যদিকে বর্তমানে যে (ল্যাটিন) বাইবেল আমরা দেখছি তা ৩৬৭ সালে ট্রেন্ট'এ অনুষ্ঠিত সম্মেলনের আগে অস্তিত্ব লাভ করেনি। তখন থেকে প্রায় এক হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে বাইবেল শুধুমাত্র ল্যাটিন ভাষায় লেখা হত। ১৩৮২ সালে জন ওয়াইক্লিফ প্রথম ইংরেজীতে 'নতুন বাইবেল' অনুবাদ করেন। এরপর উইলিয়াম টিনডেল অনুবাদ শুরু করেন যা জন রজার্সের সম্পাদনায় শেষ করেন মাইল্‌স কাভারডেল। এদিকে জার্মান ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন মার্টিন লুথার। মার্টিন লুথার ও টিনডেলের এ অনুবাদ কাজ ১৬শ শতাব্দীর আগে প্রকাশিত হয়নি।

এবার দেখা যাক টিনডেল বাইবেল অনুবাদ করে কী প্রতিদান পেয়েছিলেন? মৃত্যুদণ্ড! ১৫৩৬ সালে তাকে খুঁটিতে বেঁধে পুড়িয়ে মারা হয়। আর জন রজার্সের প্রতিদানই বা কী ছিল? টিনডেলের মত ১৫৫৫ সালে তারও অভিন্ন পরিণতি ঘটেছিল, শুধু ভিন্ন খুঁটিতে। এ দু'জনার পূর্বসূরী ওয়াইক্লিফ মৃত্যুদণ্ড এড়াতে পারলেও আগুন থেকে পুরোপুরি নিষ্কৃতি পাননি। ওয়াইক্লিফের মৃত্যুর পর ১৪১৫ সালে কন্সট্যানসে অনুষ্ঠিত সার্বজনীন খ্রিষ্টান সম্মেলনের বিচারে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং কবর খুঁড়ে তার কঙ্কাল বের করে জনসমক্ষে ভস্মীভূত করা হয়। ডেনমার্কের সুপারিশ না পেলে মাইল্‌স কাভারডেলের পরিণতিও যে একই হত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পরবর্তীতে ওয়াইক্লিফ ও টিনডেলের অনূদিত লিপিগুলো জনসমক্ষে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

এ সমস্ত কারণে ১৫০০ বছরেরও বেশী সময় ধরে খ্রিষ্টধর্মের পবিত্রগ্রন্থ শুধুমাত্র গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় প্রচলিত ছিল। ফলে উচ্চশিক্ষিত সমাজ ও বিশেষ কিছু ধর্মযাজকদের মধ্যে বাইবেলের প্রচলন সীমাবদ্ধ ছিল। এমনকি ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের মধ্যে অনেকে নিজ ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে ছিল অজ্ঞ। সে সময় হাতে-কলমে কপি করা হত বলে খরচ ও সংখ্যার দিক দিয়ে বাইবেল অপ্রতুল ছিল, যার ফলে শিক্ষিতদের সবার পক্ষে কপি সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। অন্যদিকে সাধারণ লোকের জন্য বাইবেলের অধিকারী হওয়া আইনগতভাবে নিষিদ্ধ ছিল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ নিয়ম-ভঙ্গকারীর শাস্তি হত মৃত্যুদণ্ড, বিশেষ করে সে বাইবেল যদি স্বদেশী ভাষায় অনূদিত হত কিংবা হত প্রটেস্ট্যান্টদের অনুবাদ। সবকিছু মিলিয়ে কারো পক্ষে বাইবেল সংগ্রহের কাজটি রীতিমত অসাধ্য ছিল। ১৪৫০ সালে গুটেনবার্গ মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার করার পর বিপুলহারে বাইবেল মুদ্রণের কাজ সম্ভব হয়। ১৬শ শতকে প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার-আন্দোলনের পর

বাইবেল যে শুধু বিভিন্ন স্বদেশী ভাষায় অনূদিত হতে থাকে তা-ই নয়, সেই সাথে জনগণের মধ্যেও সহজপ্রাপ্য হতে শুরু করে।

১৬শ শতাব্দীতে খ্রিষ্টধর্মের ইতিহাসে প্রথমবারের মত বাইবেলের অনুবাদ জনগণের হাতের নাগালে আসে। একই শতাব্দীতে বিভিন্ন রাজতন্ত্রের আনুকূল্য ও ইন্ধন পেয়ে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বাইরে আরো অনেক খ্রিষ্টান সম্প্রদায় জন্ম নিতে শুরু করে। ক্রমে এ বিপুল সংখ্যক বাইবেলের কপি ও অসংখ্য বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায়কে পুড়িয়ে নিঃশেষ করা ক্যাথলিক চার্চের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। বরং প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কারকদের চাপে পড়ে ক্যাথলিক চার্চকে ল্যাটিন থেকে লৌকিক ভাষায় অনূদিত একটি অভিন্ন বাইবেল প্রকাশ করতে উদ্যোগী হতে হয়েছিল। এ উদ্যোগের পরিণামে 'Douay-Rheims বাইবেলে'র প্রথম ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৫৮২ সালে ফ্রান্সের Rheims – এ 'নতুন বাইবেল' এবং ১৬০৯-১০ সালের দিকে Douay – তে 'পুরাতন বাইবেল' এর অনুবাদ শেষ হয়েছিল ব'লে এর এ রকম নামকরণ।

১৪৫০ থেকে জনসাধারণের জন্য বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশনা শুরু হলেও প্রথমে তা খুব একটা সুলভ ছিল না। "...হিসাবে দেখা গেছে যে, ১৫১৫ সালের দিকে পশ্চিম ইউরোপে বাইবেলের প্রায় ২৫,০০০ অনুবাদ ছাপা হয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন জার্মানভাষীর জন্যে জার্মান ভাষায় বাইবেল ছিল মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ, প্রতি ২০০০ লোকের জন্য বরাদ্দ ছিল বাইবেলের একটি মাত্র কপি"[15]।

এসমস্ত বর্ণনায় স্পষ্ট ফুটে উঠে যে, অজ্ঞতা ও বাইবেলের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে ১৫০০ বছর ধরে সাধারণ জনগণ বাইবেলের বিষয়বস্তু নিজে যাচাই করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। এর পরেও দীর্ঘদিন সাধারণ লোক চার্চের চাপিয়ে দেয়া বিশ্বাস ও মতবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবার সাহস দেখায়নি, 'রক্তপাতহীন মৃত্যু' – অর্থাৎ খুঁটিতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণের ভয়ে। ধর্মীয়জ্ঞান প্রচারের ব্যাপারে এ কঠোর নিয়ন্ত্রণের পিছনে ক্যাথলিকদের যুক্তি ছিল – যাতে ধর্মীয় বিশুদ্ধতা বজায় থাকে এবং সাধারণ জনগণের হাতে বাইবেলের মনগড়া ব্যাখ্যায় অধার্মিক মতবাদ ও বিশ্বাস জন্ম নেবার সুযোগ না পায়। ক্যাথলিক চার্চের মতে, খ্রিষ্টধর্মের জটিল ও রহস্যময় মতবাদ সাধারণ লোকের পক্ষে নিজ বুদ্ধিতে বোঝা

---

[15] Fossier, Robert (editor), 1986, The Cambridge Illustrated history of the Middle ages. Cambridge: Cambridge University Press. Vol. 3 p. 495.

সম্ভব না। এর জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞ পণ্ডিতের ব্যাখ্যা। জনসাধারণ এমনকি শিক্ষিত সমাজের বোধশক্তিতে না কুলালেও তাদের উপর জোর করে এ সমস্ত দুর্বোধ্য মতবাদ চাপানোর প্রবণতা সুস্পষ্ট ছিল। ১১৯৯ সালে পোপ তৃতীয় ইন্যোসেন্টের দেয়া বিবৃতিতে বিষয়টি কিছুটা ফুটে উঠে,

> "ধর্মবিশ্বাসের গূঢ় তত্ত্ব কারো কাছে ব্যাখ্যা করার বিষয় নয়। সত্যি বলতে তা সবার পক্ষে বোঝাও অসম্ভব। শুধুমাত্র যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে তা বোঝা সম্ভব।....আসমানীগ্রন্থের বিষয়বস্তু এমন গভীর যে, শুধু নিরক্ষর-অশিক্ষিত সমাজ নয় বরং শিক্ষিত-গুণীজনদের জন্যেও তা আয়ত্ব করা কঠিন"।[16]

অন্যদিকে প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এ দাবী নিয়ে যে, প্রতিটি খ্রিষ্টান ব্যক্তি নিজ বুদ্ধি ও জ্ঞানে বাইবেল বুঝবার অধিকার রাখে। তাদের বিশ্বাস ছিল - জনসাধারণ নিজ ভাষায় বাইবেল পড়বার ও ভুল-ত্রুটি বিশ্লেষণ করার সুযোগ পেলে বুঝতে পারবে যে, বাইবেলের আসল শিক্ষা ও ক্যাথলিক চার্চের প্রচারিত শিক্ষার মাঝে রয়েছে প্রচুর অমিল। তারা আরো মনে করত, ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি ও প্রচারিত শিক্ষা যে অনেকাংশে (যদি না পুরোপুরি) বাইবেল বহির্ভূত – এ বাস্তবতা প্রকাশিত হলে ধীরে ধীরে জনগণের মধ্যে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের গ্রহণযোগ্যতা ও আকর্ষণও বৃদ্ধি পাবে।

মুসলিমরা এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলে যে, খ্রিষ্ট ধর্মগ্রন্থের ভুল-ত্রুটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবার পর কোন খ্রিষ্টানের পক্ষে এক থেকে অন্য মতবাদে (যেমন ক্যাথলিক থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ) বিচরণ করা যৌক্তিক নয়। কেননা এ সবগুলো মতবাদই এমন একটি গ্রন্থকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে যাতে আছে অগণিত ত্রুটি ও অসঙ্গতির ছড়াছড়ি। মুসলিমরা বলে, সত্যিকারের সত্যানুসন্ধানীর উপলব্ধি করা উচিত যে, সৃষ্টিকর্তা মানবজাতির জন্য সত্যকে অবশ্যই আসমানী বার্তায় সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গরূপে পাঠাবেন। তাই বাইবেলের পরে আগমন করেছে এমন একটি আসমানী গ্রন্থ (কুরআন) সেই সত্য পরীক্ষা করে দেখবার যোগ্যতা রাখে। কুরআন এমন এক গ্রন্থ যা ত্রুটিহীন ও সঙ্গতিপূর্ণ, সেইসাথে সৃষ্টিকর্তার পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত প্রকৃতির সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

---

[16] Denzinger, Henricus & Schonmetzer. 1973. *Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Declarationum de Rebus Fidei et Morum.* Barcinone Herder. pp. 246.

কুরআনকে স্রষ্টার অবতীর্ণ সর্বশেষ আসমানীগ্রন্থ দাবী করে মুসলিমরা গর্বিত কণ্ঠে বলে যে, কুরআন অতীতে যেমন সবসময় জনসাধারণের হৃদয়ে ও হাতের নাগালে ছিল, এখনও তেমনি আছে। অবতরণের সময় থেকে এখনও এর বাণী প্রতিদিনের প্রার্থনায় (সালাতে) উচ্চারিত হয়ে আসছে। প্রতি বছর রমাদান মাসে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ করা হয় পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি মসজিদে। যে কোন মুসলিমের পূর্ণ অধিকার আছে এ পঠনের সামান্যতম ভুল শুধরে দেবার। অথচ চৌদ্দ'শ বছর ধরে সুন্নী মুসলিমদের মধ্যে কুরআনের একটি অক্ষর নিয়েও কেউ কখনও প্রশ্ন তোলেনি।

অবাক হবার মত আরেকটি বিষয় আছে। ইতিহাসে বিভিন্ন সময় সুন্নী মুসলিমদের মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে মতবিরোধ এমনকি যুদ্ধ পর্যন্ত ঘটতে দেখা গেছে। এ ধরণেরই এক বিরোধের সূত্র ধরে তৃতীয় খলীফা উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিহত হয়েছিলেন, সে সময় তিনি ছিলেন কুরআন পাঠরত অবস্থায়। তাঁর শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ এখনও লেগে আছে সেই কুরআনের পাতায়। অথচ আভ্যন্তরীন এতসব কোন্দল ও মতপার্থক্য সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কুরআনের বিশুদ্ধতা নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে কোন দ্বিমত দেখা যায়নি। বাইবেলের ক্ষেত্রে কিন্তু এ কথা প্রযোজ্য নয়। এফ. এফ আরবাটনটের মন্তব্য,

> "উচ্চ সাহিত্যিক মানবিশিষ্ট, গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে বিন্যস্ত কু রআনকে বিশুদ্ধ আরবী ভাষার আদর্শ নমুনা ধরা হয়। আরবী ব্যাকরণবিদরা কোন কোন ক্ষেত্রে এর বিশেষ বাচনভঙ্গী ও বাগ্বিধি বুঝবার জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করেছেন। এর অনন্য রচনাশৈলীর সমকক্ষ রচনা তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বহুবার, কিন্তু কোনটি সফল হয়নি।
>
> আগের আলোচনায় দেখা যায় যে, (৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে) মুহাম্মদের মৃত্যুর বিশ বছরের ভিতর কুরআনের পূর্ণাঙ্গ সংকলন চূড়ান্ত হয়েছিল। আজ পর্যন্ত কোন উদ্যোগী, অনুবাদক অথবা কুচক্রীর হস্তক্ষেপে তাতে এতটুকু বিকৃতি বা পরিবর্তন ঘটেনি বরং হুবহু একই রকম আছে। দুঃখজনক হল, নতুন কিংবা পুরাতন বাইবেলের পুস্তকগুলোর ব্যাপারে এরকম মন্তব্য করা যায় না"[17]।

---

[17] Arbuthnot, F. F. pp. 5-6.

আরেকটি লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল, কুরআন প্রচলিত আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। কোটি কোটি অনুসারীর পক্ষে সে ভাষা বোঝা মোটেই দুঃসাধ্য নয়। অন্যদিকে বাইবেল প্রথম সংকলিত হয়েছিল কোয়েন গ্রীক (Koine Greek) ভাষায়; যে ভাষার প্রচলন বর্তমান বিশ্বে বলতে গেলে একেবারেই নেই। এর খণ্ড খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন যে পাণ্ডুলিপিগুলো প্রাচীন হিব্রু ও অপ্রচলিত আরামাইকে লেখা আছে তা-ও আজ মৃত ভাষা। সারা পৃথিবীতে হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন ভাষাবিদ আছেন যারা এ প্রাচীন ও অপ্রচলিত ভাষায় লেখা পাণ্ডুলিপির আংশিক মর্মোদ্ধার করতে সক্ষম। শুধু তাই নয়, অনুবাদগুলো নিয়েও তারা একমত নন। Revised Standard Version (RSV) বাইবেলের ভূমিকায় এর নমুনা আমরা দেখি। বাইবেলের এ অনুবাদটি ১৯৫১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের National Council of the Churches of Christ এর স্বীকৃতি পেয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান বিশ্বে খ্রিষ্টানদের মধ্যে RSV বাইবেল সবচেয়ে জনপ্রিয়। গীর্জা ও খ্রিষ্টান সমাজের সার্বজনীন স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা পেলেও RSV বাইবেল নিজে কিন্তু স্বীকার করেছে,

> "এতে এখনও প্রচুর দূর্বোধ্যতা ও অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। যেখানে কোন শব্দের দু রকম অর্থ নিয়ে অস্পষ্টতা ও সন্দেহ আছে সেখানে পাদটীকায় তার বিকল্প ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। কমিটি যে সব ক্ষেত্রে বর্ণনার বিকৃতি কিংবা ভাষাগত জ্ঞানের অভাবে অর্থ সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি, সে সব প্রসঙ্গ চিহ্নিত করে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এটা মনে করাও ঠিক হবে না যে, চিহ্নিত হয়নি এমন বাকি বর্ণনাগুলোর ব্যাপারে কমিটি পুরোপুরি নিশ্চিত কিংবা ঐকমত্যবদ্ধ"[18]।

নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কারের সাথে সাথে বাইবেলের মূললিপির অর্থের উপলব্ধি বিস্তৃতি পেয়েছে। গীর্জা কর্তৃপক্ষ ১৬১১ সালে প্রকাশিত King James Version অনুবাদটি সংশোধন করে ১৯০১ সালে American Standard Version নামে প্রকাশ করেছিল। পঞ্চাশ বছর পর এ অনুবাদটিই আবার সংশোধনের পর Revised Standard Version নামে বের হয়। এ রকম বার বার সংশোধনের পিছনে কারণ হিসেবে RSV বাইবেলের ভূমিকায় উল্লেখিত হয়েছে,

---

[18] *The Bible, Revised Standard Version*. 1977. Preface. Pp. v.

> "King James Version এখনও অনেক ত্রুটিপূর্ণ রয়ে গেছে।....নতুন বাইবেলের King James Version' টি অনূদিত হয়েছিল গ্রীক পান্ডুলিপি থেকে যাতে ছিল ভুল-ভ্রান্তির সমাবেশ। এক থেকে অন্য লিপিকরের হাতে অসংখ্যবার কপি হবার কারণে, চৌদ্দশ বছর ধরে এ গ্রীক পান্ডুলিপিতে অজস্র ত্রুটি-বিচ্যুতি পুঞ্জীভূত হয়েছে"[19] ।

নতুন বাইবেলের গ্রীক পান্ডুলিপিগুলোর অর্থের ব্যাখ্যা নিয়ে ঐকমত্য তৈরীর প্রচেষ্টা এখনও চলছে। বর্তমানে যেমন এগুলো অর্থের দিক দিয়ে অস্পষ্ট, ভবিষ্যতে যে কখনও তার সমাধান মিলবে সে সম্ভাবনাও খুবই ক্ষীণ। এ রকম অনিশ্চয়তাপূর্ণ আবহাওয়ায় খুব সহজে ভুল অনুবাদ (ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত) বিভিন্ন ভাষাভাষীর স্বল্পজ্ঞান সাধারণ অনুসারীদের মাঝে সংক্রমিত হয়ে যায়। অন্যদিকে পান্ডুলিপির মূল ভাষা যদি পাঠকের জানা থাকে তাহলে এ সম্ভাবনা থাকে না। কারণ তারা নিজেরাই তখন লিখিত বর্ণনার সামান্যতম ভুল চিহ্নিত করতে এমনকি শুধরে দিতে পারে। মূল আরবী কুরআনের বেলায় ঠিক তা-ই হয়েছে।

মুসলিমরা দাবী করে শুরু থেকে এখন পর্যন্ত কুরআন অবিকৃত ও অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে। এখন যে কারো এ রকম দাবীর প্রামাণিক দলিল নিয়ে জিজ্ঞাসু হবার অধিকার আছে। তাছাড়া প্রমাণ ছাড়া কোন দাবী কখনও গ্রহণযোগ্য হয় না। মানবজাতির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দীর্ঘদিন ধরে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া (গীর্জার) অন্ধবিশ্বাস অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছে। এদের মধ্যে যারা বোধশক্তির অধিকারী তারা আকর্ষণীয় অথচ প্রমাণহীন বিশ্বাস, গালভর্তি কথা, (খ্রিষ্টধর্ম থেকে অন্য ধর্মে) ধর্মান্তরিত ব্যক্তির ধিক্কার এবং নিষ্প্রাণ আধ্যাত্মিক মতবাদের ভারে রীতিমত ক্লান্ত। যারা সত্য অনুসন্ধানে আন্তরিক তারা খুঁজে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের চাদর, যা তাদের প্রত্যয়কে উষ্ণতা দেবে। এমন চাদর যা শুধু দূর থেকে আকর্ষণই করে না, বরং ব্যক্তির আধ্যাত্মিক চাহিদাও পূরণ করে। এ বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে এমনি কিছু প্রমাণ অন্তর্ভুক্ত করে কুরআনের বিভিন্ন অলৌকিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা মুসলিমদের বিশ্বাসকে স্বস্তি ও উষ্ণতা দেবার জন্য যথেষ্ট হবে বলে আশা করি।

---

[19] *The Bible, Revised Standard Version*. 1977. Preface, p.iii.

প্রমাণ

উপক্রমণিকা

ইসলামের ইতিহাসের সাথে যারা তেমন পরিচিত নন, তাদের কাছে এ অধ্যায়ের বিভিন্ন তথ্য নতুন ও অদ্ভুত মনে হতে পারে। অবশ্য সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে এ সমস্ত বর্ণনা অত্যন্ত সুপরিচিত। আর শিক্ষিত মুসলিম সমাজ তো ইসলামের ইতিহাস ও কুরআনের আঙ্গিক বিন্যাস সম্পর্কে জানাকে মৌলিক জ্ঞান বলে বিবেচনা করে।

"বাইবেল খ্রিষ্টধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ যাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ম্যাথিউ, মার্ক, ল্যুক ও জনের লেখা চারটি সুসমাচার (Gospel)" – এ তথ্য খ্রিষ্টানদের কাছে যেমন নতুন কিছু নয়, অধিকাংশ মুসলিমের কাছে তেমনি কুরআন সম্পর্কে সাধারণ তথ্য কোন ভূমিকার অপেক্ষা রাখে না। তা সত্ত্বেও, কেউ প্রতিটি তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে চাইলে প্রসিদ্ধ মুসলিম বিশেষজ্ঞদের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্য নিতে পারেন। এক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে, শেখ আব্দুল আযীম আয-যারকানী রচিত 'মানাহিল আল-ইরফান ফী উলুম আল-কুরআন', মুহাম্মদ আবু শাহ্‌বাহ্ রচিত 'আল-মাদখাল লি দিরাসাত আল-কুরআন আল-কারীম' এবং ডঃ সুব্‌হী আল-সালিহ্ ও ডঃ মান্না আল-কাত্তান রচিত একই নামের দুটি পৃথক গ্রন্থ 'মাবাহিথ ফী উলুম আল-কুরআন'। এ গ্রন্থগুলো আরবী ভাষায় লেখা এবং এখনও ইংরেজীতে অনুবাদের অপেক্ষায় রয়েছে। ইংরেজী ভাষায় কুরআনের ইতিহাস, গঠনপ্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দুটি অনবদ্য বই উল্লেখযোগ্য। একটি আহমেদ ফন ডেনফার রচিত "Ulum Al-Qur'an: An Introduction to the Sciences of the Qur'an", যা থেকে কুরআন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ না হলেও হালকা ধারণা লাভ করা সম্ভব। অন্যটি আবু আম্মার ইয়াসীর কাযী রচিত "An Introduction to the Sciences of the Qur'aan"[20]। এ বইটি অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত ও বিচক্ষণতাপূর্ণ আলোচনায় সমৃদ্ধ।

ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিম সমালোচকদের বেশীর ভাগ রচনায় আমরা দেখে থাকি ধর্মান্ধতা ও বৈরী মনোভাবের প্রতিফলন। অথচ নিরপেক্ষতা ও পান্ডিত্যের মাপকাঠিতে এ ধরণের বেশীর ভাগ রচনার মান এত নীচু শ্রেণীর যে শুধু মুসলিম

---

[20] এ বইটি Al-Hidaayah Publishing, P.O. Box 3332, Birmingham, U.K. B10 9AW – এ ঠিকানায় পাওয়া যাবে।

নন বরং অনেক অমুসলিম শিক্ষিত ধর্মযাজক, প্রাচ্য-বিশারদ ও ধর্মীয় পন্ডিতদের কাছেও এগুলোর কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। একজন নামকরা লেখক তাই আক্ষেপ করে বলেছেন,

> "ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যে যে সমস্ত বিভ্রান্তিকর ধারণা প্রচলিত তার অন্যতম কারণ, হয় ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞানের স্বল্পতা কিংবা ইসলামের বিরুদ্ধে সুকৌশলী চক্রান্ত। সবচেয়ে আপত্তিকর হচ্ছে, বাস্তব প্রেক্ষাপট যাচাই না করে বিভিন্ন ইসলামী বর্ণনা বিকৃতভাবে উপস্থাপনের অপচেষ্টা। এছাড়া একাধিক বিশিষ্ট (অমুসলিম) লেখকের কিছু জনপ্রিয় রচনায় যেভাবে নির্জলা মিথ্যা বর্ণনা স্থান পেতে দেখা গেছে তা সত্যিই দুঃখজনক"[21]।

অমুসলিম লেখকদের এ ধরণের তথাকথিত 'পান্ডিত্যপূর্ণ রচনা' তাদের নিজ ধর্ম-বিশেষজ্ঞদের কাছেই গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। অন্যদিকে প্রচলিত ইসলামী বর্ণনাগুলো নিয়ে মুসলিম বিশ্বে দ্বিমত বলতে গেলে একেবারেই নেই। তাছাড়া ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রের যথার্থতা নিরূপণের যে বিজ্ঞান ইসলামে দীর্ঘ দিন ধরে গড়ে উঠেছে, তা ব্যবহার করে খুব সহজে যে কোন তথ্যের বিশুদ্ধতা যাচাই করা সম্ভব।

স্বীকার করছি, কিছু কিছু মুসলিম লেখকের লেখায় কখনও কখনও দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনার উল্লেখ পাওয়া গেছে। ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ নয় বরং ইসলামকে গৌরবান্বিত করার প্রবল আগ্রহের ফলে এমনটা ঘটা স্বাভাবিক। কিন্তু এ ধরণের দুর্বল লেখনীতেও অন্ততঃ 'কুরআনের ইতিহাস' নিয়ে সাধারণভাবে স্বীকৃত বর্ণনাগুলোর ব্যাপারে কোন অসামঞ্জস্যতা বা বৈসাদৃশ্য পাওয়া যাবে না। এ বইতে কুরআনের যে সমস্ত ইতিহাস নিয়ে ঐকমত্য আছে তা নিয়েই প্রধানতঃ আলোচনা করা হয়েছে।

---

[21] Maurice Bucaille, M.D. 1977. *The Bible, the Qur'an and Science.* Lahore: Kazi publications. pp. 110-111.

প্রথম প্রমাণ
কুরআনের অনির্বচনীয় আবেদন

'কুরআনের বিষয়বস্তু অর্থপূর্ণ, পাঠকের জন্য সহজবোধ্য এবং সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে মানুষের সহজাতবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ' - এ বৈশিষ্ট্যটি কুরআনের সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য সবচেয়ে সহজ প্রমাণ। কিন্তু কথা হচ্ছে, পৃথিবীতে এমন কোন্ ধর্মগ্রন্থ আছে যা নিজেকে বিশুদ্ধ বলে দাবী করে না? কুরআনের পক্ষে ভুরি ভুরি প্রমাণ আনা হলেও এর সত্যতা সম্পর্কে সমস্ত মানবজাতিকে সন্তুষ্ট করার জন্য সেগুলো যথেষ্ট হবে না, পৃথিবীর সবাই মুসলিম নন বলেই তা সম্ভব নয়। তারপরও কারো কারো কাছে কুরআনের উল্লেখিত এ বৈশিষ্ট্যটি এর সত্যতার সাক্ষ্য হিসেবে যথেষ্ট জোরালো বলে মনে হয়েছে।

যে কোন ধর্মের লোক নিজের ধর্মগ্রন্থের প্রতি এক ব্যাখ্যাতীত, অব্যক্ত আকর্ষণ অনুভব করে থাকে। মুসলিমদের বেলায় কুরআনও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু কেউ সুস্থির হয়ে কুরআন পড়তে বা শুনতে আরম্ভ করলে লক্ষ্য করবে যে, এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অন্যান্য আব্রাহামীয়[22] ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে আলাদা। যেমন, (ইহুদী-খ্রিষ্ট ধর্মগ্রন্থ) পুরাতন বাইবেল (The Old Testament) মূলতঃ ধর্মীয় আইন-কানুন সমৃদ্ধ গ্রন্থ, এতে অতীতের বিখ্যাত ব্যক্তিদের ইতিহাস এবং তাদের দীর্ঘ বংশতালিকার নিরস বর্ণনা বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। ফলে আধ্যাত্মিকতার বিষয়টি এখানে অনেকখানি অবহেলিত। আবার (খ্রিষ্ট ধর্মগ্রন্থ) নতুন বাইবেল (The New Testament) আধ্যাত্মিক উদ্দীপনায় সিঞ্চিত হলেও তা থেকে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক যেমন দৈনন্দিন জীবনের নিয়ম-কানুন, রাজনীতি, পারিবারিক কাঠামো ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা লাভ করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে কুরআনে যে শুধু ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চেতনার ভিত্তি রচিত হয়েছে তা-ই নয়; পাশাপাশি আইন-কানুন, শাসনতন্ত্র, পারস্পরিক আচরণ, পারিবারিক কাঠামোসহ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ের প্রতিটি ক্ষেত্র সম্পর্কে মৌলিক নির্দেশনাও স্থান পেয়েছে। মুহাম্মদ (ﷺ) এর প্রচারিত কুরআনের শিক্ষা ও তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে প্রখ্যাত লেখক এইচ. জি. ওয়েল্‌স মন্তব্য করেছেন,

> "...এ পৃথিবীর বুকে সততা ও ন্যায়বিচারের এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তারা (মুসলিম জাতি) উদারতার চেতনা সঞ্চারিত করেছিল বিশ্বজুড়ে। তারা এমন এক ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলেছিল যা আগের

---

22 ইহুদী, খ্রিষ্টান ও ইসলাম - এ তিনটি 'আব্রাহামীয় ধর্ম' নামে পরিচিত। (অনুবাদক)

যে কোন সমাজে দৃষ্ট নিষ্ঠুরতা ও সামাজিক অন্যায়-অবিচার থেকে মুক্ত ছিল।...খুব সহজ ও বোধগম্য 'ইসলাম' ধর্ম - মহানুভবতা, ঔদার্য ও ভ্রাতৃত্বের চেতনায় পরিপূর্ণ। ইসলাম মরুভূমির বীরত্বের উদ্দীপনায় ভরপুর, সেই সাথে সাধারণ মানুষের সহজাতবোধ ও চিন্তাধারায় আবেদন সৃষ্টি করতেও পুরোপুরি সক্ষম। এর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছিল সংকীর্ণমনা ইহুদীধর্ম, যা 'সৃষ্টিকর্তাকে' নিজ জাতির ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করেছে; খ্রিষ্টধর্ম, যেখানে ট্রিনিটি (ত্রয়ী-ঈশ্বরবাদ)সহ নানারকম অভিনব ধর্মীয় দর্শন প্রচার করা হয় যার মাথামুন্ডু উদ্ধার করা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে; পার্সী পুরোহিতদের অনুসৃত মাজ্‌দাইজম (অগ্নিউপাসনা বা পার্সীধর্ম), যারা মনির ক্রুশবিদ্ধকে অনুপ্রাণিত করেছিল ইত্যাদি। ইসলামের চ্যালেঞ্জ যাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছিল তারা মোটেই মাথা ঘামায়নি যে, মুহাম্মদ (ﷺ) কামুক ছিলেন কি-না কিংবা তিনি ছলনার আশ্রয় নিয়ে সন্দেহ উদ্রেককারী কোন কাজ করেছেন কি-না। ইসলামের যে বিষয়টি তাদের মধ্যে প্রধান আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা হল - তাদের অন্তরাত্মায় গ্রথিত স্রষ্টার চিরন্তন ভাবমর্যাদার সাথে তারা মুহাম্মদ (ﷺ) এর প্রচারিত ন্যায়পরায়ণ, কল্যাণময় 'আল্লাহর (ﷻ) বর্ণনা ও গুণাবলীর আশ্চর্যজনক মিল খুঁজে পেয়েছিল[2 3]। ফলে অনিশ্চয়তা, প্রতারণা ও অসহনীয় বিভেদপূর্ণ পৃথিবীতে মুহাম্মদের (ﷺ) প্রচারিত বিশ্বাস খুব অল্প সময়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বিশ্বজুড়ে বিশ্বাসীদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন গড়ে তুলেছিল। তাঁর প্রচারিত শিক্ষা এ পৃথিবীর বুকে এমন স্বর্গ রচনা করেছিল যা কেবল সাধু-সন্ন্যাসী, পুরোহিত আর অভিষিক্ত রাজন্যের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। বরং বোঝা ও অনুসরণের ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণেরও ছিল তাতে সমান অধিকার। এতকাল এরকম একটি ধর্মের প্রতীক্ষায় যেন তাদের অন্তর উন্মুখ হয়ে ছিল। কোন রকম রহস্যময়তা, প্রতীকবাদ, ক্ষীণালোক পূজার বেদী কিংবা পুরোহিতের

---

2 3 প্রত্যেকটি মানব সন্তান স্রষ্টা সম্পর্কে যে সহজাত বোধ নিয়ে জন্ম লাভ করে, ইসলামী শিক্ষা তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। - (অনুবাদক)

কীর্তন ছাড়াই স্বচ্ছ, সহজ ও আবেদনময় বিশ্বাস ও মতবাদ দিয়ে মুহাম্মদ (ﷺ) বিশ্ব হৃদয়কে নাড়া দিয়েছিলেন"।[24]

ইসলামী বিশ্বাসের মূলভিত্তি হল 'একত্ববাদের' সহজ-সরল মতবাদ। মহিমান্বিত কুরআনের বর্ণনায় বারবার 'একত্ববাদ' ঘুরে-ফিরে প্রাধান্য পেয়েছে। সৃষ্টিকর্তা প্রতিটি মানুষের মন, হৃদয় ও আত্মা সৃষ্টি করেছেন তাঁর অস্তিত্ব ও গুণাবলীর একত্বের সহজাতবোধ দিয়ে[25]। মুসলিমরা তাই মনে করে যে, সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে একত্ববাদের জ্ঞানই মানব হৃদয়ে সবচেয়ে গভীর আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম। কোন ব্যক্তি যখন কুরআনে অদ্বিতীয় স্রষ্টার অনুপম নাম ও গুণাবলীর বর্ণনা এবং একমাত্র স্রষ্টার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কথা ও কাজকে কেন্দ্রিভূত করার উপদেশ দেখতে পায়, তখন তার পক্ষে কুরআনের এ শক্তিশালী একত্ববাদী আহ্বানকে অস্বীকার করা সহজ হয় না।

মহান স্রষ্টা আল্লাহর (ﷻ) একত্ববাদ সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য অত্যন্ত স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। ইসলাম শেখায় - আল্লাহ (ﷻ) এক ও অদ্বিতীয়, আদি-অন্তহীন এবং পরমুখাপেক্ষিতাহীন। তিনি কারো জনক নন, জাতকও নন এবং অলৌকিক গুণ ও ক্ষমতায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অংশীবিহীন ও সাদৃশ্যহীন।

"বলঃ তিনিই আল্লাহ একক (ও অদ্বিতীয়),
আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, (সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী);
তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন,
এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই"।
(ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, সুরাহ্ ইখলাস:১-৪)

ইসলামী একত্ববাদের এ আপোষহীন ঘোষণায় খ্রিষ্টানদের যত আপত্তি। কেননা খ্রিষ্টধর্মের ট্রিনিটি মতবাদ (বা ত্রয়ী ঈশ্বরবাদ) অনুযায়ী স্রষ্টা একজন বটে, তবে

---

24 Wells, H. G. Volume 2, pp 686-688.

25 স্থান-কাল-ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তি এ সহজাত বোধ নিয়ে জন্মায় যে, বিশ্বজগত সৃষ্টির পিছনে একজন স্রষ্টা আছেন এবং সমস্ত উপাসনা এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টারই প্রাপ্য, এ ব্যাপারে তাঁর কোন অংশীদার নেই। ইসলামী ধর্মমতে এ বোধ মানুষের জন্মগত প্রবণতা যা 'ফিতরাহ্' নামে পরিচিত। - (অনুবাদক)

তিনি তিন সত্তার সমন্বয়ে একক সত্তা[26]। ট্রিনিটির এ দর্শনকে উদাহরণ হিসেবে মনে রেখে, যে কোন ধর্মের সত্যতা যাচাইয়ে 'মানব সহজাত প্রকৃতি'কে পরীক্ষার মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। একথা স্বীকৃত যে, সহজাতবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ধর্মীয় শিক্ষা ব্যক্তির বিশ্বাসকে এক ধরণের দৃঢ়তা ও স্বস্তি দেয়। অন্যদিকে সহজাতবোধের বিপরীত ধর্মীয় শিক্ষা মনের উপর চাপ আর দ্বন্দ্ব তৈরী করে। এ ব্যাপারটি যে কোন ধর্মবিশ্বাসের যথার্থতা যাচাইয়ের পরীক্ষায় প্রয়োগ করা যায়।

দেখা গেছে যারা মানবপ্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ধর্মমত পোষণ করে তারা নিজ ধর্মবিশ্বাস অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করে দৃঢ় প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে। এর কারণ, তাদের ব্যাখ্যা শুধু যে তাদের নিজের কাছে গ্রহণযোগ্য তা-ই নয়, শ্রোতার সহজাতবোধের সাথেও তা সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, তারা শ্রোতার কাছে সেই বিষয়টিই তুলে ধরে যা শ্রোতার 'হৃদয়' ইতোমধ্যে সত্য বলে জেনেছিল, কিন্তু 'কর্ণ' কখনও শোনেনি। অন্যদিকে, যারা সহজাতবোধের সাথে বিরোধিতাপূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করে তারা নিজ ধর্মমত অন্যের কাছে ব্যাখ্যা করার সময় এক ধরণের হতাশা, অস্বস্তি ও মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগে। তাদের ব্যাখ্যা শ্রোতার কাছে স্বীকৃত হতে হলে সহজাতবোধের দুটি আভ্যন্তরীণ বাধা অতিক্রম করতে হয়, একটি বক্তার নিজের ও অন্যটি শ্রোতার। এজন্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি যে কোন সময়ে, যে কোন স্থানে তার ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আলাপ করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে। তাছাড়া, তার আলোচনা আকর্ষণীয় ও আবেদন সৃষ্টিকারী বলেও প্রতীয়মান হয়। যারা আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে রয়েছেন তারা সাধারণত

---

[26] খ্রিষ্টধর্মে উপাস্যের ধারণা Trinity (tri-unity)'র উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। *Encyclopaedia Britannica*'য় *Trinity*'র সংজ্ঞায় বলা হয়েছে - "খ্রিষ্টধর্মের ট্রিনিটি মতবাদ অনুযায়ী বিশ্বাস করা হয় যে, 'পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর এবং তাঁরা তিন নয় বরং এক ঈশ্বর"।

"পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা, এরা প্রত্যেকে পৃথকভাবে ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও মিলিতরূপে কী করে 'এক' ঈশ্বর হন? তারা নিঃসন্দেহে তিন স্বতন্ত্র সত্তা। এ প্রশ্নটি খ্রিষ্টধর্মের সূচনালগ্ন থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত এক বিরাট রহস্য তৈরী করেছে। বড় বড় খ্রিষ্টান পন্ডিতরা জনসাধারণের কাছে বিভিন্ন কায়দায়, বিভিন্ন উপায়ে এ প্রশ্নের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। ভিন্নমূখী এ সমস্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ক্রমে খ্রিষ্টধর্মে জন্ম নিয়েছে হাজারো উপদল"। *[Mohammad Taqi Usmani, What is Christianity?, pp. 14,15]* – (অনুবাদক)

নিজেদের ধর্মমত নিয়ে আলোচনা এড়িয়ে চলেন। আর কখনও এ ব্যাপারে বাধ্য হলে তাদের কথাবার্তায় যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দানের অপারগতা প্রকাশ পায়। সেই সাথে ফুটে উঠে আত্মবিশ্বাসের অভাব, হতাশা ইত্যাদি। তখন তারা নানারকম আবেগপূর্ণ, আত্মপ্রশংসামূলক নাটুকে বাক্য প্রয়োগ করে এ ব্যর্থতা ঢাকবার প্রয়াস খোঁজেন।

মহিমাময় কুরআনে উপাস্য সম্পর্কে একত্ববাদের সহজ বিশ্বাসের পাশাপাশি মানুষের জীবনের বিভিন্ন বাস্তব পথনির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কুরআনে আলোচিত ন্যায়পরায়ণতা ও সমতা, প্রীতি ও করুণার শিক্ষা সুবিচারমূলক নিয়মতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে। সাথে সাথে এ ন্যায়সঙ্গত নিয়মতন্ত্র সেই সব লোকের প্রতি কঠোর যারা ইসলামী সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায়। তাই হত্যা, ধর্ষণ, চুরি, ব্যভিচার, অশ্লীলতা, সমকামিতা, মাদকতা ইত্যাদি অন্যায় প্রতিরোধে মানব ইতিহাসে আর কোন আইনব্যবস্থা ইসলামের মত এতটা কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়নি। প্রতারণা, মিথ্যাচার, ঘুষ, সুদ, কুসংস্কারসহ সবরকম অবিচার ইসলামের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য। সমাজ সংস্কারের এ বাস্তব পদক্ষেপ সফলতার সাথে কার্যকরী করা গেলে বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সমস্ত মানবজাতিকে এক ও অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তার অধীনে একতাবদ্ধ করা সম্ভব হত।

অমুসলিমদের (মুসলিমদের কিছু অংশও এর অন্তভুর্ক্ত) কাছে পুরুষের একাধিক বিয়ের বিষয়টি অগ্রহণযোগ্য হলেও কুরআনে তা অনুমোদিত হয়েছে। 'একাধিক স্ত্রী গ্রহণ' এমন অনেকের জন্য আইনসম্মত বৈবাহিক সম্পর্কের পথ তৈরী করেছে, যা না হলে তাদের পক্ষে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার ভয় ছিল। অথচ তাতে মুসলিম মহিলাদের অধিকার কিছুমাত্র খর্ব হয়নি। বরং তারা চৌদ্দ'শ বছর ধরে ইসলামের ছায়াতলে এমন সব অধিকার ও নিরাপত্তা ভোগ করে আসছে যা থেকে পশ্চিমা সমাজ ও ইহুদী-খ্রিষ্ট মহিলারা বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বঞ্চিত ছিল। যেমন, সম্পদ-মালিকানার অধিকার, উত্তরাধিকার, স্বাধীনভাবে ধর্মপালন ও শিক্ষা লাভের অধিকার ইত্যাদি।

কুরআনে মানুষের নৈতিক আচরণ ও শিষ্টাচারকে পরিশুদ্ধ করা হয়েছে, নম্রতা-শালীনতার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে এবং চরমপন্থী আচরণ বাদ দিয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থ-সম্পদ, সময় ও শক্তির যথার্থ ব্যবহার নিয়েও নির্দেশ বাদ পড়েনি। এ সমস্ত ব্যাপারে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে মনোযোগী হতে উপদেশ দেয়া হয়েছে। একদিকে যেমন কার্পণ্যকে নিন্দা করা হয়েছে, অন্যদিকে অপচয়কেও নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। সব রকম শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শত্রুপক্ষের সাথে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠলে, পরিমিতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সমরক্ষেত্রে বিশেষ আইন ও নিয়ম-নীতির বিধান দেয়া হয়েছে। দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও যুদ্ধবিগ্রহের সময়ও মুসলিমদের উপদেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন অন্যায়-অবিচার এড়িয়ে চলে এবং পরিস্থিতি বুঝে যথাসম্ভব বদান্যতা ও মহানুভবতা দেখায়।

মহিমান্বিত কুরআন একদিকে যেমন দাস-মুক্তির প্রশংসনীয় উদ্যোগকে উৎসাহিত করেছে, অন্যদিকে মানুষের হৃদয়কে মুক্ত করেছে অন্ধভাবে অনুসৃত বাতিল ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক সংস্কারের বেড়াজাল থেকে। কুরআন চিন্তাশীল মানুষকে মুক্ত চিন্তার দিকে আহ্বান জানায়। সেই সাথে ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা, সামাজিক রীতিনীতি, পারিবারিক প্রথা, পারিপার্শ্বিক কুসংস্কারগ্রস্ত প্রভাব ইত্যাদি সমস্ত কিছুর উপর 'সত্য'কে অগ্রাধিকার দান করে। কুরআনের বাণী অনুযায়ী, ধর্মান্তরের ব্যাপারে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার উপর জোরজবরদস্তি সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। কুরআন মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে উদ্দীপ্ত ক'রে যেমন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়, তেমনি আত্মাকে প্রশমিত স্পর্শে পরম স্বস্তি দান করে। সংক্ষেপে, মানুষের জন্যে 'স্রষ্টার সর্বশেষ প্রত্যাদেশ' (God's Last Testament) যেমনটি হওয়া উচিত বলে মানুষ আশা করে, ঠিক তেমনিভাবে কুরআন মানবজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বাঙ্গীন পথনির্দেশনা দান করে।

কেউ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলে তার কাছে কুরআনের শিক্ষা ও প্রমাণ অকাট্য বলে মনে হবে। কিন্তু কুরআন যদি কারো অনুভূতিকে অতৃপ্ত ও অপূর্ণ রাখে তবে এর সত্যতার পক্ষে সহজাতবোধের যে দাবী তোলা হয়েছে তা ভুল প্রতিপন্ন হয়। এখন, মুসলিমরা এ ধাঁধার সমাধান কী করে করবে? একদিকে তাদের দাবী যে,

স্রষ্টা সম্পর্কে মানুষের সহজাতবোধের সাথে কুরআনের বাণী সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। অন্যদিকে আমরা দেখছি, যুগে যুগে মানবজাতির একটি বিরাট অংশ কুরআনের বাণীকে অস্বীকার করেছে এবং এখনও করে চলেছে।

আপাত প্রতীয়মান এ দ্বন্দ্বের সমাধান হিসেবে বলা যায় যে, কোন ব্যক্তি তখনই কুরআনের শিক্ষাকে হৃদয়ের সহজাতবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ দেখতে পাবে, যখন তার হৃদয় হবে সবরকম সংস্কার ও প্রথাগত বিশ্বাসের বেড়াজাল থেকে মুক্ত। উর্বর ভুমির মত তার মুক্ত হৃদয়ে তখন সেই ফসলই ফলবে যার জন্য স্রষ্টা তাকে সৃষ্টি করেছেন। অন্যদিকে যারা হৃদয়ের চারণভূমিকে মানুষের তৈরী বিভ্রান্তিকর দর্শন ও শিক্ষার জঞ্জালে পূর্ণ হতে দিয়েছে তাদের চিন্তাশক্তি হয়ে গেছে অবরুদ্ধ, হৃদয় তালাবদ্ধ, কর্ণ বধির ও দৃষ্টি আবৃত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন অন্ধ লোকের কাছে আলোর স্ফূটন তত্ত্ব, আলোক বর্ণালীর উপর প্রিজমের প্রভাব, ফটোগ্রাফীর গূঢ় তত্ত্ব ইত্যাদির কোন আবেদন নেই। তেমনি ইসলামের প্রতি অবরুদ্ধ হৃদয় ইসলামী প্রমাণের মর্ম উপলব্ধি করবে বলেও আশা করা যায় না। তাই মুসলিমদের কথা হল - অন্ধ দেখতে পায় না বলেই আলোর উপস্থিতিকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, অনেকের কাছে অগ্রাহ্য হলেও তেমনি কুরআনের চিরন্তন 'সত্য' মিথ্যা হয়ে যায় না। কুরআনের আহ্বান কে গ্রহণ করবে আর কে উপেক্ষা করবে তা বিভিন্ন প্রামাণিক তথ্য পরীক্ষার উপর নির্ভর করে। যাদের কাছে এ সব প্রমাণ অকাট্য মনে হবে তারা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীও বুঝতে পারবে। আর যারা অকাট্য মনে করবে না, তারা বুঝবেও না। এ কথার সমর্থনে আল্লাহ (ﷻ)মানবজাতির উদ্দেশ্যে বলেন যে, তিনি ইচ্ছে করলে সমস্ত সৃষ্টিকে ঐকমত্যের উপর রাখতে পারতেন, কিন্তু তিনি তাঁর অনন্ত প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের কারণে তা করেননি।

> *"এবং যদি তোমার প্রতিপালকের ইচ্ছা হতো, তবে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন (কিন্তু এরূপ করেননি), আর তারা সদা মতভেদ করতে থাকবে"। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, সুরাহ্ হুদ:১১৮)*

আল্লাহ (ﷻ)যাকে ইচ্ছা পথ দেখান আর যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্তির মধ্যে ছেড়ে দেন। কুরআনের আয়াত থেকে তা প্রমাণিত হয়,

"তুমি বল: আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং তিনি তাদেরকেই তাঁর পথ দেখান যারা তাঁর অভিমুখী"।

(ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, সুরাহ্ রা'দ: ২৭)

প্রজ্ঞাময় আল্লাহ (ﷻ)কিছু লোককে কল্যাণের জন্য নির্বাচন করেন আর কিছু লোককে তাঁর বাণীর সত্যতা উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত রাখেন। তার কারণ এ নয় যে, তিনি খামখেয়ালী কিংবা স্বেচ্ছাচারী। বরং ব্যক্তির নিজস্ব আগ্রহ ও প্রচেষ্টার ভিত্তিতে স্রষ্টা তাঁর এ অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। তিনি বলেন,

"আমি রসূলদের তো শুধু এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে থাকি যে, তারা (সৎ লোকেদেরকে) সুসংবাদ দেবে এবং (অসৎ লোকেদেরকে) ভয় দেখাবে, সুতরাং যারা ঈমান এনেছে ও চরিত্র সংশোধন করেছে তাদের জন্যে কোন ভয়ভীতি থাকবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না। আর যারা আমার আয়াত ও নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তারা নিজেদের ফাসেকীর কারণে শাস্তি ভোগ করবে"।

(ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, সুরাহ্ আল-আন'আম: ৪৮, ৪৯)

"তোমার উপর যে কল্যাণ উপস্থিত হয় তা আল্লাহর সন্নিধান হতে এবং তোমার উপর যে অমঙ্গল নিপতিত হয় তা তোমার নিজ হতে হয়ে থাকে"। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, সুরাহ্ নিসা:৭৯)

অন্য কথায়, যারা সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস আনে এবং তাঁর পথ পাবার যোগ্যতা রাখে তারাই পথ পায়। আর যারা সত্য বুঝতে পেরেও তা প্রত্যাখ্যান করে তারা স্রষ্টার কল্যাণ লাভের পথকে নিজের হাতে রুদ্ধ করে দেয়। সৃষ্টিকর্তাকে যে অস্বীকার করে তাকে যে তিনি পথ দেখান না তা আমরা দৈনন্দিন উদাহরণ থেকে বুঝতে পারি। যেমন, শিক্ষক সেই সব ছাত্রদের প্রতি যত্নশীল হন যারা নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকে। গ্যাস স্টেশনের কর্মচারী তাকেই রাস্তার সঠিক দিক বলে দেয়, যে তার কাছে জানতে চায়। যারা জ্ঞান অর্জন করতে অথবা দিক নির্দেশনা জানতে আগ্রহী নয় তারা অজ্ঞই থেকে যায়, আর এর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। যারা বিভ্রান্তির দিকে জেনে শুনে পা বাড়ায় তারা বিভ্রান্তির অতলে আরো তলিয়ে যেতে থাকে।

উপরের এ বাস্তবতা শুধু কুরআনে নয়, পুরাতন ও নতুন বাইবেলেও আলোচিত হয়েছে। এ ভাবে এ গ্রন্থগুলো একে অপরের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে। পুরাতন বাইবেল বলে,

> "তারা জানে না, বুঝেও না। তিনি তাদের চক্ষু বন্ধ করে দিয়েছেন, ফলে তারা দেখে না। এবং তাদের হৃদয় অবরুদ্ধ করে দিয়েছেন, ফলে তারা বুঝে না"। (বাইবেল, আইসায়্যাহ্:৪৪:১৮)

অনুরূপ বক্তব্য আমরা নতুন বাইবেলেও দেখি মার্ক ৪:১১ থেকে ১২ নং এবং ম্যাথিউ ১৩:১১ থেকে ১৫ নং চরণে। সুতরাং, সুপথের জন্য মনোনীত হবার দায় ব্যক্তির নিজের। সে ব্যক্তিই সুপথপ্রাপ্ত হবে যে স্রষ্টার কল্যাণময় আহ্বানে সাড়া দেবে। আর যারা জেনে শুনে পথভ্রষ্টতাকে বেছে নেয় তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের জন্য দায়ী। আন্তরিক বিশ্বাসী ও স্রষ্টা-অভিমূখীদের আল্লাহ (ﷻ)কল্যাণময় পথ দেখান যা তাঁর অনন্ত করুণার নিদর্শন। আর সত্যের আহ্বান বারবার উপেক্ষাকারীকে আল্লাহ (ﷻ)বিভ্রান্তিতে ফেলে রাখেন যা তাঁর ন্যায়বিচারের নিদর্শন।

ইসলামী এ দৃষ্টিভঙ্গী অনেকের কাছে গোঁড়ামীপূর্ণ মনে হলেও বিশ্বের অন্যান্য ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু এর থেকে ভিন্ন কিছু নয়। সব ধর্মের অনুসারী মনে করে,'সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহে আমরাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল, বাকি সবাই নরকের ইন্ধন'। নব্যুয়তে বিশ্বাসী অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরাও নিজেদেরকে 'সৃষ্টিকর্তার মনোনীত দল' বলে উল্লেখ করে, সেই সাথে এরকম দাবীর সমর্থনে যুক্তি ও কারণও দেখিয়ে থাকে। ভালভাবে নিরীক্ষণের পর বোঝা যায় এসব যুক্তি ও কারণ অধিকাংশই দুর্বল। তারা ছাড়া অন্য দলগুলো কেন মুক্তি লাভ করবে না, সেই প্রশ্নটির কোন যুক্তিসম্মত উত্তর এদের কাছে নেই। 'কেন সৃষ্টিকর্তা কিছু লোককে পথ দেখান আর কিছু লোককে দেখান না?' - সাধারণ মানুষের এ কৌতুহলী জিজ্ঞাসার গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে অন্যান্য ধর্ম ব্যর্থ হয়েছে। ইসলামের সাথে অন্য ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে অন্যতম পার্থক্য হল, ইসলাম এ বিষয়টির অভ্রান্ত ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়েছে। স্রষ্টা সম্পর্কে সহজাত অনুভূতির কারণে অধিকাংশ মানুষের হৃদয় একথা মেনে নিতে পারে না যে, স্রষ্টা স্বেচ্ছাচার ও খামখেয়ালের উপর ভিত্তি করে সুপথপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাচন করেন। মানুষ তাই স্বস্তিদায়ক বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা খোঁজে।

মুসলিমরা দাবী করে যে, কেউ খোলা মন নিয়ে এক বা একাধিক প্রমাণ গবেষণা করে দেখলে কুরআনের ব্যাপারে কৌতুহল বোধ না করে পারবে না। তাছাড়া আসমানী গ্রন্থের ক্ষেত্রে যেরূপ আশা করা হয় তেমনিভাবে আল্লাহ (ﷻ)কুরআনে সবার জন্য কিছু না কিছু প্রমাণ বিবৃত করেছেন। যাতে প্রত্যেকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কুরআন মানুষের রচনা নয় বরং পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় সৃষ্টিকর্তার অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থ। (বিভিন্ন প্রমাণ গবেষণার পর) কুরআনের ব্যাপারে এ দাবী মেনে নেয়া যত সহজ, অস্বীকার করা তত সহজ নয়। কেবল দুর্দমনীয়, একগুঁয়ে ব্যক্তির পক্ষেই তা অস্বীকার করা সম্ভব।

মানুষের মধ্যে কোন নারী বা পুরুষ যদি স্বেচ্ছায় বিভ্রান্তির পথ বেছে নিতে চায়, তবে তার জন্যে আল্লাহ (ﷻ)কে দোষারোপ করা যায় না। কারণ আল্লাহ (ﷻ)প্রতিটি মানুষকে স্রষ্টা সম্পর্কে সহজাত অনুভূতি ও প্রবণতাসহ সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাছাড়া, পরবর্তীতে তিনি নবী-রসূলদের মাধ্যমে এমন বার্তা পাঠিয়েছেন যা মানবাত্মায় গ্রথিত সহজাতবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আল্লাহ (ﷻ)সত্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন এবং মানবজাতিকে সরাসরি জান্নাতের সুখসমৃদ্ধ অনন্ত জীবনে না পাঠিয়ে পৃথিবীর বুকে পাঠিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য। এখন হয় মানুষ এ আসমানী বার্তার সত্যতা স্বীকার করে মৃত্যুর পর জান্নাতে তার চিরস্থায়ী আবাস তৈরী করে নেবে, আর না হয় নিজেই নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহ (ﷻ)যেমন বলেছেন,

> *"আমি রসূলদের তো শুধু এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে থাকি যে, তারা (সৎ লোকদেরকে) সুসংবাদ দেবে এবং (অসৎ লোকদেরকে) ভয় দেখাবে, সুতরাং যারা ঈমান এনেছে ও চরিত্র সংশোধন করেছে তাদের জন্যে কোন ভয়ভীতি থাকবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না। আর যারা আমার আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তারা নিজেদের ফাসেকীর কারণে শাস্তি ভোগ করবে"। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, সুরাহ্ আল-আন'আম: ৪৮, ৪৯)*

দ্বিতীয় প্রমাণ
কুরআনের অনন্য সাহিত্যগুণ

কুরআন এক ও অভিন্ন হলেও দশ রকম পঠন-পদ্ধতি (recitation) এবং সাতটি ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারণে (dialects) এ গ্রন্থ আবৃত্তি করা যায়। এটা কেমন করে সম্ভব তা নিয়ে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। এর উত্তর লুকিয়ে আছে আরবী ভাষার গঠণ প্রণালীতে। আরবী এমন একটি ভাষা যেখানে ইংরেজীর মত স্বরধ্বনি (vowel) নেই। ফলে আরবীতে স্বরবর্ণসূচক উচ্চারণ প্রকাশ করা হয় ব্যঞ্জনবর্ণের উপরে বা নীচে নির্দিষ্ট কিছু চিহ্ন[27] বসিয়ে (যেমন, মাত্রা ইত্যাদি)। উদাহরণস্বরূপ, ইংরেজী 'b' বর্ণটির আরবী উচ্চারণ হবে 'বা' ও 'বি', যদি মাত্রাটি বসানো হয় বর্ণের যথাক্রমে উপরে এবং নীচে। এ বর্ণটি বিভিন্ন রকম চিহ্ন বসানোর ফলে 'বু', 'বান্', 'বিন্', 'বুন্', 'বা-', 'বী', 'বাই', বাউ' ইত্যাদি নানাভাবে উচ্চারিত হতে পারে। আর যদি নির্দিষ্ট কোন চিহ্ন উল্লেখ করা না হয় তবে একই শব্দ একাধিক অর্থ প্রকাশ করতে পারে, যেহেতু সেক্ষেত্রে এর সম্ভাব্য উচ্চারণও হবে ভিন্ন ভিন্ন রকম। যেমন, 'অধিকারী' ও 'রাজ্যাধিপতি' বোঝানো হয় যে দু'টি আরবী শব্দ দিয়ে (যথাক্রমে 'মা-লিক' ও 'মালিক') তাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে শুধুমাত্র একটি স্বরবর্ণ চিহ্নের। সুতরাং এ সমস্ত চিহ্নের অনুপস্থিতিতে প্রসঙ্গ ও পরিপ্রেক্ষিত (context) অনুযায়ী শব্দটির সঠিক অর্থ বুঝে নিতে হয়।

কুরআনের মৌখিক আবৃত্তি এবং মূল 'মুসহাফ' – কোনটিতেই স্বরচিহ্ন উল্লেখ করা নেই। এর ফলে চিহ্নহীন শব্দগুলোয় যেরকম চিহ্ন বসানো হবে তার উপর ভিত্তি করে সাত রকম আঞ্চলিক উচ্চারণে, দশ ধরণের স্বীকৃত পাঠের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে বিস্ময়কর হল, যে কোন পদ্ধতিতে কিংবা যে কোন উচ্চারণ রীতিতেই কুরআন আবৃত্তি করা হোক না কেন – এর অর্থ সবসময় একে অপরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও পরিপূরক থাকে। এর একটি উদাহরণ হল, 'অধিকারী' ও 'রাজ্যাধিপতি' অর্থ দু'টি – ('মা-লিক' কিংবা 'মালিক', যেভাবেই উচ্চারিত হোক না কেন), দু'টিই আল্লাহ (ﷻ)র গুণাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে যথার্থ ও

---

[27] আরবীতে এ চিহ্নগুলো 'ফাত্হা','কাসরা','দাম্মা' এবং বাংলায় 'যবর', 'যের','পেশ' নামে পরিচিত। - (অনুবাদক)

নির্ভুল।[২৮] এর ফলে, পড়বার সময় আরবী ভাষায় গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে কুরআনের অর্থ সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং ভাব ও অর্থে সমৃদ্ধ শব্দের বৈচিত্র তার মনকে বিশ্বাস ও আবেগে উদ্বেলিত করে তোলে।

ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে যাদের কাছে স্বরচিহ্নহীন গ্রন্থের ব্যাপারটি বোঝা কষ্টকর, তাদেরকে বাইবেল ও কুরআনের সাদৃশ্যের বিষয়টি ভেবে দেখতে আহ্বান জানানো হচ্ছে। কারণ পুরাতন বাইবেলের মূললিপিও কুরআনের মত স্বরচিহ্নহীন। পুরাতন বাইবেল সম্পর্কে Encyclopaedia Britannica'য় বলা হয়েছে,

> "(নতুন বাইবেলের) মূললিপিগুলো স্বরবর্ণসূচক চিহ্ন ছাড়া লেখা হয়েছিল। পরবর্তীতে Masorete[২৯] রা উচ্চারণের শুদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্যে স্বরবর্ণসূচক প্রতীকের ব্যবহার চালু করেছে। তারা যে সমস্ত উচ্চারণ পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিল সেগুলোর মধ্যে গ্যালিলির টিবেরিয়াস শহরে প্রবর্তিত রীতিটি ছিল প্রধান। স্বরচিহ্ন ছাড়াও উচ্চারণে কাঠিন্য ও বিরতি বোঝানোর জন্যে বিশেষ বিশেষ চিহ্ন যোগ করা হয়েছিল, যাতে সিনেগগগুলোতে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে সাধারণ লোকের কোন অসুবিধা না হয়"।[৩০]

কুরআনের বিভিন্ন রকম আবৃত্তি রীতির মধ্যে 'হাফ্স আল আসিম' রীতিতে মুসহাফগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল যাতে মুসলিমদের পক্ষে শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তির কাজটি সহজ হয়। আজ ঈসা (ﷺ) এর ইঞ্জিলের মূল কপিটি যদি খুঁজে পাওয়া যেত, তবে দেখা যেত সেটিও স্বরচিহ্নহীন। কেননা ঈসা (ﷺ) যে আরামাইক ও প্রাচীন হিব্রু ভাষায় কথা বলতেন, কুরআনের মত তাতেও কোন স্বরচিহ্ন নেই।

---

[২৮] 'মা-লিক' (অধিকারী)অথবা 'মালিক' (রাজ্যাধিপতি) যেভাবেই উচ্চারিত হোক, উভয়ের অর্থই আল্লাহর (ﷻ) গুণাবলী হিসেবে যথার্থ। - (অনুবাদক)

[২৯] Masorete'রা ৭ম -১১শ শতকের বাইবেল-বিশেষজ্ঞ যারা বাইবেলের মূল হিব্রু লিপিতে স্বরবর্ণসূচক প্রতীক প্রণালী প্রবর্তন করেছিলেন। (সূত্র: উইকিপেডিয়া, মুক্তবিশ্বকোষ) – (অনুবাদক)

[৩০] *Encyclopadae Britannica*. CD-ROM.

বাইবেলের The Revised Standard Version এর ভূমিকায় পুরাতন বাইবেল সম্পর্কে বলা হয়েছে,

> "Masorete'রা যে স্বরচিহ্ন ব্যবহার করেছিল, তা সবাই মেনে নিয়েছে। তবে আরো সম্ভাব্য ও অর্থবহ পঠনের সুযোগ সৃষ্টি হবে যদি ভিন্ন স্বরবর্ণ চিহ্ন ব্যবহার করা যায়"।[31]

অর্থাৎ এ ধরনের স্বরচিহ্নহীন লিপিকে ইচ্ছেমত, সুবিধানুযায়ী ব্যবহার করার যথেষ্ট সুযোগ থাকে। আরেকটি মজার ব্যাপার হল, Masorete'দের স্বীকৃত রূপ পাবার আগে হিব্রু লিপিগুলোতে কোন রকম যতিচিহ্ন, স্বরচিহ্ন, বড় হাতের অক্ষর, এমনকি দু'টি শব্দের মাঝখানে ফাঁক পর্যন্ত ছিল না। নিছক মজা করার উদ্দেশ্যে কেউ যদি যে কোন ভাষায় একটি বাক্যের সব শব্দগুলোকে এক সঙ্গে জুড়ে দেয় এবং বড় হাতের অক্ষরগুলো ছোট হাতের অক্ষরে লিখে সমস্ত যতিচিহ্ন, স্বরচিহ্ন তুলে দেয় তবে দেখতে পাবে যে, অবশিষ্ট বর্ণমালা থেকে কত বিচিত্র রকমের ভিন্নমুখী অর্থ বের করে আনা যায়। এভাবে 'God is One' হয়ে যাবে 'gdsn'। এবার এ বর্ণগুলোকে নানাভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে – হাস্যকর 'good sin' থেকে নিন্দনীয় 'God-Son' পর্যন্ত, কিংবা মূল 'God is One'। বাইবেলে মার্ক ১২:২৯-৩০, ম্যাথিউ ২২:৩৭ ও ল্যুক ১০:২৭ চরণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ঈসা (ﷺ) এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ছিল – "The Lord is One ....This is the first commandment". (অর্থ, "প্রভু একজন,..এটাই সর্বপ্রথম আদেশ")

সুতরাং যেভাবে উল্লেখ করা হল সেভাবে বাক্যটিকে ব্যবহার করলে অর্থ দাঁড়ায় – 'প্রভু একজন' (God is One) অথবা 'প্রভুর একজন' (God's one), এমনকি 'প্রভুর পুত্র' (God's son)। এখানে বলা প্রয়োজন যে, সেমিটিক ভাষায় যে কোন ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বৈত (বা দু'বার) উচ্চারণ সম্ভব[32]। এভাবে কলমের সামান্য আঁচড়ের পার্থক্য ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাসে কত আকাশ-পাতাল তফাৎ তৈরী করতে পারে!

---

31 *The Bible, Revised Standard Version*. 1977. Preface, pp.iv.

32 আরবীতে একে তাশদীদ বা শাদ্দাহ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। - (অনুবাদক)

বাক্যে যতিচিহ্নের ভূমিকা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এফ.এফ. আর্বাটনট যতিচিহ্নের গুরুত্ব বোঝাতে এক ব্রিটিশ সংসদ সদস্যের মজার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এ সাংসদ অন্য আরেকজন সাংসদকে 'মিথ্যুক' বলার পর নিজের উক্তি ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রত্যাহার পত্রে লেখা ছিল – "I said the gentleman lied, it is true; and I am sorry for it". (অর্থ, "এটা সত্যি কথা যে, আমি ভদ্রলোককে 'মিথ্যুক' বলেছিলাম; এবং আমি এর জন্যে দুঃখিত")। যাহোক, পরদিন সকালে খবরের কাগজে সবাই পড়ল, "I said the gentleman lied. It is true; and I am sorry for it". (অর্থ, "আমি ভদ্রলোককে 'মিথ্যুক' বলেছিলাম। যেটা সত্যি কথা; এবং আমি এর জন্যে দুঃখিত")।[33] একটি মাত্র যতিচিহ্নের ভুলের জন্যে অর্থ কতখানি বদলে যায়।

এখন প্রশ্ন হল, সে সময় কে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে এরকম স্বরচিহ্ন ও যতিচিহ্নহীন, বড় হাতের অক্ষরহীন হিব্রুলিপির নির্ভরযোগ্য পঠন কোন্‌টি হবে? এ ধাঁধার নিষ্পত্তি কি অন্ধ বিশ্বাস, নাকি নিরপেক্ষ গবেষণার উপর ভিত্তি করে হয়েছিল? আর গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠিতে Masorete'দের স্বরচিহ্ন বসানোর প্রণালী কতখানি নির্ভুল যার উপর ভিত্তি করে গোটা একটি ধর্ম দাড়িয়েঁ আছে? কিছু কিছু জায়গায় সম্ভাব্য ও গ্রহণযোগ্য পাঠের জন্যে অর্থের পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়োজনই বা কী ছিল? এরকম পদ্ধতি কতটা নির্ভরযোগ্য যখন ইহুদী পন্ডিতদের ঐকমত্য সত্ত্বেও হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে সৃষ্টিকর্তার নামের সঠিক উচ্চারণ পর্যন্ত অমীমাংসিত রয়ে গেছে[34]। সবশেষে, এ ব্যাপারে পাঠকদের

---

[33] Arbuthnot, F. F, p. 10.

[34] বাইবেলের স্বরচিহ্নহীন মূল হিব্রু লিপিতে সৃষ্টিকর্তার নাম (Proper name) হিসেবে יהוה (YHWH বা JHVH) - এ চারটি ব্যঞ্জণবর্ণ পাওয়া যায়। ইহুদীরা মনে করে যে, জেরুযালেমের উপাসনালয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার সময় থেকে সৃষ্টিকর্তার নামের সঠিক উচ্চারণ হারিয়ে গেছে। Masorete'রা স্বরচিহ্ন বসাবার পর এ বর্ণগুলোর মৌখিক উচ্চারণ দাঁড়ায় Jehovah। অনেকের কাছে আবার এ উচ্চারণ সঠিক মনে হয়নি। তারা Jahveh, Jahweh, Yahve, Yahveh, Yahwe ইত্যাদি নানা রকম প্রস্তাবনা দিয়েছে। মোট কথা স্রষ্টার নাম কিভাবে উচ্চারিত হবে, ইহুদী-খ্রিষ্ট ধর্মে এখনও পর্যন্ত সেই ব্যাপারটি অমীমাংসিতই রয়ে গেছে। - (অনুবাদক)

দৃষ্টিকে কেন শুধুমাত্র "ভূমিকা" বা "মুখবন্ধের" কয়েকটি লাইনে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে? যে সব বিষয় অমীমাংসিত রয়ে গেছে সেসব নিয়ে মূল আলোচনায় কেন নির্দিষ্ট করে কিছু উল্লেখ করা হয়নি?

The Revised Standard Version এর ভূমিকায় বলা হয়েছে,

> "মূল লিপিগুলো যুগে যুগে হস্তান্তরের ফলে যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, মাঝে মাঝেই সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনূদিত কোন সংস্করণই অর্থের সন্তোষজনক পুনরুদ্ধার দেখাতে পারেনি। এক্ষেত্রে মূললিপির সবচেয়ে সঠিক ও সম্ভাব্য অর্থ হিসেবে বিশেষজ্ঞদের দেয়া শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাগুলোই শুধু অনুসরণ করা যেতে পারে"।[35]

পৃথিবী জুড়ে যাকে বাইবেলের সবচেয়ে স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য অনুবাদ বলে মনে করা হয়, সেই (The Revised Standard Version) গ্রন্থে স্বীকার করা হয়েছে, "মূল লিপিগুলো যুগে যুগে হস্তান্তরের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে"। এ তথ্য আধুনিক বিশেষজ্ঞদের গবেষণার ত্রুটির দিকে আঙ্গুল তোলে না, বরং এ ধর্মের ভিত্তি যে কত অনিশ্চিত ও দুর্বল তা-ই স্পষ্ট করে তোলে।

বাইবেল ও কুরআন - দু'টি গ্রন্থই প্রাথমিকভাবে স্বরচিহ্নহীন লিপিতে লিপিবদ্ধ হলেও, নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে এদের মধ্যে রয়েছে বিরাট ব্যবধান। প্রথমদিন থেকে আজ পর্যন্ত কুরআন সংরক্ষিত হয়েছে মূলতঃ মৌখিক রীতিতে; তাই এর সঠিক উচ্চারণ ও অর্থ নিয়ে কেউ কখনও প্রশ্ন তোলেনি। তাছাড়া, কুরআন পাঠের যে একাধিক রীতি চালু আছে এগুলোর প্রত্যেকটি অর্থবহতার দিক দিয়ে একে অপরের পরিপূরক। অথচ বাইবেলে কোন শব্দের সম্ভাব্য একাধিক উচ্চারণ অর্থের ক্ষেত্রে বিরাট বৈষম্য তৈরী করে। ফলে এদের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভাব্য ও নির্ভরযোগ্য পঠনটি নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে ওঠে। সময়ের প্রবাহে কুরআন অবিকৃত ও অপরিবর্তিত আছে। অন্যদিকে "নতুন বাইবেলের বিপুল সংখ্যক গ্রীক পান্ডুলিপি আমরা পেয়েছি, যাতে দেখা যায় ভিন্নমুখী অর্থের সমাবেশ।"[36] বিভিন্ন রকম অর্থ সম্বলিত এ পান্ডুলিপিগুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট

---

[35] *The Bible, Revised Standard Version*. 1977. Preface, pp. iv-v.

[36] *The Bible, Revised Standard Version*. 1977. Preface, pp. iv.

কোনটিই আজ পর্যন্ত সর্বসম্মতভাবে প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য দলিল হিসেবে অনুমোদন পায়নি।

কুরআনের ভাষাগত অলৌকিকতা যে পটভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছিল, এ প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করা দরকার। অতীতে প্রত্যেক নবী তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে এমন কিছু অলৌকিক নিদর্শন[37] নিয়ে এসেছিলেন যার অভিনবত্ব লোকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল[38]। প্রাচীন মিশরীয়দের কাছে সবচেয়ে সমাদৃত ছিল যাদুবিদ্যা, তেমনি ছিল তা ইহুদীদের কাছেও। সুতরাং অস্বাভাবিক নয় যে, মুসা (ﷺ) আল্লাহর (ﷻ) ক্ষমতার এমন অলৌকিক নিদর্শন দেখিয়েছিলেন যার সামনে ফেরাউনের রাজসভার যাদুকররা হতবুদ্ধি হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল। তেমনিভাবে ঈসা (ﷺ)'কে যে রোগ নিরাময়ের অলৌকিক নিদর্শন সহ পাঠানো হয়েছিল তাতেও অবাক হবার কিছু নেই। আল্লাহ (ﷻ) তাঁর অসীম করুণায় নবীদের চরিত্রকে উৎকৃষ্ট গুণাবলী ও পুণ্য দিয়ে আচ্ছাদিত করেছিলেন, সেই সাথে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জনের জন্যে মনোযোগ আকর্ষণকারী নিদর্শনসহ পাঠিয়েছিলেন। যারা এসমস্ত অলৌকিক ঘটনা নবীদের মু'জিযা বলে স্বীকার করেছিল তারা সাফল্য লাভ করেছিল। কিন্তু যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল তারা রুদ্ধ বোধশক্তি নিয়ে একগুঁয়ে প্রত্যাখ্যানের মাঝে পড়ে থাকবার মর্মান্তিক পরিণাম ভোগ করেছিল।

এখন প্রশ্ন ওঠে, সে যুগে আরবদের কাছে কোন্ বিষয়টির দক্ষতাকে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন মনে করা হত? এর উত্তর হল, কাব্য রচনা এবং বাকপটুতা। আরবী ভাষার জটিলতার প্রধান কারণ বিভিন্ন রকম আঞ্চলিক উচ্চারণের বৈচিত্র্য,

---

37 নবী-রসূলরা তাদের নবুয়তের দাবী প্রমাণ করতে সৃষ্টিকর্তার অনুমতিতে যে সমস্ত অলৌকিক নিদর্শন দেখাতেন সেগুলোকে 'মু'জিযা' বলা হয়। (অনুবাদক)

38 আল্লাহর রসুল মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন: "প্রত্যেক নবীকেই তাঁর (যুগ)উপযোগী মু'জিযা (বিশেষ অলৌকিক নিদর্শন) প্রদান করা হয়েছে। সে অনুসারে ঈমান আনা হয়েছে। অথবা বলেছেন, তার উপরই লোকেরা ঈমান এনেছে। আর নিশ্চয়ই আমাকে ওহী দেয়া হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা আমার উপর অবতীর্ণ করেছেন। অতএব, আমি আশা করছি যে, কিয়ামতের দিন আমার অনুগামী তাদের থেকে অধিক সংখ্যায় হবে। (বুখারী)- (অনুবাদক)

আজকের যুগে অনেকের পক্ষেই এ বিষয়টা উপলব্ধি করা কঠিন। যেমন, "আরবী ভাষায় 'মধু' বোঝানোর জন্য প্রচলিত আছে আশিটি শব্দ, 'সাপ' বোঝানোর জন্য দুই'শ শব্দ, 'সিংহ'র জন্য আছে পাঁচ'শ, 'তরবারি' বোঝাতে আছে সহস্র শব্দ। এটা এমন এক যুগের কথা যখন শব্দভাণ্ডারে সমৃদ্ধ আরবী বিশ্বকোষের পুরোটাই ছিল এক নিরক্ষর জাতির স্মৃতির উপর নির্ভরশীল"[39]।

সে যুগে আরবদের কাব্য-প্রীতি সর্বজনবিদিত ছিল। প্রতি বছর কবিতা উৎসব পালিত হত ভীষণ জাঁকজমকসহ যার কিছু বর্ণনা নীচে দেয়া হল,

> "ত্রিশ দিন ধরে উৎসবে শুধু শস্য আর মদ নয়, কাব্য রসেরও আদান-প্রদান হত। বিজয়ী ব্যক্তির পুরস্কার কী হবে তা নিয়ে একে অন্যেকে ছাড়িয়ে যাবার প্রতিযোগিতায় দানশীল ব্যক্তিদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা চলত। বিজয়ী কবিতাটি জমা থাকত রাজপুত্র আর আমীরদের সংগ্রহে। আমরা এরকম সাতটি কবিতার অনুবাদ পড়বার সুযোগ পেয়েছি, যেগুলোর মূললিপি সে সময় মক্কার উপাসনালয়ে (কা'বায়) স্বর্ণাক্ষরে লিখে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল"।[40]

আর, বস্ওয়ার্থ স্মিথ এর মন্তব্য,

> "জাতীয়তা বোধকে উজ্জীবিত রাখতে গ্রীসের অলিম্পিক প্রতিযোগিতার যে ভূমিকা ছিল; গোত্রীয় স্বকীয়তার উর্দ্ধে উঠে, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ থেকে কিছুদিনের অব্যাহতি পেয়ে, আরবের সাহিত্য-চর্চার কেন্দ্র ওকায ও মুজান্নায় অনুষ্ঠিত এ কবিতা উৎসব সেই একই ভূমিকা পালন করত। এখানে এসে বিভিন্ন গোত্র নিজেদের মধ্যে বিরোধগুলোর নিষ্পত্তি করে নিত, যুদ্ধবন্দী বিনিময় করত, আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল – একে অপরের সাথে মুখে-মুখে কাব্য রচনার প্রতিযোগিতা করত। সেই 'অজ্ঞতার যুগেও' প্রতিটি গোত্র থেকে একজন করে প্রতিভাবান কবি অংশগ্রহণ করত এবং এদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত হত তার কবিতা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা হত। অথবা কা'বার প্রবেশদ্বারে প্রদর্শনীর জন্য

---

[39] Gibbon, Edward, Esq. Vol. 5, Chapter L, p. 452.
[40] Gibbon, Edward, Esq. Vol. 5, Chapter L, p.453.

ঝুলিয়ে রাখা হত যেন পবিত্র-ভূমিতে আগত তীর্থযাত্রীরা সবাই সেই কবিতা পড়ার সুযোগ পায়"।[41]

মোটকথা আরবরা ছিল ভীষণ কাব্য-অনুরাগী। এ রকম প্রেক্ষাপটে মুহাম্মদ (ﷺ) অশ্রুতপূর্ব এমন এক অমিয় বাণী প্রচার করতে লাগলেন যা আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিতে রচিত, কোন মানুষ আগে তা শোনেনি। ঠিক যেভাবে অতীতে মূসা (عليه السلام) ফেরাউনের রাজসভার যাদুকরদের হারিয়ে দিয়ে, উদ্ধত সভাসদদের কাছে অলৌকিক নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। যেভাবে ঈসা (عليه السلام) রোগ নিরাময়ের অলৌকিক নিদর্শন দেখিয়ে তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের পরাস্ত করেছিলেন। কুরআনের মাত্র কয়েকটি আয়াত কঠিন হৃদয় মরুবাসীদের চোখকে অশ্রুসজল করে দিতে পারে, পারে বিশ্বাসীদের প্রত্যয়কে দৃঢ়তা দান করে পরম ভাবাবেগে আচ্ছন্ন করতে। মিশেনার লিখেছেন,

"সম্ভবতঃ পৃথিবীতে কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা সবচেয়ে বেশী পাঠ করা হয় এবং নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোক তা মুখস্থ রেখেছে। এ গ্রন্থ বিশ্বাসীদের দৈনন্দিন জীবনে সবচেয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। আকারে নতুন বাইবেলের মত তত দীর্ঘ নয়, অপূর্ব ভাষায় রচিত এ গ্রন্থ কবিতা নয়, নয় কোন সাধারণ গদ্য, অথচ শ্রোতাদের হৃদয়কে বিশ্বাসের ভাবাবেগে উদ্বেলিত করার অসাধারণ ক্ষমতা এর রয়েছে"।[42]

কুরআনের অলৌকিক সৌন্দর্য অনুভূতির উপর যে গভীর প্রভাব ফেলে তার সাক্ষ্য হিসেবে অগণিত উদাহরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, মুহাম্মদ (ﷺ) এর প্রতিপক্ষ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো। শত্রুপক্ষের অনেকে কুরআনের মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে মরুভূমির ঘন-দুর্ভেদ্য আঁধার অগ্রাহ্য করে চুপিসারে হাজির হত কুরআনের আবৃত্তি শুনতে। এরকম এক রাতে কুরআন শুনে ঘরে ফেরার পথে তিনজনের মধ্যে অপ্রত্যাশিত ঠোকাঠুকি লেগে গেল। পরস্পরকে চিনতে পেরে (তিনজনের মধ্যে দু'জন ছিল আবু সুফিয়ান ও আবু

---

[41] Smith, R. Bosworth, M.A.1986. *Mohammad and Mohammadanism.* London: Darf Publishers Ltd. Pp. 64-65.

[42] Michener, James A. p. 70.

জেহেল) তারা শপথ করে বলল যে, আর কখনও কুরআন শুনার জন্য ফিরে আসবে না। পরের রাতে আবারও একই ঘটনা। এবার তারা নিজেদের প্রতিমার নামে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল যে, ভবিষ্যতে এমনটা আর হবে না। তৃতীয় রাতে ঘন আঁধারের পর্দা চিরে আবারও একে অপরের সামনে পড়ে গেল।[43] মুসলিমরা মনে করে এ ঘটনাটি কুরআনের অনবদ্য, দুর্নিবার মাধুর্যের প্রমাণ। এ মাধুর্য এমন শক্তিশালী যে পাষাণ-হৃদয় শত্রু ইসলামের ঘোরবিরোধী নিন্দুকের কর্ণ ও কল্পনাকেও তা চুম্বকের মত টেনে এনেছিল।

উমর (ﷺ) এর ধর্মান্তরের কাহিনী তো লোকের মুখে মুখে। সে সময়ের দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, ইসলাম গ্রহণের আগের দিন পর্যন্ত যিনি ছিলেন ইসলামের চরম বিদ্বেষী শত্রু সবাই যাকে ভয় করে চলত – সেই উমর মুহাম্মদ (ﷺ)'কে হত্যার উদ্দেশ্যে পথে বের হয়ে ঘটনাচক্রে নিজের বোনের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে কুরআনের একটি সুরাহ্‌র আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হয়ে তিনি ঐ মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণ করেন।

এরকম আরো দৃষ্টান্ত দেখা যায় সে সময়ের দুই প্রখ্যাত মুসলিম কবি উনায়েস আল-গিফারী ও আল-কিন্দীর ঘটনায়। মুহাম্মদ (ﷺ) এর সাথে প্রথম সাক্ষাতের দিনটি সম্পর্কে উনায়েস আল-গিফারীর নিজের বর্ণনা, "আমি মক্কায় তোমাদের গোত্রের এমন এক লোককে দেখেছি যিনি নিজেকে আল্লাহ (ﷻ)র প্রেরিত রসূল বলে দাবী করেছেন। লোকেরা বলে তিনি একজন কবি, অথবা ওঝা, আর নয়ত যাদুকর। কিন্তু আমি বহু ওঝার কথা শুনেছি, তাঁর কথা কোন দিক দিয়েই ওঝার মত নয়। আমি তাঁর বাণী কবির চরণের সাথে তুলনা করে দেখেছি, কিন্তু এ বাণী কোন কবির রচনা হতে পারে না। আল্লাহর (ﷻ) শপথ! তিনি সত্যবাদী, আর লোকেরা (যারা এসব বলে তারা) সব মিথ্যুক!"[44]

কুরআনের মত কিছু রচনা করে আনার প্রস্তাব পেয়ে আল-কিন্দী সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়েছিল। সে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে, এ

---

[43] Muhammad Ibn Ishaq Ibn Yasar. 1963. Seerat An-Nabi. Maydan Al Azhar (Cairo); Muhammad Ali Sabi'eh & Children. Vol. 1. P. 207.

[44] মুসলিমের বর্ণনা।

কাজ কোনভাবেই সম্ভব না। আল-কিন্দী ইঙ্গিত দিয়েছিল যে,কুরআনের মাত্র কয়েক লাইনের অর্থবহতা তুলে ধরতে হলেও একাধিক বই রচনার প্রয়োজন। কুরআনের সৌন্দর্য ও সুগভীর বিষয়বস্তুর সমকক্ষ রচনায় এ অপারগতাকে মুসলিমরা মনে করে মানবজাতির প্রতি আল্লাহ (সুবহানাহূ ওয়া তাআলা)র ঐশী চ্যালেঞ্জের জাজ্বল্য প্রমাণ –

"এবং আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, তাতে তোমরা যদি সন্দিহান হও তবে তৎ সদৃশ একটি 'সুরাহ্' তৈরী করে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সাহায্যকারীদেরকেও ডেকে নাও; যদি তোমরা সত্যবাদী হও"। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, বাকারা:২৩)

এ আয়াতটি সূক্ষভাবে পরীক্ষা করলে এর গভীরতা আরো ভালভাবে বোঝা যায়। কুরআনে আল্লাহ (ﷻ) মানবজাতিকে কমপক্ষে পাঁচবার চ্যালেঞ্জ করেছেন কুরআনের সমকক্ষ কিছু রচনা করে আনবার। প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল (ওহী অবতরণের ধারা অনুযায়ী, কুরআনের অধ্যায় বিন্যাসের ধারা অনুযায়ী নয়)কুরআনের মত একটি পুরো গ্রন্থ রচনা করার (সুরাহ বনি ইসরাঈল:৮৮ ও সুরাহ তুর:৩৩-৩৪)। যখন আরবের শ্রেষ্ঠ কবিরাও এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে অপারগতা দেখালো, তখন আল্লাহ (ﷻ) দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন কুরআনের মত অন্ততঃ দশ'টি অধ্যায় রচনা করার (সুরাহ হুদ:১৩)। আরবজাতি ব্যর্থতার অপমানে যখন মাথা হেঁট করে ফেল্ল, তখন আল্লাহ (ﷻ) এ চ্যালেঞ্জকে মাত্র একটি সুরাহ'য় নামিয়ে দিলেন (সুরাহ ইউনুস:৩৮ ও বাকারা:২৩)। চৌদ্দ'শ বছর ধরে আরবীভাষী স্থানীয় ইহুদী, খ্রিষ্টান, পৌত্তলিক ও নাস্তিকরা নানারকম ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে কুরআনের এ চ্যালেঞ্জকে নিস্ফল প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা চালিয়েছে। ইসলাম বিদ্বেষী এদের সবারই মাতৃভাষা ছিল আরবী। এ প্রসঙ্গে একটি জিনিস উল্লেখ্য যে, কুরআনের সবচেয়ে ছোট সুরাহটি হল তিন লাইন বিশিষ্ট অর্থ সমৃদ্ধ সুরাহ্ আল-কাওসার (১০৮ নং সুরাহ্)। এ তিন লাইনে শব্দের মোট সংখ্যা দশ। মাত্র দশ'টি শব্দের সমকক্ষ রচনা করতে চৌদ্দ'শ বছর ধরে মানুষ কেন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে? মানবজাতি কেন সফল হয়নি "*তৎ সদৃশ একটি 'সুরাহ্' তৈরী করে নিয়ে*" আসতে – এটা ভেবে দেখবার মত ব্যাপার বৈ কি!

মুসলিমরা এ প্রশ্নের উত্তরে ইঙ্গিত দেয় যে, মানবীয় সাধ্য ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে মানুষ একে অন্যকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। ফলে অসম্ভবের সীমা অতিক্রম করা হয়, অপরাজেয়র রেকর্ড চূর্ণ করা হয়, অতীতে যা ছিল দুঃসাধ্য তাতে সাফল্য অর্জন করা হয়। এভাবে আজ দূরত্বের বাধা আয়ত্তে আনা হয়েছে, শব্দের বেগ লঙ্ঘিত হয়েছে, চাঁদের বুকে মানুষের পদচিহ্ন পড়েছে, অণু বিশ্লেষিত হয়েছে, ইলেক্ট্রনকে হিমায়িত করা হয়েছে। অথচ সেই কাজটি কেউ এখন পর্যন্ত করে দেখাতে পারেনি যে ব্যাপারে স্রষ্টা কোন অনুমতি দেননি। গোটা মানবজাতি দীর্ঘ চৌদ্দ'শ বছর পরেও কেন কুরআনের সমগুণসম্পন্ন রচনা তৈরী করে আনতে পারেনি? এ কাজে চিন্তাভাবনার জন্যে যথেষ্ট সময়ের যে কোন অভাব ছিল না – তা তো সুনিশ্চিত।

সে সময়ের ইসলাম বিদ্বেষী, প্রতিভাবান আরব কবি আল-ওয়ালিদ আল-মুগীরা স্বীকার করেছিল, "আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদের মুখে এমন এক বাণী (কুরআন) আমি শুনেছি যা মানুষ কিংবা জ্বীনের রচনা হতে পারে না – এ যে ভীষণ মিষ্টিমধুর। এ বাণী যেন উর্বর জমির বুকে জন্মানো বৃক্ষের শীর্ষের ফলটি, কোনকিছুই একে অতিক্রম করতে পারে না"।[45] কুরআনের অনুশাসন মেনে নিতে অস্বীকার করলেও সুদক্ষ কবি এবং ইসলামের ঘোর শত্রুরা যখন এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছিল, তখন তাদের মতামত নিঃসন্দেহে গুরুত্বসহ বিবেচনা করার মত।

কেউ কেউ বলে থাকে, মুহাম্মদ (ﷺ) নিছক একজন দক্ষ কবি ছিলেন। অন্যদিকে এর উত্তরে মুসলিমরা বলে যে, দক্ষ শিল্পীর একটি বৈশিষ্ট্য হল – তারা নিজ শিল্পকর্মটি সমাপ্ত করার পরও তাতে অসংখ্য অপূর্ণতা ও ভুল-ভ্রান্তি খুঁজে পান অন্য আর সবার চেয়ে বেশী। কেউ কি কল্পনা করতে পারে যে, বিটোভেন সমস্ত বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করবে তার চেয়ে উত্তম সঙ্গীত রচনা করতে, অথবা মাইকেল এঞ্জেলো তার চেয়ে নিপুণ ভাস্কর্য তৈরী করতে? বিটোভেন

---

[45] *Manaahil Al-Irfaan fi Uluum* Al-Qur'an (Wells of Knowledge of the Sciences of the Qur'an). 1988. Muhammad Abdul At-Theem Az-Zarqaani. Dat Al-Kutub Al-Ilmee'a. Vol. 1. P. 216.

নিজেই তার বেশ কিছু জনপ্রিয় রচনা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, তার মৃত্যুর পর আবার এগুলো দিনের আলো দেখার সুযোগ পেয়েছে। আর মাইকেল এঞ্জেলো তো ছিল নিজেই নিজের সবচেয়ে বড় সমালোচক। মনমত হয়নি বলে কত ভাস্কর্য যে নিজের হাতে হাতুড়ির আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে! ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, দক্ষ শিল্পীদের সবাই নিজেদের কীর্তির শ্রেষ্ঠ সমালোচক ছিল – আশানুরূপ হয়নি বলে তারা ছুঁড়ে ফেলেছে কোটি টাকা মূল্যের রচনা, চিত্রকর্ম, ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে খোদাইকৃত ভাস্কর্য। সারকথা হল, কোন নারী-পুরুষই নিজ কৃতিত্ব নিয়ে এতটা আত্মবিশ্বাসের সাথে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তে পারে না। এরকম দৃপ্ত চ্যালেঞ্জ শুধুমাত্র তাঁর পক্ষেই করা সম্ভব যিনি সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখেন। তিনি জানেন যে, কখনই তাঁর এ চ্যালেঞ্জের মুখে তিনি কাউকে সাফল্য দান করবেন না। তাই চৌদ্দ'শ বছর পরও, এ চ্যালেঞ্জ অব্যর্থ রয়ে গেছে। অধ্যাপক আর. জে. আরবেরি বলেছেন,

> "এ কথা অনস্বীকার্য যে, কুরআন লেখনীর দিক দিয়ে অনতিক্রম্য। স্বতন্ত্র গুণে গুণান্বিত এ গ্রন্থ। এতে ভাষার প্রকাশভঙ্গী বৈশিষ্ট্যমূলক, অথচ বিস্ময়করভাবে সহজ-সরল। ছন্দ ও লয়ের উপস্থিতি এর বর্ণনারীতির অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য। এরকম লেখনী সত্যি অনুকরণের অতীত"।[46]

ড: লরা ভ্যাগলিয়েরির মন্তব্য,

> "কুরআন ইসলামের মূল বিস্ময়। এক ধারাবাহিক ও অব্যাহত বর্ণনা রীতিতে এ গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌছেছে নিশ্চিত সত্যের সংবাদ। এ এমন এক গ্রন্থ যা অনুকরণ করা যায় না। এর প্রতিটি অভিব্যক্তি (আয়াত) ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ অথচ আকারে যথার্থ – খুব দীর্ঘ নয়, আবার খুব সংক্ষেপও নয়। এর ভাষাশৈলী মৌলিক। অতীতের আরবী সাহিত্যাঙ্গনে এর সমকক্ষ কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না। কোন বাড়তি সাহায্য ছাড়াই শুধুমাত্র সহজাত মাধুর্যের কারণে মানবাত্মায় তা গভীর প্রভাব ফেলে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এর সমস্ত আয়াত অলংকারপূর্ণ। এমনকি (আসমানী) আদেশ-নিষেধের মত গুরুগম্ভীর

---

[46] Arberry, A.J. 1953. The Holy Koran – *An Introduction with Selections*. London: George Allen & Unwin Ltd. P. 28.

বিষয় আলোচিত হয়েছে এমন সব আয়াতেও এ ভাবালংকারের ঘাটতি ঘটেনি। নবীদের কাহিনী, পৃথিবী সৃষ্টি ও ধ্বংসের বর্ণনা, স্রষ্টার আসমানী সত্তার গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে বার বার এমন এক মনোমুগ্ধকর ভঙ্গীমায় যে, এ পুনরাবৃত্তি গ্রন্থের মাধূর্য এতটুকু খর্ব করেনি। গ্রন্থের বর্ণনা এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে পরিবর্তিত হয়েছে অথচ এর আকর্ষণী ক্ষমতার এতটুকু কমতি হয়নি। গভীরতা ও মিষ্টতা – এমন দু'টি বৈশিষ্ট্য যা সাধারণত এক সঙ্গে মেলে না। অথচ এ গ্রন্থে দু'টি বৈশিষ্ট্যই পাওয়া যায়। প্রতিটি উপমা ও রূপকের ব্যবহার বিষয়োপযোগী। ....এ গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই বিপুল জ্ঞান ভান্ডার যা সবচেয়ে চৌকষ ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং সুচতুর রাজনীতিবিদের পক্ষেও বর্ণনা করা সাধ্যের বাইরে"।[47]

এ. গাইলাম এভাবে বিষয়ের জের টেনেছেন,

"কুরআন বিশ্বসাহিত্যে এমন একটি রচনা যার মূল আবেদনকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে অনুবাদ করা সম্ভব না। এতে আছে এমন সৌন্দর্যময় ছন্দ এবং সুরের মূর্ছনা যা কর্ণকুহরকে মোহিত করে। বহু আরব খ্রিষ্টান কুরআনের রচনাশৈলীকে সমীহের চোখে দেখে আর অধিকাংশ আরবই এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে। ....এ কথা অনস্বীকার্য যে, উঁচুমানের পদ্য ও গদ্যের সংমিশ্রণে রচিত এ গ্রন্থ আরব সাহিত্যাঙ্গনে অতুলনীয়"।[48]

মুহাম্মদ (ﷺ) প্রথম ওহী পেতে শুরু করেন চল্লিশ বছর বয়সে। এ ঘটনার আগে যাদের মাঝে তিনি জীবন কাটিয়েছেন তারা তাঁর স্বভাব-চরিত্র, কথাবার্তা, রীতি-নীতি সম্পর্কে পরিচিত ছিল। তারা ভালভাবে জানত তাঁর কথা বলার ভঙ্গী। সাধারণত দেখা যায় যে, ত্রিশ বছর পার হয়ে যাবার পর ব্যক্তির অভ্যাস ও ব্যক্তিত্বের খুব একটা পরিবর্তন হয় না। প্রাচীন চৈনিক প্রবাদ বলে, "মানুষের স্বভাব হল রেশমের মত, রঙ একবার বসে গেলে একে বদলানো ভীষণ কঠিন"[49]। আর চল্লিশ বছর বয়সে তো বেশীর ভাগ মানুষ ব্যক্তিত্বের নির্দিষ্ট

---

[47] Vaglieri, Dr. Veccia. Pp. 40-41.

[48] Guillaume, Alfred. Pp. 73-74.

[49] Clements, Jonathan. 1999. *The Little Book of Chinese Proverbs*. Siena publishers. p. 24.

কাঠামোয় বাঁধা পড়ে যায়। মুহাম্মদ (ﷺ) যে কোন লেখক বা কবি ছিলেন না তা তিনি শুধু বাস্তব জীবনে প্রমাণ করেননি (সুরাহ আনকাবুত:৪৮ এ যেমন বলা হয়েছে, -*"তুমি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করনি এবং স্বহস্তে কোন দিন কিতাব লিখনি যে, মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ পোষণ করবে"।*) সেই সাথে তাঁর মুখের ভাষা ছিল কুরআনের ভাষার চেয়ে অনেক বেশী সাধারণ ও মানবীয়। এছাড়া ওহী হিসেবে কোন্ কোন্ জিনিস লিপিবদ্ধ করা হবে সে বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সাবধানী ছিলেন। প্রথম দিকে তিনি সাহাবাদেরকে তাঁর নিজের কথা লিখে রাখতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন এই বলে – "আমার কাছ থেকে কুরআন ছাড়া আর কোন কিছু লিপিবদ্ধ করবে না। যে কুরআন ছাড়া অন্য কিছু লিখে রেখেছে সে যেন তা পুড়িয়ে ফেলে"।[50] পরবর্তীতে তিনি যখন তাঁর কথা (হাদীস) লিখে রাখবার অনুমতি দিলেন, তখনো তাঁর মুখের কথা ও কুরআনের বাণী কখনও মিশে যায়নি। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, মুহাম্মদ (ﷺ) এর মৌখিক ভাষা কুরআনের আসমানী ভাষাশৈলীর কাছাকাছিও নয়। কেউ হাদীসের একটি বই নিয়ে কুরআনের ভাষার সাথে তুলনা করলেই সেটা বুঝতে পারবে। মুহাম্মদ (ﷺ) এর হাদীস অসংখ্য খণ্ড খণ্ড গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এ হাদীসগুলোয় মুহাম্মদ (ﷺ) এর কথাবার্তা সংরক্ষিত আছে। যা থেকে পাঠকের জন্যে খুব সহজে এ মহান ব্যক্তিত্বের ভাষাগত ভঙ্গীমা ও চরিত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব। কুরআনের সুর ও ছন্দ, আবেগ সমৃদ্ধ বাণী এবং অতুলনীয় সৌন্দর্যের কোনটাই মুহাম্মদ (ﷺ) এর হাদীসে দেখা যায় না। ড: লরা ভ্যাগলিয়েরি প্রশ্ন তুলেছেন,

> "এ অসাধারণ গ্রন্থটি (কুরআন) কী করে মুহাম্মদের রচনা হতে পারে, যেই নিরক্ষর আরব সারাজীবনে দু'টি বা তিনটির বেশী চরণ রচনা করেননি, তা আবার কাব্যিক প্রতিভার স্তরে উত্তীর্ণ হবার মত নয়, উদাহরণস্বরূপ - "আমি একজন নবী এবং আমি তোমাদের মিথ্যা বলি না। আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র"?[51]

---

[50] সহীহ মুসলিমের বর্ণনা

[51] Vaglieri, Dr. Laura Veccia. Pp. 40-41.

অধ্যাপক এ. জে.আরবেরি বলেছেন,

> "মুহাম্মদ দৈনন্দিন জীবনে কী ভঙ্গীতে কথাবার্তা বলতেন সেটা জানা কঠিন কিছু নয়, যেহেতু তাঁর জীবনালেখ্য সংরক্ষিত আছে বিপুল সংখ্যক দলিলে। সুতরাং এরকম ধারণা (যে কুরআন তাঁর নিজস্ব রচনা) ঠিক নয়। মারগোলিয়াথ যেমন বলেছেন যে, এরকম দ্বিতীয় আরেকটি দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া কষ্টকর যেখানে কোন ব্যক্তির রচিত সাহিত্য কর্ম এবং ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনার মধ্যে এতটা তফাৎ'। আমরা যদি মেনে নেই যে, হাদীস গ্রন্থগুলোতে মুহাম্মদের বাণী হিসেবে যা পাওয়া যায় সেগুলো বিশুদ্ধ, আর তা মেনে নেবার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। আরো মেনে নেই যে মারগলিয়াথের এ অনুমান সত্যি যে, কুরআন মুহাম্মদের নিজ হাতের সচেতন রচনা – তাহলে এটাও বলা যায় যে, এরকম আর একটি দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন যেখানে কোন রচয়িতার সাহিত্যিক অভিব্যক্তি তার দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তা থেকেও সম্পূর্ণ আলাদা"।[52]

মোট কথা, প্রাত্যহিক জীবনে মুহাম্মদ (ﷺ) এর কথা বলার ভঙ্গী এবং কুরআনের বর্ণনা ভঙ্গীর মধ্যে এত বিশাল পার্থক্য যে, ইসলামের নিন্দুকরা কুরআনকে মুহাম্মদ (ﷺ) এর হাতের রচনা বলে যে অভিযোগ তোলেন তা তাদের লাগামহীন কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। মারগোলিয়াথের মত অনেক অমুসলিম এতটা এগিয়েছে যে, ধর্মান্ধতার ধোঁয়ায় তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাভাবিক চিন্তাভাবনা লোপ পেয়েছে। ফলে আরবী ভাষাবিশারদরা পর্যন্ত যে বিষয়টি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, তারা সে ব্যাপারে গোঁয়ারের মত তাদের অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছে। এ সমস্ত অমুসলিমরা তাদের চেয়েও বিজ্ঞ, অসংখ্য আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ অমুসলিম বিশারদদের (অধ্যাপক এ. জে. আরবেরি যাদের মধ্যে উজ্জ্বল

---

[52] Arberry A.J. The Holy Koran – An Introduction with Selections. pp. 31-32.

৩১ নং পৃষ্ঠায় তিনি আরো লিখেছেন -

"As for the faithful. I will not conceal from them, what they will not in any case imagine, that I am no Muslim, nor could ever be."

অর্থ: "(মুসলিম) বিশ্বাসীদের কাছে আমি একটি বিষয় লুকাবো না, যেটা তারা কোনভাবেই কল্পনা করতে পারবে না। সেটা হল, আমি মুসলিম নই কিংবা কখনও ছিলামও না।"

দৃষ্টান্ত) সাথে অর্থহীন বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে। এ বিজ্ঞ ভাষা-বিশারদরা মুহাম্মদ (ﷺ) এর মুখের কথা এবং কুরআনের অলৌকিক বাণীর মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করে অকুণ্ঠচিত্তে তা স্বীকার করেছেন।

মুহাম্মদ (ﷺ) এর মুখের ভাষা এবং কুরআনের ভাষার এ পার্থক্যের পিছনে বিশ্বাসযোগ্য কী ব্যাখ্যা থাকতে পারে - কুরআন অস্বীকারকারীদের কাছে এর সদুত্তর জানতে চাওয়া অযৌক্তিক হবে না মোটেও। কারণ এ কুরআন যদি মুহাম্মদ (ﷺ) এর মস্তিষ্কের ফসল না হয়, এবং কোন আসমানী সূত্র থেকেও না হয়ে থাকে তাহলে আর কোন্ উৎস বাকি থাকে?

কেউ কেউ এমনও প্রস্তাব তুলেছে যে, মুহাম্মদ (ﷺ) এর হয়ত এমন কোন শিক্ষক থেকে থাকবেন যিনি তাঁকে কুরআন রচনায় সাহায্য করেছেন। তাদের কাছে মনে হয়েছে যে, এটাই প্রশ্নের উপযুক্ত সমাধান। যাহোক, 'মুহাম্মদ (ﷺ) দক্ষ কবি ছিলেন অথবা তাঁর কোন শিক্ষক তাঁকে কুরআন রচনায় সাহায্য করেছে' – ইসলাম বিরোধীদের তোলা এ দু'টো সম্ভাবনার যে কোনটার ক্ষেত্রে একটি বাধা কিন্তু অমীমাংসিত রয়েই যায়। সেটা হল, মুহাম্মদ (ﷺ) এর সমসাময়িক সবাই একথা স্বীকার করেছিল যে কুরআনের ভাষা ও বর্ণনাশৈলী আরবী সাহিত্যের এক অদৃষ্টপূর্ব দৃষ্টান্ত, এমনকি আজকের যুগেও এর কোন সমকক্ষ নেই।[53] আর যদি তাঁর এমন কোন শিক্ষক থেকেই থাকেন, তাহলে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, কে তিনি? তিনি কোথায় বাস করতেন? কুরআনের মত এ রকম অসাধারণ রচনা যিনি তৈরী করতে সক্ষম নিশ্চিতভাবে তিনি আরো কিছু রচনা তৈরী করেছিলেন, সেগুলোই বা কোথায় গেল?

যুক্তিতর্কের খাতিরে আরো বলা যায় যে, কুরআনের বর্ণনা শ্রেষ্ঠত্বে সব যুগের আরবী সাহিত্যের বাগ্বিধি ও ভাষাশৈলীর নিয়ম-কানুনকে ছাড়িয়ে গেছে। সাধারণত দেখা যায়, জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় বিষয়বস্তুগুলোকে কেন্দ্র করেই কবিরা কবিতা রচনা করে। পাশ্চাত্যের কাব্য-সাহিত্য যেমন মদ, নারী আর সঙ্গীতের একঘেঁয়ে গন্ডির মধ্যে ঘুরপাক খায়, কালেভদ্রে কোন ভাববাদী কবির রহস্যময় কলমের আঁচড় এতে স্থান পেতে দেখা যায়। পশ্চিমের মত,

---

[53] Said Qutub, Fi Thilal Al-Qur'an.

মুহাম্মদ (ﷺ) এর যুগের আরবী কাব্য-সাহিত্যও প্রধানত রোমান্টিক ও ভোগবাদী বিষয়বস্তুর মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল। এছাড়া কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে আরো স্থান পেত - গোত্রীয় উচ্চমর্যাদা, উচ্চ বংশমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব এবং বিভিন্ন পশুর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা, দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশলের প্রতিযোগিতা, স্থানীয় বীরপুরুষ ও গৌরবময় ইতিহাসের বর্ণনা ইত্যাদি। অর্থাৎ, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কবিতার বিষয় ছিল কোন ব্যক্তি, স্বজন কিংবা গোত্রের প্রশংসা ও গৌরব-গাঁথার বর্ণনা। বর্ণনায় অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির ফলে প্রকৃত বাস্তবতা অনেক সময় নিষ্প্রভ হয়ে যেত। কবির নিজস্ব কাল্পনিক বর্ণনা লোকের মধ্যে এতটা প্রভাব বিস্তার করত যে, মাঝে মাঝে যুদ্ধ পর্যন্ত বেধে যেত। অথচ কুরআন বর্ণনার ক্ষেত্রে এ সমস্ত অহেতুক বাড়াবাড়িকে এড়িয়ে গেছে। বাস্তব সত্যকে বিশ্বস্ততার সাথে তুলে ধরেছে। এছাড়া করআনে এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা, সে সময়ে লোকসমাজে জনপ্রিয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কুরআনে স্থান পেয়েছে - আইন-কানুন, নৈতিক আচার-আচরণ, সামাজিক ও নাগরিক দায়িত্ব, ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতি-নীতি ইত্যাদি। এছাড়া জনগণের কাছে দৃশ্যতঃ নিরস কিছু বিষয় যেমন, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে সম্পত্তি উত্তরাধিকারের নিয়ম-কানুনও এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বেশীর ভাগের কাছে এগুলো যে কোন জনপ্রিয় সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে তা অকল্পনীয়। বিশেষ করে সেই রচনাটি যদি এমন উচ্চমানের হয় যে সারা পৃথিবীতে তা অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

কুরআনে কিছু কিছু বর্ণনা অনেক সময় ঘুরে ফিরে এসেছে। কিন্তু বর্ণনার এ পুনরাবৃত্তিতে কুরআনের আবেদন এতটকু ম্লান হয়নি। দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে খণ্ড খণ্ড আকারে কুরআন অবতীর্ণ হলেও, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর বর্ণনাভঙ্গীর কোন পার্থক্য চোখে পড়েনা। মানবীয় ক্ষমতার পক্ষে অকল্পনীয় হলেও, কুরআন ঠিকই এক থেকে অন্য বিষয়ের পরিবর্তনে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এর অভিব্যক্তির ধারাবাহিকতা ও সামন্জস্যতা চমৎকারভাবে বজায় রেখেছে।

কুরআনের আরো একটি বিস্ময়কর দিক রয়েছে। তা হল, এ গ্রন্থের বর্ণনা কালপরম্পরায় (chronological order) অবতীর্ণ হয়নি। মুহাম্মদ (ﷺ)'কে আদেশ করা হয়েছিল, প্রত্যেকটা অবতীর্ণ নতুন আয়াত, ইতোমধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে এমন কোন নির্দিষ্ট আয়াতের পাশে বসাতে। ফলে নতুন যে আয়াতটি অবতীর্ণ হল, তা আসমানী নির্দেশ অনুসারে কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে

কোন স্থানে বসবার সম্ভাবনা ছিল। অধ্যাপক এ. জে. আরবেরি মহিমাময় কুরআনের অনুবাদের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন,

> ".....আমি ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে (কুরআনের) প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করেছি। এর সুরাহগুলো অনেক ক্ষেত্রে খণ্ড খণ্ড অংশের সমন্বয়ে গঠিত যৌগিক কাঠামো বিশিষ্ট্য – আর এ ব্যাপারটা প্রথম থেকে মুসলিম শিক্ষানবীশরাও স্বীকার করেছে। বিভিন্ন সময়ে মুহাম্মদ (ﷺ) সুরাহ'র যে ভগ্নাংশগুলো লাভ করেছিলেন, এ সুরাহগুলো তারই সমন্বিত সম্পূর্ণ রূপ"।[54]

মুসলিমরা বলে যে, কুরআন অবতরণের এ ধারা কোনমতেই মানুষের অনুসৃত পদ্ধতির মত নয়। মানুষ যখন কোন কাহিনী বা ইতিহাস বর্ণনা করে, তখন সে সাধ্যমত চেষ্টা করে ঘটনার বর্ণনায় ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে। যে কোন ইতিহাস গ্রন্থ অথবা বাইবেল আগাগোড়া পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বর্ণনার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য ঘটনার সূত্রগুলোকে পর পর সাজানো হয়েছে। অথচ আগে যেমন বলা হল যে, কুরআনের ক্ষেত্রে খণ্ড খণ্ডভাবে বিভিন্ন সময়ে এর আয়াতগুলো বিচ্ছিন্নভাবে অবতীর্ণ হয়েছে - এ পদ্ধতি মানবীয় ক্ষমতার বাইরে, আর মানুষ প্রচলিত যে পদ্ধতি অনুসরণ করে গ্রন্থ রচনা করে তার মত তো অবশ্যই নয়। কোন ব্যক্তি যদি ওহী নিয়ে ভণ্ডামি করতেই চায়, তবে এরকম পদ্ধতি অনুসরণ করা কি তার জন্য জরুরী! ইতিহাস বলে যে, লোকেদের বিভ্রান্ত করার জন্য ভণ্ড নবীদের জন্য এরকম সাহিত্যিক জটিলতার আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না।

এ আলোচনার সূত্র ধরে বলা যায়, যারা বিশ্বাস করে কুরআনের সমকক্ষ তিনটি চরণ রচনা করতে পেরেছে, তাদের এবার একটি কাজ করতে হবে। তাদের চরণগুলোকে বিপরীত ধারায় সাজাতে হবে। অর্থাৎ সর্বশেষ চরণটি সবার প্রথমে লিখতে হবে (এবং তা করতে হবে প্রথম দু'টি চরণ রচনা করার আগেই)। এবার মধ্যের চরণটি লিখতে হবে, তারপর প্রথম চরণটি। এবং এ কাজটি করতে হবে

---

[54] Arberry, A. J. 1996. *The Koran Interpreted.* A Touchstone book. Simon & Schuster. Preface. Pp. 25.

এমনভাবে যেন, প্রত্যেকটি চরণ অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে আলাদা আলাদাভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। সেই সাথে প্রত্যেকটি চরণ মানবজাতির জন্য জরুরী কোন বার্তা বহন করে এবং সাহিত্যিক মানের দিক থেকেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকে। এখানেই শেষ নয় - এ চরণ যেন অনাগত কোন ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী তুলে ধরে, বর্তমানের কোন বিষয়কে নির্দেশ করে, অথবা এমন কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য তুলে ধরে যা আগামী ১৪০০ বছরের আগে জানা সম্ভব নয়। চরণগুলো যেন দশটি ভিন্ন ভিন্ন পঠন পদ্ধতিতে সাতটি বিভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারণে পড়া যায়, সেটাও দেখতে হবে। প্রত্যেকটি চরণ হতে হবে অর্থের দিক দিয়ে পরিপূরক। উপরের এ শর্তগুলো পূরণ করে তিনটি চরণ রচনা করার প্রস্তাবনা সত্যিই অকল্পনীয়! মানুষের সীমাবদ্ধ মানবীয় ক্ষমতার পক্ষে তো বটেই!

অথচ মুহাম্মদ (ﷺ) নামের এক নিরক্ষর ব্যক্তির ঠোঁট থেকে উচ্চারিত হয়ে কুরআন ঠিক এ পদ্ধতিতেই দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে অবতরণ করেছে। এভাবে তিনটি মাত্র বাক্য যদি রচনা করে আনা অসম্ভব হয়, তাহলে চিন্তা করা উচিত কিভাবে একজন নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে গোটা একটা গ্রন্থ রচনা করে ফেলা সম্ভব সম্পূর্ণ নিজের স্মৃতির উপর নির্ভর করে, কোন রকম লিখিত ছক ছাড়া? যখন রচনার প্রত্যেকটি স্তর অত্যন্ত ব্যপক বার্তা বহনকারী এবং সেই সঙ্গে এমন মাধুর্যময় যে মানবজাতির মধ্যে কেউ নেই যে এর মত তিনটি বাক্য রচনা করে আনতে পারে! কোন রকম ভুল-ত্রুটি নেই, অসঙ্গতি নেই অথবা ধারাবাহিকতায় কোন ছেদ নেই। এটা কি কল্পনা করা যায় যে, শত-শত (যদি না হাজার-হাজার হয়) ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খণ্ড খণ্ডভাবে এ রকম একটি গ্রন্থ রচনা করা মানুষের কাজ?

সুতরাং এরকম জটিল পরিপ্রেক্ষিতে কোন মানুষের পক্ষে কি সম্ভব এমন একটি গ্রন্থ রচনা করা? মুসলিমরা বলে যে, কুরআনের আয়াত ও বিষয়বস্তু উভয়ই মানুষের সাধ্য ও নিয়মপদ্ধতির জন্যে চ্যালেঞ্জপূর্ণ। মাত্র কয়েক মাস কিংবা বছর পেরোতেই এখানে, ওখানে অমুক-অমুক আয়াত বসানোর পরিকল্পনা খুব সহজে ভুলে যাবার কথা। হয়তো বিশেষ কোন ঘটনা আগের পরিকল্পিত আয়াতকে বাতিল করে দিল, আর ফলে গোটা জিনিসটাই নিরস, অসঙ্গতিপূর্ণ, জন্জাল

সাহিত্যে পরিণত হল। এ ছাড়া, এমন একটা বিশাল কাজ শেষ করার মত দীর্ঘ দিন কেউ বেঁচে থাকবে, আগে থেকে কারো পক্ষে সেটা ধারণা করা সম্ভব না। সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারীর জন্যে সে একটি অসম্পূর্ণ কাজ রেখে যাবে, যার স্থানে স্থানে স্পষ্ট অসম্পূর্ণতার ফোঁকর। চৌদ্দশ বছর আগে প্রতিকূল মরুভূমির বুকে চল্লিশ বছর বয়স্ক কোন ব্যক্তির পক্ষে এটা ভাবা অস্বাভাবিক নয় যে,সে জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। নির্যাতন আর অসম প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে অতিরিক্ত তেইশ বছর বাঁচবার আশা করাটা তো আরো বেশী অবাস্তব।

কেউ দক্ষ মিথ্যুক হতে চাইলে তাকে খুব ভাল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হতে হবে। কিন্তু এমন একটি সুবিশাল কাজ শেষ করার মত প্রয়োজনীয় স্মৃতিশক্তির অধিকারী পৃথিবীর বুকে কেউ কখনো ছিল না। অথচ এভাবেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতের পর আয়াত, দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে কুরআন খণ্ড খণ্ড আকারে অবতীর্ণ হয়েছে এমনভাবে, যে কোন সময়ে ও অবতরণের যে কোন পর্যায়ে এর বাণী ছিল অতুলণীয়। শক্তিধর এবং অনন্য সুন্দর এমন এক অসাধারণ গ্রন্থ যা মানুষের অন্তর এবং মানবজাতির গতিপ্রবাহ ঘুরিয়ে দিয়েছিল। এমন একটি গ্রন্থের রচয়িতা কে হতে পারে এ প্রশ্নের উত্তরে মুসলিমদের মনে অন্ততঃ কোন 'মনুষ্যে'র নাম স্থান পায় না।

কিছু লোক আছে যারা স্বীকার করে বটে কুরআন কোন মানুষের রচনা নয়। কিন্তু এরকম স্বীকৃতির সাথে সাথে তারা আরো একটি কুৎসিৎ ইঙ্গিতও দেয় যে, এ গ্রন্থ শয়তানের রচনা। এরকম আভাস সত্যি দুঃখজনক। বাইবেলের বর্ণনায় পাওয়া যায়, অবিশ্বাসী ইহুদীরা ঈসা (ﷺ) এর বেলাতেও এ ধরণের দাবী তুলেছিল যে - তাঁর মু'জিযা সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে আসেনি বরং এগুলো ছিল শয়তানের কাজ (ম্যাথিউ ১২:২৪, মার্ক ৩:২২, ল্যুক ১১:১৫)। অন্যদিকে খ্রিষ্টানদের অন্তর বাইবেলে ঈসা (ﷺ) এর মু'জিযার বর্ণনাগুলো পড়ে বিগলিত হতে থাকে। তারা অবাক হয়ে ভাবে, কী করে ইহুদীদের পক্ষে সম্ভব এ রকম জলজ্যান্ত প্রমাণ অস্বীকার করা। ঈসা (ﷺ) এর অলৌকিক নিদর্শনের কাহিণীগুলো অশ্রু সজল চোখে পড়তে পড়তে তারা ভাবে, যদি ঐ সময়ে তাদের জন্ম হত তাহলে অবশ্যই ঈসা (ﷺ)'কে মেনে নিত, অন্ধের মত অস্বীকার করত না। অথচ সেই

একই খ্রিষ্টান ব্যক্তি আবার কুরআনের অলৌকিক নিদর্শনকে শয়তানের কাজ বলে অপবাদ দেয়। এরকম খ্রিষ্টানকে তখন দেখায় ঈসা (ﷺ) এর যুগের ঠিক সেই সমস্ত অবিশ্বাসী ইহুদীদের মত, যাদের ব্যাপারে সে নিজে সমালোচনা-মুখর। পুরাতন ও নতুন বাইবেলে শেষ নবী আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও এবং (অলৌকিক নিদর্শন সহ) অসংখ্য প্রমাণের অকাট্যতা সত্ত্বেও তারা মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থকে শুধু অগ্রাহ্য করেনি, কখনও কখনও আরো এক ধাপ এগিয়ে দাবী করে যে – এটা শয়তানের রচনা।

তাদের এ চ্যালেঞ্জের যথার্থ উত্তর আছে। মুসলিমদের জবাব হল, কুরআনের শিক্ষা এরকম একটি সম্ভাবনাকে আগেই রুদ্ধ করে দিয়েছে। ১৬ নং সুরাহ্‌র ৯৮ নং আয়াতে মুসলিমদের আদেশ করা হয়েছে যে, "*যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহ (ﷻ)র আশ্রয় প্রার্থণা করবে*"। সাধারণ জ্ঞান বলে যে, শয়তান এমন একটি বই কখনও লিখবে না যেখানে সে তার নিজের থেকে আশ্রয় প্রার্থণা করার জন্যে মানুষকে উপদেশ দেবে। কেউ উর্বর কল্পনাকে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে যে, শয়তান এখানে খুব চালাকীপূর্ণ একটি কৌশল খাটিয়েছে। আসলেই কেউ কেউ এ ব্যাপারে কোন হেয়াঁলী না করে খোলাখুলি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি জানিয়েছে। কিন্তু এরকম দাবীদারদের মধ্যে অন্ততঃ কোন খ্রিষ্টান থাকা উচিত না, কারণ তাদের নিজেদের বাইবেলের পাতায় বলা আছে,

> "কিন্তু যীশু জানতেন তাদের মনোভাব এবং বল্লেন: 'এমন প্রত্যেক রাজ্য যা নিজের মধ্যে বিভক্ত হয়েছে তা পতিত হবে এবং এমন শহর অথবা ঘর যা নিজের মধ্যে বিভক্ত হয়েছে তা টিকবে না। শয়তান যদি শয়তানকে বের করে দেয় তবে, সে তো নিজের বিরুদ্ধে নিজেকে বিভক্ত করে দিল। তাহলে কেমন করে তার রাজ্য টিকবে"?
>
> (ম্যাথিউ ১২:২৫-২৬)

একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে মার্ক ৩:২৩-২৭ এবং ল্যুক ১১:১৭ এ। সুতরাং বাইবেলের এ যুক্তি অস্বীকার করা হলে তা শুধু ঈসা (ﷺ)'কেই না, সেই সাথে বাইবেলের এ তিনজন লেখককে[55] ও অস্বীকার করা হবে। আর এটা বলার

---

[55] মার্ক, ল্যুক, ম্যাথিউ

অপেক্ষা রাখে না যে, আজকের বাইবেলকে যারা "স্রষ্টার আক্ষরিক বাণী" বলে বিশ্বাস করে, তাদের জন্যে এ উপদেশ প্রত্যাখ্যান করা স্রষ্টাকেই অস্বীকার করার নামান্তর। এতসব আলোচনার উদ্দেশ্য একটাই। আর তা হল, উপরের যুক্তি শুধু মুসলিমদের নয়, প্রকৃতপক্ষে এটা স্বয়ং বাইবেলেরও যুক্তি!

তাই ইসলামী বিশ্ব সবার প্রতি খোলা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে, কুরআনের রচয়িতার তালিকা থেকে যদি মানুষ ও জ্বীনকে বাদ দেয়া হয়, তবে আর কে বাকি রইল?

তৃতীয় প্রমাণ
কুরআনের বর্ণনায় অতীতের ঘটনা

ইহুদী-খ্রিষ্ট ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে বর্ণিত বেশ কিছু ঘটনার উল্লেখ কুরআনেও দেখা যায়। কিন্তু কুরআনের এ সমস্ত বর্ণনা বাইবেলের বর্ণনার হুবহু অনুরূপ নয়, এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। এরকম একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে, কুরআনের কাহিনী প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ থেকে নকল করা হয়েছে। এ ধরণের দুর্বল দাবীর যৌক্তিকতা বিভিন্নভাবে নস্যাৎ করা যায়। প্রথমতঃ মুহাম্মদ (ﷺ) নিরক্ষর ছিলেন বলে তাঁর পক্ষে অতীতের ধর্মগ্রন্থ পড়ে তা থেকে সাহায্য নেয়ার প্রস্তাবনাটি অমূলক। দ্বিতীয়তঃ ঐ সময়ে আরব উপদ্বীপে আরবীভাষী ইহুদী-খ্রিষ্টানদের পক্ষে পর্যন্ত তাদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা সম্ভব ছিল না। কী জন্য? এর উত্তর অতি সহজ, মুহাম্মদ (ﷺ) এর যুগে 'আরবী বাইবেল' বলে কোন কিছুর অস্তিত্বই ছিল না এবং এ ব্যাপারটি ইতিহাসে প্রমাণিত।

যারা দাবী করে যে, মুহাম্মদ (ﷺ) বাইবেলের কাহিনী নকল করে কুরআন রচনা করেছেন,তাদের পক্ষে ঐ সময়ে আরবী ভাষায় বাইবেলের অনস্তিত্বের ব্যাপারটি গলাধঃকরণ করা অত সহজ নয়। মুহাম্মদ (ﷺ) এর যুগে বিদ্যমান আরবী বাইবেলের সন্ধান পাওয়া গেলে তারাই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী খুশী হত। কিন্তু ঘটনা অন্য রকম প্রমাণিত হয়েছে। ইসলামের বিরুদ্ধে অপবাদ ও বিষোদ্গারে পরিপূর্ণ The Encyclopedia of Religion and Ethics পর্যন্ত স্বীকার করেছে যে, "ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বাইবেলের কোন অংশের আরবী অনুবাদ ছিল বলে কোন প্রমাণ মেলেনি"[56]। হেস্টিংস রচিত *Dictionary of the Bible* এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, দশম শতাব্দীর দিকে বাইবেল প্রথম আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল[57]। অন্যদিকে Encyclopedia Judaica এর তথ্য অনুযায়ী,

---

[56] Hastings, James. *The Encyclopedia of Religion and Ethics.* Vol X, p. 540.

[57] Hastings, James. *Dictionary of The Bible.* p. 105.

"ধারণা করা হয় যে, মুহাম্মদের সময়ে হয়ত বাইবেল (ইহুদীদের 'পুরাতন বাইবেল') অথবা অন্ততঃ এর কয়েকটি পুস্তিকার আরবী অনুবাদ থেকে থাকবে। অথচ এ ধারণার সপক্ষে কোন গ্রহণযোগ্য দলিল নেই। .....বর্ণিত আছে যে, ৮ম-৯ম শতকে হুনাইন ইব্ন ইসহাক (৮০০-৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ) গ্রীক ও সিরিয়াক ভাষা থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করে সম্পূর্ণ বাইবেলের একটি সংস্করণ তৈরী করেন.....হুনাইনের এ অবদানের কোন কিছুই আজ আর অবশিষ্ট নেই। আর হিব্রু থেকে আরবী ভাষায় সম্পূর্ণ বাইবেলের সবচেয়ে প্রথম ও প্রসিদ্ধ অনুবাদটির কৃতিত্ব সম্ভবতঃ সাদিয়াহ্ বি.যোসেফ গ্যাওনের (৮৮২-৯৪২ খ্রিষ্টাব্দ)"।[58]

সুতরাং স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে, মুহাম্মদ (ﷺ) এর জীবদ্দশায় এমনকি তাঁর মৃত্যুর ২০০ বছরের মধ্যে যদি আরবী ভাষায় ইহুদী-খ্রিষ্ট ধর্মগ্রন্থের অস্তিত্ব না থাকে তাহলে তিনি আর কোত্থেকে বাইবেলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কুরআনের এমন উপাদান সংগ্রহ করতে পারেন? যে জিনিসের কোন অস্তিত্বই নেই তা থেকে নকল করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার বৈ কি, আরো বেশী কষ্টসাধ্য তাঁর পক্ষে যিনি মোটেই লিখতে পড়তে জানেন না!

মুহাম্মদ (ﷺ) এর আমলে আরব উপদ্বীপে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের বসতি ছিল, এ তথ্য সবাই জানে। সে সময় ধর্মীয় সহ অন্যান্য সব ধরণের বর্ণনা মুখে-মুখে সংরক্ষণের (Oral tradition) রীতি চালু ছিল। মুহাম্মদ (ﷺ) এর স্ত্রী খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর মামাত ভাই ওয়ারাকাহ্ ইব্ন নওফাল ছিলেন খ্রিষ্টান। এছাড়া মুহাম্মদ (ﷺ) নিজেও অল্প বয়সে

---

[58] *Encyclopaedia Judaica*. Vol 4, p. 863.

সিরিয়ার নেস্টোরিয়ান (Nestorian) সাধু বহীরা সেরগিয়াসের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। তাই মুহাম্মদ (ﷺ) এর পক্ষে আরব ইহুদী-খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে তাদের ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। এখন এ সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইসলাম বিদ্বেষীরা মুহাম্মদ (ﷺ) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করাতে পারে যে, তৎকালীন ইহুদী-খ্রিষ্টানরা যে মৌখিক রীতি ব্যবহার করে বংশপরম্পরায় নিজেদের ধর্মীয়জ্ঞান সংরক্ষণ করে আসছিলো, সেই একই পদ্ধতিতে তারা মুহাম্মদ (ﷺ)'কেও তথ্য সরবরাহ করেছে। এ ধরণের অভিযোগ যেমন উত্থাপন করা যায়, তেমন খণ্ডনও করা যায়।

মুহাম্মদ (ﷺ) ইহুদী-খ্রিষ্ট সূত্র থেকে মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে কুরআনের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন - এ দাবী এর উপর ভিত্তি করে খণ্ডন করা হচ্ছে না যে ঐ সময় এ সব বর্ণনা দুর্লভ ছিল। কেননা এ সমস্ত বর্ণনা লিখিত না হলেও নিঃসন্দেহে মুখে-মুখে চালু ছিল। এখানে যে বিষয়টা লক্ষ্যণীয় তা হল, ঠিক কোন্ ধরণের ইহুদী-খ্রিষ্ট শিক্ষা ও ধর্মমত ঐ সময়ে আরব উপদ্বীপে প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন সূত্রে প্রমাণিত হয় যে, অজ্ঞতার (জাহেলিয়াত) যুগে বসবাসরত আরব ইহুদী-খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্মের মূলধারার বিশ্বাস অনুসরণ করত না। New Catholic Encyclopedia'র উদ্ধৃতিতে এর সমর্থন পাওয়া যায়,

> "সে সময় আরবের ইহুদী কিংবা খ্রিষ্টান কোন সম্প্রদায়ই তাদের নিজ নিজ ধর্মের মূলধারার প্রতিনিধিত্ব করত না। ইহুদীরা ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মাঝামাঝি থেকে স্বধর্মীদের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে আরবে বাস করে আসছিলো। আর এদিকে আরবের খ্রিষ্টানরা ছিল প্রধাণতঃ মূল ধর্মমত বিরোধী Monophysites, যারা খ্রিষ্টধর্মের কেন্দ্রীয় শিক্ষা হতে পৃথক ধারার বিশ্বাস পোষণ করত"[59]।

---

[59] New Catholic Encyclopedia. Vol 9, p. 1001.

পল ওয়েগনার যোগ করেছেন,

> "মুহাম্মদ (ﷺ) (৫৭০-৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ) এর আমলে (খ্রিষ্ট) ধর্মগ্রন্থের কোন আরবী অনুবাদ বিদ্যমান ছিল বলে জানা যায় না। তিনি বাইবেলের কাহিনী লোকমুখে জেনে থাকতে পারেন। কিন্তু ঐ সমস্ত প্রচলিত কাহিনী সিরিয়ার Docetism মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিল (এ মতবাদে বিশ্বাস করা হয় যে, ঈসা (عليه السلام) আংশিক নয় বরং পুরোপুরি ঐশী গুণসম্পন্ন অবতার ছিলেন। তারা আরো বিশ্বাস করত যে, পার্থিব জগত ও মানবদেহ প্রকৃতিগতভাবে অশুভ)"[60]।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, সে সময়ের আরব ইহুদী-খ্রিষ্টানরা প্রচলিত মূলধারার ধর্মমত থেকে ভিন্ন ধর্মমত (যেমন, Monophysite, Docetist, Nestorian ইত্যাদি) অনুশীলন করছিল। মুহাম্মদ (ﷺ) যদি সমসাময়িক ইহুদী-খ্রিষ্ট তথ্যসূত্র থেকে সাহায্য নিয়েই থাকেন তবে ঐ সব ধর্মমতের সাথে কুরআনের ধর্মবিশ্বাসের এত অমিল কেন? সে সময়ের Monophysite'রা ঈসা (عليه السلام) এর উপর যে ঐশ্বরিক গুণ ও ক্ষমতা আরোপ করত, কুরআনে বরঞ্চ তার নিন্দা করা হয়েছে। Docetist'রা ঈসা (عليه السلام)'কে অতিমানব বলে যে বিশ্বাস পোষণ করত তা প্রত্যাখ্যান করে তাঁকে (عليه السلام) একজন রক্তমাংসের স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে কুরআনে চিত্রায়িত করা হয়েছে। মুহাম্মদ (ﷺ) যদি সে সময়ের Nestorian বিশ্বাসেই প্রভাবিত হতেন তবে কুরআনে কেন স্রষ্টার সাথে ঈসা (মানুষ)'র মিলন এবং তাঁর (عليه السلام) ক্রুশবিদ্ধ হবার Nestorian দাবীকে অস্বীকার করা হয়েছে? কুরআন যদি ইহুদী-খ্রিষ্টানদের তথ্য থেকে লাভবান হত, তবে কুরআনে কেন আরবে প্রচলিত তৎকালীন ইহুদী-খ্রিষ্ট ধর্মমতকে খণ্ডন করার প্রয়াস দেখা যায় না? কুরআনে প্রধানতঃ মূলধারার সংখ্যাগরিষ্ঠ ইহুদী-খ্রিষ্ট ধর্মমত ও

---

[60] Wegner, Paul D. The Journey from Texts to Translations. 1999. Grand Rapids; Baker Books. P. 250.

সাধারণভাবে স্বীকৃত ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো উদ্দেশ্য করে আলোচনা করা হয়েছে। বিচ্ছিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী আরবের সংখ্যালঘিষ্ঠ ইহুদী-খ্রিষ্টানদের উদ্দেশ্যে নয়।

কুরআনে আরো একটি প্রসঙ্গ বারবার এসেছে তা হল, বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার এমন সব সূক্ষ বর্ণনা যা ইহুদী, খ্রিষ্টানসহ ঐ সময়ের সমস্ত আরব জনগোষ্ঠীর কাছে অজানা ছিল। নূহ (ﷺ) এর ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেবার পর কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে (ভাবার্থ),

> *"এটা হচ্ছে গায়েবী সংবাদ সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আমি তোমার কাছে ওহীর মাধ্যমে পৌঁছে দিচ্ছি, ইতোপূর্বে এটা না তুমি জানতে আর না তোমার সম্প্রদায়"। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, হুদ:৪৯)*

পৌত্তলিক পর্যটক, ইহুদী পন্ডিত, খ্রিষ্টান চিন্তাবিদ কিংবা কোন মুসলিমের মধ্যেও ইতিহাসে এমন একজন লোকও দেখা যায় না যে কুরআনের সূক্ষ ও নিখুঁত বর্ণনাগুলো জানবার দাবী করেছে। মানুষের ভীড়ে এমন একজনও এগিয়ে এসে কণ্ঠ তোলেনি, "দাঁড়াও! এ তো আমি আগে থেকেই জানি!" লিখিত কিংবা মৌখিক কোনভাবেই এ তথ্যগুলোর পূর্বঅস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং ইহুদী-খ্রিষ্ট সূত্র থেকে কুরআনের এ সমস্ত নিখুঁত তথ্য সংগ্রহ করার অলীক দাবী আবারও ভুল প্রমাণিত হয়। অন্যান্য ধর্মের পন্ডিত ব্যক্তিরাই যখন এ সমস্ত সূক্ষ তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন তখন আর কোন্ সূত্র বাকি থাকে?

বাইবেলে বেশ কিছু বিবরণ আছে ত্রুটিপূর্ণ। কুরআনে সেই ত্রুটিগুলোর পুনরাবৃত্তি তো হয়ইনি বরং সেগুলোকে সংশোধন করা হয়েছে - আর এ ব্যাপারটা অবশ্যই লক্ষ্য করার মত। মুহাম্মদ (ﷺ) এর কালে 'ধ্রুব সত্য' বলে মেনে নেয়া স্বতঃসিদ্ধ ভুলগুলো কুরআন শুধরে দিয়েছে এমন সব তথ্য দিয়ে যা ঐ সময়ের লোকদের কাছে ছিল অজানা। এ তথ্যগুলোর সত্যতা ভবিষ্যতে নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এমন

একটি গ্রন্থ সম্পর্কে নিশ্চয়ই বিস্ময় বোধ করার অবকাশ আছে!কারণ এরকমটা সচরাচর ঘটতে দেখা যায় না। মানুষের লেখা সাড়া জাগানো বইগুলো সাধারণত আশেপাশে প্রচলিত ও জনপ্রিয় মতামতের বিরোধিতা করে না, বরঞ্চ সায় দিয়ে থাকে। কিন্তু সত্যিকার আসমানীগ্রন্থের বেলায় এর বিপরীত হয়ে থাকে। আসমানীগ্রন্থ তো আগমন করে সত্যের আহ্বান নিয়ে মানবজাতির ভুল-ত্রুটি শুধরে দেবার জন্যই। মিথ্যার জৌলুসের মাঝে সে সত্য যত অপছন্দনীয়ই হোক না কেন। প্রকৃতপক্ষে এটাই কি আসমানী বাণীর উদ্দেশ্য নয়? কুরআনের ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয়নি। এতে সত্যবিশ্বাস নববলে বলীয়ান হয়েছে, প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি হয়নি বরং বেশ কিছু ভুল শুধরে দেয়া হয়েছে।

সমাজে প্রচলিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ভ্রান্তি কুরআনে শোধরানো হয়েছে তা হলো আকীদা বা ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি। কুরআনে খ্রিষ্টানদের উদ্দেশ্যে তাদের নিজস্ব গ্রন্থের দিকে তাকানোর জন্যে দৃপ্ত চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। বাইবেলের কোথাও তারা খুঁজে পাবে না যেখানে ঈসা (عليه السلام) নিজেকে "ঈশ্বরের পুত্র" বলে দাবী করেছেন। এ তথ্য মুহাম্মদ (ﷺ) কী করে জানলেন, তা নিয়ে কৌতুহলী ব্যক্তি মাত্রই কৌতুহল প্রকাশ করতে পারেন। বাইবেল পড়ে দেখবার মত অক্ষর-জ্ঞান তো তাঁর ছিল না। সে সময়ের খ্রিষ্টানরা পর্যন্ত বাইবেল পড়বার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল, কেননা এর প্রায় ২৫০ বছর পরে বাইবেলের আরবী অনুবাদ বের হয়েছিল। তাহলে মুহাম্মদ (ﷺ) এর এ জ্ঞানের উৎস আর কী হতে পারে? খুব বেশী হলে তিনি আশেপাশের খ্রিষ্টান পন্ডিতদের কাছ থেকে বাইবেলের কিছু অংশ জেনে নিতে পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও প্রশ্ন থেকে যায়, বাইবেলের অবশিষ্ট অংশে কী আছে সে সম্পর্কে তিনি কিভাবে জানলেন? কী করে তিনি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এলেন যে বাইবেলে অন্য আর কোথাও ঈসা (عليه السلام) নিজেকে 'ঈশ্বরের পুত্র" বলেননি? বাইবেলের সম্পূর্ণ কপি ছাড়া তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না যে, তাঁর জ্ঞানের বাইরেও বাইবেলের আরো লিপি থাকা অসম্ভব নয় যা কুরআনের দাবীকে ধূলিস্মাৎ করে দিতে পারে।

কুরআনে যে সমস্ত সংশোধন যাচাই ও প্রমাণ সাপেক্ষ তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো ('অজানা বিষয়ের ওহী' শীর্ষক ষষ্ঠ অধ্যায়ে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অন্যান্য সাধারণ কিছু বর্ণনাও লক্ষণীয়, যেমন ঈসা (ﷺ) এর ধর্মপ্রচারণা শুরুর বয়সের বিষয়টি। বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে,
"যীশু এবার নিজে প্রায় ত্রিশ বছর বয়সে ধর্ম প্রচার শুরু করলেন...."। (ল্যুক, ৩:২৩)

ঈসা (ﷺ) কত বছর বয়সে ধর্মপ্রচার শুরু করেছিলেন এ ব্যাপারে যে কোন খ্রিষ্টানের কাছে প্রশ্ন করা হলে বেশীর ভাগ উত্তর হবে 'ত্রিশ অথবা এর কিছু কম-বেশী'। অথচ ইতিহাস ভালভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তখন ঈসা (ﷺ) এর বয়স আটত্রিশের কম ছিল না, এমনকি ছিচল্লিশও হতে পারে। অন্ততঃ আটত্রিশ তো বটেই[61]। সুতরাং (Luke, 3:23)-এ বলা উচিত ছিল "প্রায় চল্লিশ"। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, এ আটত্রিশ-ছিচল্লিশ বছরের উল্লেখই বা কোত্থেকে এলো? ঈসা (ﷺ) এর জন্ম হয়েছিল জুডিয়ার অধিপতি হেরড (Herod the great) এর শাসনামলে। আর হেরড মৃত্যু বরণ করেছিল জ্যোতির্বিদদের হিসাব অনুযায়ী ১২ থেকে ১৩ই মার্চ, ৪র্থ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ঘটা চন্দ্রগ্রহণের অল্প সময় পর। এদিকে ঈসা (ﷺ) ধর্মপ্রচার শুরু করেছিলেন ইয়াহিয়া (ﷺ) বন্দী হবার পরপরই। এ প্রসঙ্গে ইয়াহিয়া (ﷺ) এর বন্দীত্ব গ্রহণের কারণ উল্লেখ করা প্রয়োজন। রাজা হেরডের পুত্র এন্টিপাসের (Galilee ও Perea'র গভর্ণর)বিরুদ্ধাচরণ করার অপরাধে তাঁর এ পরিণতি ঘটেছিল। এন্টিপাস নিজ ভাতিজি ও ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করেছিল। যে কেউ জানে যে, কোন ব্যক্তি ভাই জীবিত থাকা অবস্থায় নিজের ভাবীকে বিয়ে করতে পারে না। এক্ষেত্রে ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ ঘটা অবশ্যম্ভাবী। জোসেফাস তার Jewish Antiquities রচনায় উল্লেখ করেছে যে, হেরডের ভাই ফিলিপ মারা

---

[61] Fox, Robin Lane. 1991. *The Unauthorized Version; Truth and Fiction in the Bible*. Viking Press. pp. 28-34.

গিয়েছিল "..টিবেরিয়াসের শাসনকালের দ্বাদশ বছরে..."। ৩৭ বছর ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পর ফিলিপ মৃত্যু বরণ করেছিল। এ উভয় ঘটনার সময়কাল ছিল ৩৩ থেকে ৩৪ খ্রিষ্টাব্দের দিকে[62]। এরপর কিছু নাটকীয় ঘটনা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং শোকাতুর বিধবা ভ্রাতৃ-বধুকে (যার শোক সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবার অবকাশ আছে) তুলে এনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, জনগণের অসন্তোষ এবং অবশেষে প্রতিবাদ করার শাস্তিস্বরূপ ইয়াহিয়া (ﷺ)'কে কারাগারে নিক্ষেপ। ইয়াহিয়া (ﷺ) বন্দী হবার পর ৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ঈসা (ﷺ) ধর্মপ্রচার শুরু করেন। বাইবেলের মার্ক ও ল্যুক বর্ণিত সুসমাচারে এর সমর্থন মেলে, "ইয়াহিয়াকে কারাগারে নিক্ষেপের পর যীশু গ্যালিলিতে এলেন, লোকদেরকে প্রভুর রাজ্য সম্পর্কে শিক্ষা দিলেন"। (মার্ক, ১:১৪)

সুতরাং ৪র্থ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৩৪ খ্রিষ্টাব্দ – হিসাব করলে দেখা যায়, ধর্মপ্রচার শুরুর সময় ঈসা (ﷺ) এর বয়স ছিল কমপক্ষে আটত্রিশ।

প্রায় সমস্ত খ্রিষ্টানদের মতে ঈসা (ﷺ) ধর্মপ্রচার শুরু করেছিলেন ত্রিশের কোঠায়, আজকের খ্রিষ্টানদেরও এটাই বিশ্বাস। ফলে সুনিশ্চিত যে, মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর সময়ের খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে শুনে থাকলে এ ব্যাপারে ভিন্ন কোন তথ্য পেতেন না। অথচ কুরআনে কী বলা হয়েছে? সুরাহ মায়িদাহ্'র ১১০ নং আয়াতে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ আছে যে, ঈসা (ﷺ) লোকের সাথে কথা বলেছিলেন শিশু অবস্থায় এবং 'কাহ্লান' অবস্থায়। আরবী শব্দ 'কাহ্লান' এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যার বয়স ত্রিশ ও পঞ্চাশের মাঝামাঝি[63]। কুরআন যদি বাইবেলের নকল হত তবে ঈসা (ﷺ) এর বয়স সে সময় 'প্রায় ত্রিশ' বলে উল্লেখ করাটাই

---

[62] Whiston, William, A.M. 1998. *Josephus, The Complete Works*. Nashville: Thomas Nelson Publishers. 18.4.6., p. 580.

[63] Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. 3rd printing. Beirut: Librairie Du Liban; London; MacDonald & Evans Ltd. 1980.

স্বাভাবিক ছিল। তা তো হয়ইনি বরং, কুরআন বাইবেলের চেয়ে আরো বেশী সঠিক তথ্য উল্লেখ করেছে এবং এমন কোন একগুঁয়ে দাবী তুলেনি যা ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা বাতিল প্রমাণিত হয়। অন্যদিকে ঐতিহাসিক দলিল বাইবেলের তথ্যের প্রকাশ্য বিরোধিতা করে। কুরআনের বর্ণনা এ ব্যাপারে ইতিহাসের তথ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তো বটেই, সেই সাথে বাইবেলের ভুলের পুনরাবৃত্তি না করে সেই ভুল শুধরে দিয়েছে।

ইতিহাস প্রসঙ্গে কুরআনের আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, 'ফেরাউন' উপাধিটি প্রচলিত ছিল শুধুমাত্র খ্রিষ্টপূর্ব ১৪শ শতাব্দীর মিশরীয় শাসনামলের সময় এবং তার কিছু পরে। আরো নির্দিষ্ট করে বলা যায় যে, এ উপাধি ১,৫৩৯ থেকে ১,২৯২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত এবং ৯৪৫ থেকে ৭৩০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল[64]। একটি সূত্রে বলা হয়েছে, "রাজকীয় এ মিশরীয় উপাধি উৎপত্তি ঘটেছিল ১৮তম রাজবংশের রাজাদের প্রতি সম্মান দেখাতে।...রাজা তৃতীয় টুটমোসের আগে 'ফেরাউন' শব্দের কোন প্রচলন ছিল না"[65]। একই সূত্র থেকে আরো জানা যায় যে, মিশরের ১৮তম রাজবংশের ফেরাউন তৃতীয় টুটমোসের জীবনকাল স্থায়ী হয়েছিল আনুমাণিক ১৪৯০ থেকে ১৪৩৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত।[66] সুতরাং ১৪৯০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের আগে 'ফেরাউন' শব্দটি ব্যবহার করা মোটেই সময়োপযোগী হবে না, বরং তা হবে "কোন রীতি বা প্রথা ভুল সময়ে আরোপ করা"।[67] অন্য কথায় তা সময় ও স্থানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হবে।

---

[64] *Encyclopaedia Britannica.* CD-ROM.

[65] *The Encyclopedia Americana International Edition.* 1998. Grolier Inc. Vol 21. p. 848.

[66] *The Encyclopedia Americana International Edition.* Vol 26. p. 714.

[67] Thompson, Della (editor), *The Oxford Dictionary of Current English* 1993. Second Edition. Oxford University Press. p. 26.

এখন ইউসুফ (আঃ) এর সময়ে (১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে) মিশর শাসন করত হিকসস নামে অন্য একটি রাজপরিবার। জাতিগতভাবে আরব এ রাজপরিবারই দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে এরা মিশরীয় রাজসিংহাসন দখল করেছিল। এদের শাসনকাল ১৫শ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের শেষাবধি স্থায়ী হয়েছিল। এ হিকসস রাজপরিবারের কোন রাজার বেলায় 'ফেরাউন' উপাধি কখনও ব্যবহৃত হয়নি। এমনকি ইউসুফ (আঃ) এর পরে প্রায় দুই'শ বছরেও ইতিহাসের পাতায় কোথাও এ উপাধির প্রচলন দেখা যায় না। আর ইউসুফ (আঃ) বেঁচে ছিলেন ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে, অর্থাৎ হিকসস রাজবংশের রাজত্বকালের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে। সুতরাং বোঝাই যায় যে, তাঁর যুগে 'ফেরাউন' উপাধিটি একেবারেই সময়োচিত নয়। অথচ বাইবেলে ইউসুফ (আঃ) (জেনেসিস: ৩৯-৫০ দ্রষ্টব্য) এবং মুসা (আঃ) উভয়ের সমসাময়িক রাজার ক্ষেত্রেই 'ফেরাউন' উপাধিটি প্রয়োগ করা হয়েছে। দুটির মধ্যে অন্ততঃ একটি তথ্য ভুল – আর আসমানী গ্রন্থের বেলায় এরকম ভুল কতখানি গ্রহণযোগ্য?

এবার কুরআনের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। কুরআন মুসা (আঃ) এর সমসাময়িক রাজাকে 'ফেরাউন' বলে চিহ্নিত করলেও ইউসুফ (আঃ) এর সমসাময়িক রাজাকে শুধুমাত্র 'রাজা' বলেই উল্লেখ করেছে, 'ফেরাউন' বলে নয়। অর্থাৎ বাইবেলের ভুল কুরআনে পুনরাবৃত্ত হয়নি (সুরাহ ইউসুফ:১২ দ্রষ্টব্য)। কুরআনে 'ফেরাউন' উপাধিটি কম ব্যবহৃত হয়নি, অন্ততঃপক্ষে ৭০ এর বেশী তো হবেই। প্রতি বার তা উল্লেখিত হয়েছে মিশরীয় রাজতন্ত্রের ঐ সময়ের প্রেক্ষাপটে যখন মিশরের রাজাদের 'ফেরাউন' বলা হত। সুতরাং ইউসুফ (আঃ) এর সমকালীন রাজার ক্ষেত্রে 'ফেরাউন' শব্দটি প্রয়োগ না করা তাৎপর্যময় বটে!

মিশরের প্রসঙ্গে আরো একটি ব্যাপার উল্লেখ না করলেই নয়। আর তা হল, কুরআনের বর্ণনায় ফেরাউনকে দেখা যায় 'হামান' নামের কোন

ব্যক্তিকে ইমারত নির্মাণের জন্য ইট পোড়ানোর আদেশ দিতে (মহিমাময় কুরআন ২৮:৩৮)। 'হামান' শব্দটি প্রাচীন হায়রোগ্লিফিক ভাষার মিশরীয় উপাধি যার অর্থ 'পাথর খনির শ্রমিক-নেতা'[68]। ঐতিহাসিক যে সময় ও স্থানে প্রধানতঃ বৃহদাকার পাথর স্তুপ করে ইমারত নির্মাণের কাজ চলত সেখানে 'হামান' ছিল সেই মুখ্য ব্যক্তি যে নির্মাণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান যোগান দিত। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে, হায়রোগ্লিফিক এ উপাধিটি মুহাম্মদ (ﷺ) এর সময়ে একেবারে অজানা ছিল। ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে 'রোসেটা শিলালিপি' আবিষ্কারের পরই কেবল 'হামান' এর অর্থ আমরা জানতে পেরেছি। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ৩০ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে মারকাস এন্টনিয়াসের (মার্ক এন্টনি) মৃত্যু বরণ এবং ক্লিওপেট্রার আত্মহত্যার পর মিশরীয় রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটেছিল। এরপর সেখানে রোমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে অধিকৃত অঞ্চলের ভাষা হয়েছিল ল্যাটিন। পাশাপাশি বিচ্ছিন্নভাবে কিছু গ্রীকের প্রচলন ছিল, কিন্তু পরবর্তী একশ বছরের মধ্যে হায়রোগ্লিফিক মৃত ভাষায় পরিণত হয়। কালের স্রোতে এর প্রচলন ও বোধগম্যতা সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায়। সম্প্রতি রোসেটা শিলালিপি আবিষ্কৃত না হলে এ ভাষার পুনরভ্যুদয় ঘটত না। হায়রোগ্লিফিক ভাষাকে কোনমতেই সহজবোধ্য বলা যায় না, ফলে রোসেটা শিলা হাতে পাবার পর এর অর্থ পুনরুদ্ধারের কাজটি বেশ কঠিন ছিল। অর্থোদ্ধারের এ প্রচেষ্টায় প্রচুর সময় (প্রায় বিশ বছরেরও বেশী), উদ্যোগ ও ইউরোপের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হয়েছিল। এসব দেখে যে কারো মনে প্রশ্ন জাগে, কেমন করে কুরআনের রচয়িতা জানলেন যে সে যুগে ইমারত নির্মাণের উপকরণ সরবরাহের দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিকে 'হামান' বলা হত? উল্লেখ্য যে,

---

[68] *Hermann Ranke. Die Ägyptischen Personennamen (Dictionary of Personal Names of the New Kingdom). Verzeichnis der Namen, Verlag Von J J Augustin in Glückstadt, Band I (1935); Band II (1952).*

মুহাম্মদ (ﷺ) এর যুগে হায়রোগ্লিফিক ভাষাটি প্রায় পাঁচশ বছরেরও বেশী সময় ধরে মৃত ছিল এবং সেই সাথে এ ধরণের উপাধিও ছিল অপ্রচলিত।

এরকম আরেকটি উদাহরণ টানা যাক। ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী, ঈসা (عليه السلام) এর অনুসারীদের 'খ্রিষ্টান' বলে চিহ্নিত করার রীতি শুরু হয়েছিল ঈসা (عليه السلام) এর অন্তর্ধানের বহু বছর পর। ঈসা (عليه السلام) নিজ মুখে কখনই তাদের 'খ্রিষ্টান' বলে সম্বোধন করেননি। এ শব্দটি জন্ম লাভের পর সারা পৃথিবীর খ্রিষ্টানদের মধ্যে পরবর্তীতে এর প্রচলন ছড়িয়ে পড়েছিল। মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর সমকালীন খ্রিষ্টানদের জিজ্ঞেস করলে অবশ্যই তারা নিজেদের পরিচয় দিত 'খ্রিষ্টান' (আরবীতে 'মাসিহিয়্যুন') বলে। কারণ সে সময় ঈসা (عليه السلام) (হিব্রুতে যাকে 'মেসিয়্যাহ্' ও আরবীতে 'মাসীহ্' বলা হয়েছে) এর অনুসারীদের (-ইয়্যুন) বোঝাতে 'মাসিহিয়্যুন' শব্দটির ব্যবহার ছিল বহুল প্রচলিত। এখনও পর্যন্ত আরবের খ্রিষ্টানরা নিজেদের 'মাসিহিয়্যুন' বলে চিহ্নিত করার প্রথা বজায় রেখেছে। অন্যদিকে পশ্চিমা-বিশ্বে বসবাসকারী তাদের স্ব-ধর্মীয়রা নিজেদের 'খ্রিষ্টান' বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। সুতরাং ঈসা (عليه السلام) এর অনুসারীদের কোন্ নামে অভিহিত করা মুহাম্মদ (ﷺ) এর জন্য স্বাভাবিক ছিল বলে মনে হয়? অবশ্যই 'মাসিহিয়্যুন'। তাহলে কুরআনের কোথাও এ নামটি উল্লেখ করা হয়নি কেন? কুরআনে অসংখ্যবার তাদের প্রসঙ্গ এলেও একবারও 'খ্রিষ্টান' কিংবা 'মাসিহিয়্যুন' বলে উল্লেখ করা হয়নি, বরং বলা হয়েছে 'নাসারা' (নাযারীন)। এ 'নাসারা' শব্দটি দীর্ঘদিন মানুষের মুখ থেকে হারিয়ে গেলে কী হবে, বাইবেলে কিন্তু ঈসা (عليه السلام)'কে ঠিকই 'নাযারীন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, 'খ্রিষ্টান' বলে নয়। সুতরাং মনে প্রশ্ন জাগে, এ তথ্য মুহাম্মদ (ﷺ) এর কানে কে পৌছে দিল? কে-ই বা তাঁকে জানালো যে, সারা পৃথিবী 'খ্রিষ্টান' নামে ডাকলেও ঈসা (عليه السلام) এর অনুসারীদের প্রকৃত নাম 'নাসারা'?

আজ হাজারে একজন কিংবা তারও কম খ্রিষ্টান এ কথা জানে যে, 'খ্রিষ্টান' শব্দটি প্রথমদিকে ঈসা (ﷺ) এর অনুসারীদের প্রতি অবজ্ঞা দেখাতে অথবা কৌতুকচ্ছলে ব্যবহৃত হত। প্রথম খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আরামাইক ও আরবীতে 'মাসিহিয়্যুন' শব্দটির প্রচলনই সবচেয়ে জনপ্রিয়। অথচ বাইবেলে তাদের বলা হয়েছে 'নাসারা'। সুতরাং এরকম একটি জনপ্রিয় ও প্রচলিত রীতির বিপরীতে গিয়ে মুহাম্মদ (ﷺ) কেন 'নাসারা' শব্দটি ব্যবহার করবেন, যদি না তিনি তা আসমানী বাণী থেকে পেয়ে থাকেন? যে বাণী তাঁর ও পৃথিবীর অধিকাংশের ভুল শুধরে দিয়েছে!

উপরের এ সমস্ত বর্ণনা আপাতঃদৃষ্টিতে ছোটখাট ব্যাপার বলে মনে হলেও এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা লোকচোখে উপেক্ষিত এ সব সূক্ষ ব্যাপারেই সাধারণতঃ ভণ্ড নবীরা হোঁচট খেয়ে থাকে। কেউ তো কখনও বড় দালানে ধাক্কা খেয়ে পড়ে না, ফুটপাথে পড়ে থাকা ছোট ছোট প্রতিবন্ধকই পথিকের পদস্খলন ঘটায়। যুগ যুগ ধরে মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভুল তথ্যের উপর নতুন করে প্রলেপ দেবার পরিবর্তে কুরআনে সূক্ষাতিসূক্ষ বর্ণনা শুধরে দেয়া হয়েছে।

মানুষের প্রবণতা হল সমাজে প্রচলিত ভুলের ফাঁদে জড়িয়ে পড়া। অথচ সবাই আশা করে যে, সৃষ্টিকর্তার অবতীর্ণ গ্রন্থ এ সমস্ত ভুল খণ্ডন করে তুলে ধরবে প্রকৃত সত্য। সেই সত্য, যা সূক্ষ বিশ্লেষণ ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার যোগ্যতা রাখে। এমনকি বাইবেলেও বলা আছে, "যে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বিষয়ে বিশ্বস্ত, সে বড় বিষয়েও বিশ্বস্ত। আর যে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বিষয়ে অবিশ্বস্ত, সে বড় বিষয়েও অবিশ্বস্ত" (ল্যুক ১৬:১০)। বাইবেল সংকলকদের ব্যাপারে এ বাণী প্রয়োগ করে বলা যায় যে, বাইবেলের সামান্যতম ভুল-ত্রুটি (যা বর্ণনার অবিশ্বস্ততা প্রকাশ করে) উপেক্ষা করার মত বিষয় নয়। ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হলেও বাইবেল লিপিকরদের যে কোন ভুল বুদ্ধিমান পাঠকের হৃদয়ে সতর্ক সংকেত জাগিয়ে তোলা উচিত, কারণ "...ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বিষয়ে যে অবিশ্বস্ত, সে বড় বিষয়েও অবিশ্বস্ত"। তুচ্ছ ও সামান্য হলেও ছোট-খাট তথ্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ

ছোট-খাটো বর্ণনাগুলোই ভুল-ত্রুটির প্লেগে আক্রান্ত ধর্মগ্রন্থের অবিশ্বস্ততার পতাকা তুলে ধরে। ধর্মগ্রন্থে বিশ্বস্ততার অভাব মহাসত্যের প্রতি, সেইসাথে সৃষ্টিকর্তার প্রতি অবিশ্বস্ততার পরিচায়ক।

এরপর আসে ইরামের ঘটনা। কুরআনের ৮৯তম সুরাহ্'য় (আয়াত নং ৭) বর্ণনা প্রসঙ্গে 'ইরাম' নামে এক নগরীর কথা উচ্চারিত হয়েছে। এ শহরটি ইতিহাসে ৩৫০০ বছরেরও বেশী সময় ধরে কালের ধুলায় ধূসরিত হয়ে ছিল। কুরআন অবতীর্ণ হবার সময় থেকে প্রায় ১৪০০ বছর ধরে অনেক মুসলিমের কাছে কুরআনে 'ইরাম' শহরটির উল্লেখ অস্বস্তির কারণ হত, যেহেতু পৃথিবীর বুকে এর অস্তিত্বের কোন ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণ ছিলনা। সত্যিকারের বিশ্বাসী ব্যক্তি কুরআনের বিশুদ্ধতা নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ না করলেও, বাইরের তথ্য-প্রমাণ হৃদয়ে স্বস্তি দান করে। এ কথা আরো বেশী তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা দীর্ঘদিন এমন এক ধর্মবিশ্বাসের (খ্রিষ্টানধর্ম) সাথে যুক্ত ছিল যার নীতি হল – 'অন্ধভাবে সব বিশ্বাস করে নাও'। ফলে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাচীন এ শহরটির অস্তিত্ব সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণের সন্ধান পাওয়া এক রকম আশীর্বাদই বটে।

১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত National Geographic পত্রিকায়, উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ায় অবস্থিত প্রাচীন 'এব্‌লা' নগরীর ভিতর দিয়ে ইরামে যাবার পথ অতিক্রম করেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ পত্রিকার "Ebla, Splendor of an Unknown Empire" (এব্‌লা, এক অজানা রাজ্যের দীপ্তিময় কাহিনী) শীর্ষক নিবন্ধটি উৎসর্গ করা হয়েছে এ যুগের শ্রেষ্ঠ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার 'এব্‌লা' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায়। আগ্রহীরা যে বইগুলো থেকে এ ব্যাপারে আরো বেশী তথ্য পেতে পারেন সেগুলো হচ্ছে, Ranulph Frennes রচিত "Atlantis of the sands", Chaim Bermant ও Michael Weitzman রচিত "A Revelation in Archeology" এবং Bill Harris রচিত "Lost Civilations"। এব্‌লা আবিষ্কার

কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় National Geographic পত্রিকার বর্ণনায়,-

> "...১৯৭৫ সালে Matthiae হঠাৎ করে এক অসাধারণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের সন্ধান পান। ২৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ধ্বংসপ্রাপ্ত এক প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নস্তুপ থেকে তিনি ৩য় সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ আর্কাইভটি (দলিল-পত্রের সংগ্রহশালা) খুঁজে বের করে আনেন। এতে পাওয়া গেছে ১৫,০০০'র বেশী মাটির ফলক ও পাথরের টুকরায় কিউনিফর্ম বর্ণমালায় লেখা অসংখ্য ব্যবসায়িক দলিল, চুক্তি-পত্র, উপাখ্যানের ধারাবিবরণী প্রভৃতি। এ সমস্ত ফলক যেন অতীতের কুয়াশা ভেদ করে ফিসফিসিয়ে জানায় এক অজ্ঞাত সেমিটিক সাম্রাজ্যের হারানো জৌলুসের কাহিনী। 'এব্‌লা' হল এ সমৃদ্ধশালী সাম্রাজ্যের মধ্যমণি, মধ্যপ্রাচ্যের সুবিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছিল যার আধিপত্য। অসাধারণ এ আবিষ্কার সারা বিশ্বের বিজ্ঞ মহলকে বজ্রের মত নাড়া দিয়েছে"।[69]

ডঃ ইগনেস জে. গেল্‌ব এ প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান নিয়ে বলেছেন,

> "এব্‌লা অত্যন্ত শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল, সমসাময়িক অন্যান্য ক্ষমতাশালী রাজ্যের মত ছিল এর প্রতিপত্তি ও মর্যাদা"।[70]

এব্‌লায় যে সমস্ত কিউনিফর্ম লিপির সন্ধান পাওয়া গেছে তার গুরুত্বের উপর আলোকপাত করে ডঃ জিওভান্নি পেটিনাটো বলেছেন, "আজ পর্যন্ত যত প্রাচীন লিপি খুঁজে পাওয়া গেছে তা এককভাবে এব্‌লায় প্রাপ্ত কিউনিফর্ম লিপির এক চতুর্থাংশও নয়"।[71]

পৃথিবীর বৃহত্তম কিউনিফর্ম ফলকের (পোড়ামাটির চ্যাপ্টা ফলকে লেখা খোদাইকৃত খোঁজ-আকৃতির বর্ণমালা) সংগ্রহটি বিবর্ণ ইতিহাসের পাতা থেকে ধুলা সরিয়ে এমন এক চিত্র তুলে ধরে যা মানুষের মধ্যে অনেক

---

69 *National Geographic*, December, 1978. pp. 731-5.
70 *National Geographic*, December, 1978. pp. 735.
71 *National Geographic*, December, 1978. pp. 735.

প্রচলিত ধারণা বদলে দিয়েছে। প্রাচীনতম সেমিটিক ভাষায় লিখিত এ ফলকগুলো ভীষণ সম্পদশালী ও উন্নত এক জনপদের কথা বলে। এব্‌লার রাজকীয়-গ্রন্থাগারের বিভিন্ন দলিল-পত্র পরীক্ষা করে প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞরা মতামত দিয়েছে:"...প্রাচীন বিশ্বের শক্তিশালী নগরী এব্‌লা সে সময় মিশর ও মেসোপটেমিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল"।[72]

মনে প্রশ্ন জাগে, এ রকম একটি সমৃদ্ধশালী জনপদের কী পরিণতি হয়েছিল? ২৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সারগনের হাতে 'এব্‌লা' পরাজয় বরণ করার পর এর অধিকাংশ এলাকা সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। আর প্রাসাদটি আগুনে ভস্মীভূত হবার ফলে এর অভ্যন্তরস্থ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত মাটির ফলকগুলো পুড়ে শক্ত হয়ে অক্ষত সিরামিকে পরিণত হয়েছে। ধ্বংসস্তুপের বিভিন্ন স্তর পরীক্ষা করে বোঝা যায় যে, এব্‌লা ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আরো একবার বিপর্যয়ের স্বীকার হয়েছিল। ধারণা করা হয় আমোরাইটদের অবরোধের ফলে এ বিপর্যয় ঘটেছিল। কিন্তু এত ক্ষয়-ক্ষতির পরও এব্‌লা নগরী পুনর্নির্মানের প্রচেষ্টা থেমে থাকেনি। "সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হলেও এব্‌লা আবার উন্নতি লাভ করতে শুরু করে। কিন্তু ১৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে এর চূড়ান্ত অবনতি শুরু হয় এবং পরবর্তী দুই'শ বছরের মধ্যে ইতিহাসের পাতা থেকে এব্‌লা সম্পূর্ণ উধাও হয়ে যায়"।[73]

কিন্তু এব্‌লার এত সব আলোচনার সাথে ইরামের কী সম্পর্ক? পৃথিবীর অন্য সব বৃহৎ শক্তির মত এব্‌লাও আশেপাশের জনপদগুলোর ইতিহাস সংরক্ষণ করে রাখত। যে সব অঞ্চল থেকে কর আদায় করা হত ও যাদের সাথে ব্যবসায়িক লেন-দেনের সম্পর্ক ছিল – এ ধরণের জনপদগুলোর সীমানা ও তালিকা এর সংগ্রহে ছিল। বালিয়াড়ির নীচে অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে এ সমস্ত দলিল প্রাসাদ-গ্রন্থাগারে সংগৃহীত

---

[72] *National Geographic*, December, 1978. pp. 731
[73] *National Geographic*, December, 1978. pp. 748

হয়েছিল। এসব দলিল-পত্র থেকে পাওয়া গেছে – বৈরুত, দামেস্ক, গাজা, সোডোম, গোমোরাহসহ অনেক জনপদের নাম। আরো পাওয়া গেছে, "....ইতিহাসে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া 'ইরাম' নামের জাঁকজমকপূর্ণ এক নগরীর কথা যার উল্লেখ আমরা দেখি কুরআনের ৮৯ নং সুরাহ্'য়"[74]। যাহোক, ১৯৭৫ সালে প্রথমবারের মত মানুষ ইরাম নামের শহরটির সন্ধান পায়। ইরাম ছাড়াও এব্লার নথিপত্রে পাওয়া গেছে – 'আদ' ও 'সামাতু' ('সামুদ') নামের আরো দুটি বিলুপ্ত সভ্যতার কথা, যাদের বর্ণনা কুরআনে এসেছে[75]। কুরআনের ৮৯ নং সুরাহ্'র পাঁচটি সংক্ষিপ্ত আয়াতে (৬-১০ নং) – ইরাম, আদ, সামুদ এবং ফেরাউনের জনপদ, এ চারটি হারানো সভ্যতার উল্লেখ আছে।

এখন কথা হচ্ছে, চৌদ্দ'শ বছর আগে মুহাম্মদ (ﷺ) এর পক্ষে কি ইরাম নগরী সম্পর্কে জানা সম্ভব ছিল? ফেরাউনের জনপদ তো অবশ্যই, সামুদের কথাও তিনি জানতেন। সৌদি আরবের 'মাদাইন সালিহ্' শহরে অবস্থিত সামুদের ধ্বংসাবশেষ এ যুগেও বিশেষ পরিচিত ভ্রমণ কেন্দ্র। কিন্তু অন্য দুটির বেলায় কী তা বলা যায়? মুহাম্মদ (ﷺ) পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখবারও হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া একটি প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে জানা কী করে তাঁর পক্ষে সম্ভব হতে পারে? যে স্থান ও কালে যোগাযোগের দ্রততম মাধ্যম ছিল 'উট', সেখানে কী করে তিনি জানবেন এ সমস্ত হারিয়ে যাওয়া নগরের নাম? যেখানে সাধারণ একজন আমেরিকান পর্যন্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীনতম তিনটি জনপদের নাম বলতে পারে না। এমনকি 'মালিটপ্‌ল চয়েস''এর সুযোগ দেয়া হলেও ভুল উত্তর পাবার সম্ভাবনাই বেশী। অথচ আমেরিকার জনপদগুলো শুধু যে ইতিহাসে পরিচিত তা-ই নয়, এগুলো মাত্র তো কয়েক'শ বছরের

---

[74] *National Geographic.* December, 1978. p. 736.
[75] Bermant, Chaim and Michael Weitzman. 1979. Ebla: A Revelation in Archaeology. Times Books. p. 191.

পুরোন। প্রশ্ন ওঠে, তাহলে মুহাম্মদ (ﷺ) কোত্থেকে 'ইরাম', 'আদ', 'সামুদ' এ প্রাচীন নামগুলো যোগাড় করলেন? শনাক্ত করা হয়নি এমন কোন অখ্যাত, অজ্ঞাত নাম নিজের বইতে উল্লেখ করা ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ বৈ কি, যদি না সেই রচয়িতা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা হয়ে থাকেন। আর মুসলিমরা তো এ দিকেই আঙ্গুল তুলে ইঙ্গিত দেয়। কেননা কুরআন কোন মানুষের রচনা হলে আমরা অন্য রকম বাস্তবতা দেখতে পেতাম। যাহোক যদি বিশ্বাস করা হয় যে, এ গ্রন্থটি স্রষ্টার পক্ষ থেকে ওহী হিসেবে অবতীর্ণ, নশ্বর এক মানুষ কেবল তা প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছে – তাহলে কিন্তু এরকম হারানো সভ্যতা আর অতীতের জ্ঞান সম্পর্কে যে ধাঁধা তা সহজেই সমাধান হয়ে যায়।

ভণ্ড নবীর কাল্পনিক চিত্র তৈরী করে নিতে চাইলে, কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য মনে স্থান পায়। প্রথমতঃ কোন ভণ্ড নবী যদি অনুসারীদের আস্থা অর্জন করতে চায় তাহলে সে বাজারে অচল পয়সা ব্যবহার করার মত বোকামী করবে না। উদাহরণস্বরূপ, অজ্ঞাত পরিচয়হীন কোন অতীত সভ্যতার নাম উল্লেখ করার কিইবা দরকার যখন হাতের কাছেই পরিচিত অনেক দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যেমন নাযারেথ? সে সময়ের খ্রিষ্টানদের পক্ষে নাযারেথের বর্ণনায় মুহাম্মদ (ﷺ) এর কান ভারী করে তুলবার কথা। তাই মুহাম্মদ (ﷺ)'কে যারা ভণ্ড নবীর অপবাদ দেয় তাদের সামনে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হল এ বিষয়টির বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দেয়া যে, কুরআনে কেন একবারও নাযারেথ নামটি আসেনি। কারণ কুরআনে নাযারেথের নাম দেখতে পেলে খ্রিষ্টানদের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠা খুব স্বাভাবিক ছিল। তাই কুরআনে নাযারেথ নামটি কেন আসেনি এর কারণ জানতে চাওয়ার ব্যাপারে যে কেউ কৌতুহলী হতে পারে, যদি না নাযারেথ নামের আদৌ কোন শহরের অস্তিত্ব থেকে থাকে। আর সত্যি বলতে, নাযারেথের অস্তিত্ব প্রসঙ্গটি আরেকটি রহস্যময় অধ্যায়, যার স্বপক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ দলিল-প্রমাণের অভাব আছে।

নতুন বাইবেলে সব মিলে প্রায় ২৯ বার নাযারেথের নাম এসেছে। অথচ ঈসা (عليه السلام) এর যুগে নাযারেথ শহরের অস্তিত্বের বিষয়টি

প্রমাণিত না। বরং সে সময়ে এ নামের কোন শহরের অস্তিত্ব ছিল না বলে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সে সময় রোমানরা প্যালেস্টাইনের প্রত্যেকটি শহর সম্পর্কে ব্যবসায়িক ও ট্যাক্স বিষয়ক দলিল লিপিবদ্ধ করে রাখত। রোমানরা এ দলিল লেখার ব্যাপারে কঠোর নিয়ম-কানুন মেনে চলত। কারণ তারা ট্যাক্স সংগ্রহের জন্য উদ্দেশ্যহীনভাবে শহরে শহরে ঘুরে বেড়ানোর পক্ষপাতী ছিল না। তাদের এ সমস্ত দলিলে নাযারেথের কোন উল্লেখ নেই। দু হাজার বছর আগের রোমান দলিলপত্রে কোথাও 'নাযারেথ' নামটি নেই। নাযারেথ "....নামটি না পাওয়া যায় যশুয়া ১৯:১০ f . তে, না দেখা যায় যোসেফাসের লেখনীতে (যিনি প্রায় ৪৫টি গ্যালিলিয়ান শহরের নাম লিপিবদ্ধ করেছিলেন)। কিংবা তেষট্টিটি শহরের তালিকা আছে যে তালমুদে[76], সেখানেও এ নামটি নেই"।[77] কোন কোন বিশেষজ্ঞের ধারণা (এবং এটা যে শুধুই একটি ধারণা সেটাও তারা স্বীকার করেছেন), নাযারেথ এবং আধুনিক কালের 'en Nasira' বস্তুতঃ একই শহর। তবে এ ব্যাপারটি নিশ্চিত না। তাহলে ঈসা (ﷺ)'কে 'নাযারীন' বলে অভিহিত করা হয়েছে কেন? বলা মুশকিল, আর এর উত্তর জানাটা তত জরুরীও নয়। তবে, একথা উল্লেখ করা দরকার যে, 'নাযারীন' (Nazarene) শব্দটি গ্রীক 'নাযোরাইওস' (Nazoraios) শব্দের ইংরেজী অনুবাদ। দেখে মনে হয় দু'টো শব্দের উৎপত্তি হিব্রু 'নযরিম' (Nozrim) থেকে যেটা আবার এসেছে 'Nozrei ha-Brit' শব্দ থেকে। কুমরানের অধিবাসীরা এ প্রাচীন হিব্রু নামটি (Nozrei ha-Brit) ব্যবহার করে নিজেদেরকে 'স্রষ্টার সাথে অঙ্গীকার রক্ষাকারী' বলে পরিচয় দিত।[78] যেভাবে আধুনিক 'যার' (Tsar) শব্দটি এসেছে 'কাইযার' (Kaiser) থেকে

---

[76] 'তালমুদ' ইহুদী ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ যাতে ধর্মীয় আইন-কানুন, নৈতিক শিক্ষা, দর্শন, রীতি-নীতি ও ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।

[77] Kraeling, Emil G. Ph.D. 1952. Rand McNally Bible Atlas. Rand McNally & Co. p. 358.

[78] Baigent, Michael and Richard Leigh. 1991. The Dead Sea Scrolls Deception. New York: Summit Books/ Simon & Scuster Inc. p. 174.

এবং 'কাইযার' এসেছে 'সিজার' (Caesar) থেকে। দু' হাজার বছরের দীর্ঘ ব্যবধান শব্দের উচ্চারণে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটায়। 'নাযারীন' প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যাক। বলা হয়েছে,

> "নাযারেথ শহরে যীশুর প্রতিপালন ও জীবনকাল সম্পর্কে যে সমস্ত বর্ণনা প্রচলিত, প্রকৃত সত্য তার বিপরীত। দলিল প্রমাণ (কিংবা যথেষ্ট দলিল প্রমাণের অভাব) এটাই বলে যে, সে সময় নাযারেথ শহরের অস্তিত্বই ছিল না। সত্যি বলতে, সব কিছু দেখে মনে হয় যেন প্রথম দিককার বাইবেলের ভাষ্যকাররা 'নাযোরিয়ান' নামের অচেনা শব্দটির মুখোমুখি হয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গিয়েছিল। খুব সম্ভবতঃ এ শব্দটির সঠিক ব্যাখ্যা উদ্ধার করতে না পেরে তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, যীশুর পরিবার নাযারেথ শহরের বাসিন্দা ছিল। ফলস্বরূপ পরবর্তীতে নাযারেথ নামের একটি শহর মানচিত্রে জন্মলাভ করে"।[79]

প্যালেস্টাইনের এখনকার মানচিত্রে খুঁজে দেখলে নাযারেথ শহরটি দেখা যাবে দক্ষিণ গ্যালিলিতে (উত্তর প্যালেস্টাইন)। সমস্যা হল, বাইবেলের যুগে এ নামের শহরের কোন অস্তিত্ব দেখা যায় না। ঐতিহাসিক তথ্য দেখে মনে হয়, বাইবেলের বর্ণনার সাথে মানিয়ে চলবার জন্য পরে কোন একটি শহরকে "নাযারেথ" নাম দেয়া হয়েছিল, যদিও আগে এ নামের কোন শহর ছিল না। অন্য কথায়, (ইহুদী-খ্রিষ্ট) ধর্মগ্রন্থের ঘাটতি পুরন করার প্রয়োজনে আজকের "নাযারেথ" নামের শহরটির উৎপত্তি হয়েছে। ফলে (কুরআনে) আরো একটি ভুল-সংশোধনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত হল। বাইবেল এমন একটি শহরের নাম উল্লেখ করেছে, ঈসা (ﷺ) এর সময়কালে যার কোন অস্তিত্ব ছিল না। অন্যদিকে কুরআনে এর কোন উল্লেখ নেই। আবারও কুরআনে চমৎকারভাবে অনালোচিত কিন্তু স্পষ্ট একটি ভুল এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, "নাযারেথ" নামটি মুহাম্মদ (ﷺ) এর সময়ের খ্রিষ্টানদের কাছে খুব

---

[79] Baigent, Michael and Richards Leigh. P.174.

আবেদন সৃষ্টি করার কথা, ফলে কুরআনে এর উল্লেখ থাকাটা খুব স্বাভাবিক ছিল। তা সত্ত্বেও কুরআন এ নামটি উচ্চারণ করেনি।

এবার ইরামের প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সময়ে তো বটেই, পরবর্তী চৌদ্দ'শ বছর ধরে অজানা ছিল এমন একটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা, কোন মানুষের পক্ষে অবশ্যই দুঃসাহসী পদক্ষেপ। আরো বেশী দুঃসাহসিক - একটি নয়, বরং পরপর তিন তিনটি এরকম শহরের উল্লেখ। সত্যিই এরকমটা সচরাচর ঘটতে দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে মুহাম্মদ (ﷺ) কে একই সাথে অদূরদর্শী এবং ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমে ভাগ্যবান হতে হবে। তাছাড়া এরকম দুঃসাহসী উল্লেখের পিছনে উদ্দেশ্য কী থাকতে পারে, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়। কারণ এতে লাভজনক কোন কিছু তো নেই-ই, বরং অনেক কিছু হারানোর ভয় থাকে।

অন্যদিকে যদি ধরা হয় যে, স্রষ্টার পক্ষ থেকে এ বর্ণনা অবতীর্ণ হয়েছে. তাহলে আর কোন সমস্যা থাকে না। সৃষ্টিকর্তা তাঁর অনন্ত জ্ঞানে নির্ভুল জানেন যে, চৌদ্দ'শ বছর ধরে অজ্ঞাত থাকা কুরআনের এ সমস্ত তথ্য সেই সব লোকেদের জন্য পরীক্ষা হয়ে দাঁড়াবে যাদের বিশ্বাসের স্তর সীমান্তের কোঁঠায়। সর্বজ্ঞ সৃষ্টিকর্তা এ কথাও জানেন চৌদ্দ'শ বছর পর ইরাম, আদ ও সামুদ জাতির হারানো সভ্যতা ইতিহাসের পাতা ফুঁড়ে উন্মোচিত হবে লোকসমক্ষে। এভাবে তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ধর্মবিশ্বাসকে দৃঢ়তা দান করবে এবং এখনকার মানুষের জন্য হবে এক অলৌকিক নিদর্শন। কুরআনের অন্যতম অলৌকিক বৈশিষ্ট্য হল, এ গ্রন্থ সময়ের গন্ডীকে অতিক্রমকারী, চিরন্তন। সত্যিই! প্রায় চৌদ্দ'শ বছর আগে অবতীর্ণ এ গ্রন্থের অলৌকিকতা আজো মানুষকে বিস্ময়ে হতবাক করে চলেছে।

চতূর্থ প্রমাণ
ওহীর সাথে সমকালীন ঘটনার সম্পর্ক

"Truth would become more popular if it were not always stating ugly facts."

--Henry H. Haskins

"সবসময় অপ্রিয় বাস্তবতা তুলে না ধরলে সত্য আরো বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করত"। -হেনরী এইচ, হাস্কিন

কুরআনের অসংখ্য ওহী যে মুহাম্মদ (ﷺ) এর সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে কুরআনের অন্তর্গত বিষয়বস্তু।

কুরআনে যে সব বিষয় স্থান পেয়েছে তা পড়তে শুরু করলে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। এমনকি এতে যে সব বিষয় স্থান পায়নি তা চিন্তা করলেও চমকৃত হতে হয়। এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমা স্ত্রী খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার পর মুহাম্মদ (ﷺ) অনেকদিন বেঁচে ছিলেন। খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) ছিলেন তাঁর প্রথম ভালবাসা, দীর্ঘ পঁচিশ বছরের সঙ্গীনী, যার সাথে তাঁর যৌবনের সুবর্ণ সময়গুলো অতিবাহিত হয়েছে। মক্কার মুশরিকরা এক পর্যায়ে শাস্তি হিসেবে মুহাম্মদ (ﷺ) ও তাঁর সমর্থকদের সাথে সবরকম সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে অত্যাচার, নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এ কষ্টদায়ক ঘটনার দ্বিতীয় বছরে খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) মৃত্যু বরণ করেন। দীর্ঘ দিনের ভালবাসা, অবলম্বন, স্নেহ-মমতা – সব হারালেন মুহাম্মদ (ﷺ)। প্রথমা স্ত্রী, যাকে তিনি মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, যৌবন ও দাম্পত্য জীবনে যার প্রতি বিশ্বস্ততায় কোন ঘাটতি ছিল না – সব শেষ। সবার মধ্যে প্রথম যিনি তাঁর নবুয়্যতে বিশ্বাস এনেছিলেন, তাঁর আট সন্তানের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবার গর্ভধারিণী মা --তাঁকে ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে গেলেন। স্বামীর ব্যাপারে খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) এতটা নিবেদিতা ছিলেন যে নিজের যাবতীয় ধন-সম্পদসহ আপন গোত্রের আত্মীয়-স্বজনদের পর্যন্ত তাঁর (ﷺ) সাহায্যে উৎসর্গ করেছিলেন। এত কিছুর পর তিনি চলে গেলেন।

গায়কের হারানো প্রেম ধ্বনিত হয় সুরের তন্ত্রীতে, শিল্পী তার অতীত অনুরাগ অমর করে রাখে মার্বেল আর ক্যানভাসে। আলোকচিত্রশিল্পীর এ্যালবাম ছেয়ে থাকে বিগত দিনের উজ্জ্বল স্মৃতিতে। আর কবির হৃদয় নিঙড়ানো শোকাবেগ কলমের আঁচড়ে চিত্রিত হয় কাগজের পটে। অথচ মুহাম্মদ (ﷺ) এর প্রিয়তমা স্ত্রী বিয়োগের শোকগাঁথা কুরআনের কোথাও স্থান পায়নি। কুরআনে একবারও খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নাম পর্যন্ত উচ্চারিত হয়নি। ফেরাউন, নূহ (আলাইহিস সালাম), লুত (আলাইহিস সালাম) এর স্ত্রীদের প্রসঙ্গে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। অথচ খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর কথা নেই। কেন? তিনি কি তবে মুহাম্মদ (ﷺ) এর কাছে প্রিয় ছিলেন না?

মুহাম্মদ (ﷺ) এর পরবর্তী স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর মন্তব্য ছিল যে, তিনি অন্য আর কোন মহিলাকে নিয়ে এতটা ঈর্ষান্বিত ছিলেন না যতটা ছিলেন খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ব্যাপারে। এর কারণ মুহাম্মদ (ﷺ) প্রায়ই ভালবাসা ও শ্রদ্ধাভরে খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর কথা স্মরণ করতেন। মুহাম্মদ (ﷺ) এর নিজের উক্তি,

> "যখন আর কেউ আমার উপর বিশ্বাস আনেনি তখন সে (খাদিজা) বিশ্বাস এনেছিল। সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল সেই সময়, যখন সবাই আমাকে প্রত্যাখ্যান করছিল। সঙ্গ-সাহচর্য, ধন-সম্পদ দিয়ে সে আমাকে সহযোগিতা আর উৎসাহ যুগিয়ে গেছে, যখন সাহায্যের জন্য হাত বাড়ানোর কেউ ছিল না। শুধু তাঁর কাছ থেকেই আমি সন্তান লাভ করেছি।"[৪০]

যে নারী মুহাম্মদ (ﷺ) এর জীবন ও হৃদয় জুড়ে ছিল তাঁর কথা কুরআন একবারও উচ্চারণ করেনি। এটাই শেষ নয়, জন্মের আগে হারানো জন্মদাতা পিতা, শৈশবে হারানো স্নেহময়ী মাতা, প্রিয় পুত্র-কন্যাদের কারো প্রসঙ্গেই কুরআনে কোন বর্ণনা নেই। তিলমাত্র আভাস পর্যন্ত নয়। অনেক পশ্চিমা সমালোচকের দাবী হল, কুরআন মুহাম্মদ (ﷺ) এর রচনা, এটা কোন আসমানী

---

৪০ মুসনাদে আহমদ

বাণী নয়। এরকম উদ্ভট দাবী যে ভিত্তিহীন তা প্রতীয়মান হয় যখন দেখি, কুরআনে একমাত্র যে নারীর নাম উচ্চারিত হয়েছে তিনি হলেন ঈসা (ﷺ) এর জননী, বনি ইসরাঈল বংশীয় - মরিয়ম (ﷺ)। মরিয়ম (ﷺ) এর নামে কুরআনে একটি সম্পূর্ণ সুরাহ অবতীর্ণ হয়েছে। সমালোচকদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন হল, মুহাম্মদ (ﷺ) ভণ্ড-নবী এবং কুরআন তাঁর সৃজনশীল কল্পনার ফসল হলে তাঁর জীবনের সবচেয়ে কাছের মানুষগুলো কেমন করে কুরআনের পাতা থেকে বাদ পড়ে গেল? বরং আমরা দেখি একজন ইসরাঈলী নবীর মাতা তাদের সবার চেয়ে বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। যুক্তিবাদী মন কোনভাবেই পশ্চিমা সমালোচকদের অমূলক দাবী মেনে নিতে পারে না।

মুহাম্মদ (ﷺ) নিজ জীবদ্দশায় চার পুত্রের প্রত্যেকের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছেন। চার কন্যার মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবাই তাঁর আগে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। প্রাণপ্রিয় চাচা (رضي الله عنه)[৪১] জিহাদে শহীদ হয়েছিলেন, যার মৃতদেহ শত্রুদের হাতে নির্মমভাবে ব্যবচ্ছেদকৃত হয়েছিল। মুহাম্মদ (ﷺ) এর সহচরদের নানাভাবে অপমানিত, নির্যাতিত, প্রহৃত এমনকি নিহত হবার ঘটনা অহরহ ঘটেছে। একবার তো তিনি (ﷺ) নিজে এমনভাবে পাথরের আঘাতে আহত হয়েছিলেন যে জুতাজোড়া রক্তে ভিজে গিয়েছিল। আরেকবার সালাতে সিজদারত অবস্থায় মৃত উটের দূর্গন্ধময় পচা-গলা নাড়ি-ভূঁড়ি তাঁর পিঠের উপর ফেলা হয়েছিল। প্রিয় কন্যা (ফাতিমা رضي الله عنها) এসে এ অবস্থা থেকে মুক্ত করে দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ আবর্জনার ভারে তিনি মাটিতে নুয়ে ছিলেন। দূর্গন্ধ ছড়াবার জন্য যেখানে জীবন্ত উটই যথেষ্ট, সেখানে তীব্র খরতাপে পচে-গলে যাওয়া উটের নাড়ি- ভূঁড়ি কতটা অসহনীয় হতে পারে তা অনুমান করা কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির জন্যও কষ্টকর না। শুধু কি তা-ই? এর দুর্গন্ধময় রস যখন ফোঁটায় ফোঁটায় বাহু, গাল, কানের পিছন দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে! ক্যালেন্ডারের মাত্র হাজার দু' পৃষ্ঠা আগে ঘটে যাওয়া এ ঘটনার স্মৃতি এখনও মলিন হয়নি। কথা হচ্ছে, নিশ্চয়ই এ ধরণের ঘটনা প্রায়শই মুহাম্মদ (ﷺ) এর মনকে ক্ষত-বিক্ষত করত, স্মৃতিকে পীড়া দিত। অথচ কুরআনের কোথাও তো এর কোন বর্ণনা স্থান পেতে দেখা যায় না!

---

৪১ হামযা ইবন আব্দুল মুত্তালিব (رضي الله عنه) যিনি বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে পাওয়া গেছে যে, মুহাম্মদ (ﷺ) মুখগহ্বরের পরিচ্ছন্নতা এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের দুর্গন্ধের ব্যাপারে ভীষণ রকম সংবেদনশীল ছিলেন। দৈনিক কম করে হলেও (প্রত্যেক সালাতের আগে) পাঁচবার তিনি দাঁত মিসওয়াক করতেন। তাছাড়া সাহাবাদের উপদেশ দিতেন জিহ্বা পরিষ্কার করার জন্য (বিজ্ঞানীরা দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাসের কারণ হিসেবে জিহ্বাকে চিহ্নিত করারও ১৩০০ বছর আগে)। এ হল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে তাঁর সচেতনতার উদাহরণ। অথচ কুরআনে কি এ ব্যাপারে কোন উল্লেখ আছে? নেই।

মুহাম্মদ (ﷺ) শিখিয়ে গেছেন যে, প্রত্যেক রোগের জন্য আছে প্রতিষেধক। নির্ভরযোগ্য সূত্র বলে যে, তিনি মনে-প্রাণে এ কথা বিশ্বাস করতেন। তাহলে কুরআনে কেন রোগের প্রতিকার সম্পর্কে এরকম কোন বর্ণনা দেখা যায় না? চিকিৎসা সম্পর্কিত একমাত্র যে বস্তুটির উল্লেখ পাওয়া যায় কুরআনে আর তা হল-মধু। বলা হয়েছে,

"ওর (মৌমাছির) উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়, যাতে মানুষের জন্যে রয়েছে রোগমুক্তি"।
(ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, নাহ্‌ল:৬৯)

কুরআনে উল্লেখিত এ উদ্ধৃতির বিরুদ্ধে কেউ তর্ক করে না, বিশেষ করে লজেন্স, গলার ঠান্ডা ও ফ্লু-জনিত ওষুধ কোম্পানীগুলো তো বটেই।

কুরআনের যে বিষয়টি আশ্চর্যজনক তা হল, এর বর্ণনায় মুহাম্মদ (ﷺ) এর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার কোন প্রতিফলন নেই। উপরের ঘটনাগুলোতে তিনি বেশ প্রভাবিত হয়েছিলেন, সে কথা অনুমেয়। অথচ কুরআনে এ বিষয়গুলোর কোন উল্লেখ নেই। কেউ যদি মুহাম্মদ (ﷺ) এর জীবনের প্রবাহমান ঘটনাবলী ও কুরআনের বর্ণনা পাশাপাশি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে তাহলে খুব সহজে চোখে পড়বে যে, তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা কুরআনে প্রতিধ্বনিত হয়নি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে এর বিপরীত ঘটতে দেখা গেছে। কুরআনে তাঁর (ﷺ) কিছু কিছু ভুল শুধরে দিতে দেখা গেছে।

কুরআনে এমন কিছু সমাধান নিয়ে আলাপ করা হয়েছে যা মুহাম্মদ (ﷺ) এবং তাঁর সাহাবাদের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। কিংবা সমসাময়িক কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোন উপদেশ - এরকম বর্ণনা কুরআনে অগণিত। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, কুরআন যেভাবে অন্য মুসলিমদের ভুল-ত্রুটি নিয়ে সতর্ক করেছে ঠিক একইভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (ﷺ) এর ভুলও শুধরে দিয়েছে। যেমন সুরাহ আবাসা'য়, মুহাম্মদ (ﷺ)'কে একজন অন্ধ মুসলিমের দিকে ভ্রূকুটি করার জন্য আল্লাহ (ﷻ) মৃদু ভৎর্সনা করেছেন। কুরায়েশদের সাথে মুহাম্মদ (ﷺ) গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ব্যস্ত, এমন সময় একজন অন্ধ লোক তাঁর কাছে হিদায়াত লাভের জন্য এসে সেই আলোচনায় বিঘ্ন ঘটিয়েছিলেন অনিচ্ছাকৃতভাবে। মুহাম্মদ (ﷺ) তখন মক্কার সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। সেটা এমন এক সময়ের কথা যখন নব্য-মুসলিমরা এ সমস্ত নেতাদের হাতে অকথ্য নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। যাহোক এরপর তাঁর প্রতি উপদেশস্বরূপ ওহী অবতীর্ণ হল যে, ধর্মীয় শিক্ষা লাভে আন্তরিক সাধারণ এক অন্ধ ব্যক্তি মুহাম্মদ (ﷺ) এর মনোযোগ লাভের অনেক বেশী যোগ্য ঐ সমস্ত ধনী ও প্রভাবশালী অবিশ্বাসীদের চেয়ে যাদের ইসলামের ব্যাপারে কোন আগ্রহই নেই।

আরেকবার মুহাম্মদ (ﷺ) নিজের জন্য মধুকে নিষিদ্ধ ঘোষণা দেবার জন্য তিরস্কৃত হয়েছিলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, মুখে দূর্গন্ধ তৈরীর পিছনে মধু দায়ী (*"হে নবী (ﷺ)! আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য যা হালাল করেছেন তুমি তা হারাম করছো কেন?" – ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, সুরাহ তাহ্‌রীম:১*)

এছাড়া তিনি পালিত পুত্র[৪২] কে বৈবাহিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখবার উপদেশ দিয়েছিলেন যখন বিবাহ-বিচ্ছেদ তাঁর জন্য উত্তম ছিল (সুরাহ আহযাব:৩৭)। মুনাফিকদের (দুর্দমনীয় বিদ্রোহের কারণে আল্লাহর করুণা থেকে বঞ্চিত যারা) জন্য মুহাম্মদ (ﷺ) এর ক্ষমা প্রার্থনা এরকম আরেকটি ঘটনা (সুরাহ তওবা:৮০)।

যায়নাব (রাঃ) এর সাথে পালিত পুত্র যায়েদ (রাঃ) এর অসুখী দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে মুহাম্মদ (ﷺ) এর ভুল উপদেশ শুধরে দিতে কুরআনের আয়াত

---

৪২ যায়েদ ইবন হারিস (রাঃ)

যখন অবতীর্ণ হল, তখন সেটা মুহাম্মদ (ﷺ) এর জন্য ভীষণ বিহ্বলতার কারণ হয়েছিল। আয়েশা (রাঃ) পরে মন্তব্য করেছিলেন, "কুরআনের কোন আয়াত যদি মুহাম্মদ (ﷺ) লুকাতে পারতেন তবে তিনি এ আয়াতটি (সুরাহ আহযাব:৩৭ আয়াত) লুকাতেন"[83]।

আরেকবার কুরআনে মুহাম্মদ (ﷺ)'কে হৃদয়ের কাঠিন্য শুধরে দেয়া হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রিয় চাচা হামযা (রাঃ)'র নির্মমভাবে ব্যবচ্ছেদ করা মৃতদেহ দেখে তিনি (ﷺ) আবেগতাড়িত হয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে, প্রতিপক্ষের সত্তর জন শত্রুর উপর একইভাবে প্রতিশোধ নেবেন। সুরাহ নাহ্‌ল এর ১২৬ থেকে ১২৮ নং আয়াতের মাধ্যমে তাঁকে উপদেশ দেয়া হল সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণের, এর বেশী নয়। সেই সাথে উপদেশ দেয়া হল ধৈর্যের ও সংযমের। এর বেশ কয়েক বছর পর মুসলিমরা যখন মক্কা জয় করল তখন যেই মহিলার নির্দেশে হামযাহ (রাঃ) নিহত হয়েছিলেন তিনি নিজেকে মুহাম্মদ (ﷺ) এর সামনে উপস্থাপন

---

[83] সহীহ আল-বুখারী।

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার যে ব্যাপারটি নিয়ে নিষ্ঠাবান সুন্নী মুসলিমরা অত্যন্ত সংবেদনশীল। সেটি হল, যেহেতু মুহাম্মদ (ﷺ) সিদ্ধান্ত নেবার বেলায় মানবীয় ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে ছিলেন না, কোন কোন মুসলিম এর ভুল ব্যাখ্যা করে থাকে এবং তাদের পছন্দনীয় নয় মুহাম্মদ (ﷺ) এর এমন সমস্ত কথা ও কাজকে উপেক্ষা করার ধৃষ্টতা দেখায়। এ ধরণের লোকেরা সাধারণত সুন্নাহ থেকে তাদের পছন্দসই বিষয়গুলো গ্রহণ করে আর পছন্দমাফিক না হলে সেগুলো ছুড়ে ফেলে দেয়। তাদের অজুহাত হচ্ছে, ঐ নির্দিষ্ট বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (ﷺ) এর মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত ত্রুটিপূর্ণ ছিল।

ইসলামী আকীদা (বিশ্বাস)'র একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল, এটা বিশ্বাস করা যে – মুহাম্মদ (ﷺ) কোন রকম মানবীয় ভুল-ত্রুটি করে থাকলেও তাঁর জীবদ্দশাতেই সেগুলো সংশোধন করে দেয়া হয়েছিল। কেননা, বার্তাবাহকের মাধ্যমে কোন রকম ভুল বার্তা পৌছানোকে মহান আল্লাহ প্রশ্রয় দিবেন না। সুতরাং, সামান্য ভুল-ত্রুটি মুহাম্মদ (ﷺ) এর মানবীয় দিকটি তুলে ধরলেও, এ ভুলগুলোর দ্রুত সংশোধন স্রষ্টার ত্রুটিহীন, নিখুঁত গুণটি প্রকাশ করে। সেই সাথে ওহী ও বার্তাবাহকের জীবনাদর্শের মাধ্যমে তিনি যে ত্রুটিহীন, নির্ভুল বার্তা মানবজাতির জন্য পাঠিয়েছেন, সেটাও প্রকাশ করে। ইসলামে ঈমানের (বিশ্বাসের) একটি স্তম্ভ অনুযায়ী বিশ্বাস করতে হবে যে, মুহাম্মদ (ﷺ) এর যে কোন ভুল-ত্রুটি তাঁর জীবদ্দশাতেই শুধরে দেয়া হয়েছে, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে কোন রকম ভুল বার্তা না পৌছায়। এর বিপরীতে অন্য কোন দাবী করার অর্থ হল, এরকম একটি প্রস্তাবনা তোলা যে – শেষ নবীর মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা যে আদর্শ পাঠিয়েছেন তা অপরিপূর্ণ ও অপূর্ণাঙ্গ। সুন্নী মুসলিমদের মতে এ ধরণের ধারণা মারাত্মক বিশ্বাসজনিত ত্রুটি যা ব্যক্তির ধর্মবোধকে হুমকির দিকে ঠেলে দেয়।

করলেন। ইনি হামযাহ (ﷺ)'কে হত্যার নির্দেশ দিয়েই শুধু ক্ষান্ত হননি, তাঁর মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে কলিজা বের করে চিবিয়েছিলেন পর্যন্ত। তাসত্ত্বেও মুহাম্মদ (ﷺ) তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

অন্য এক ঘটনায় মুহাম্মদ (ﷺ)'কে শুধরানো হয়েছে কারণ তিনি (ﷺ) একদল যুদ্ধবন্দীর প্রতি কোমলতার বশবর্তী হয়ে মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এ সমস্ত যুদ্ধবন্দীরা স্পষ্টতঃই আল্লাহর (ﷻ) শত্রু ছিল। শুধুমাত্র ঈমানের সাক্ষ্য দেবার অভিযোগে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাদের হত্যা করছিল (সুরাহ আন'ফাল;৬৭)।

এভাবে বিভিন্ন সময়ে কখনো ধৈর্য ও সংযম অবলম্বনের আবার কখনো বা কঠোর ও বলিষ্ঠ হবার উপদেশ অবতীর্ণ হয়েছে। এ অধ্যায়ে যে ব্যাপারটা তুলে ধরা মূল উদ্দেশ্য তা হল, মুহাম্মদ (ﷺ) কখনো কখনো মানবিক কারণে সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেছেন। কিন্তু ভণ্ড নবীর ক্ষেত্রে যেমন আশা করা হয় যে, সে তার ভুল-ত্রুটিগুলো ঢেকে রাখবে – মুহাম্মদ (ﷺ) এর ক্ষেত্রে এর বিপরীত ঘটতে দেখা গেছে। কুরআন মুহাম্মদ (ﷺ) এর ভুলগুলো শুধরে দিয়ে উপদেশগুলোকে অমর করে রেখেছে। স্রষ্টার সত্যিকারের রসূলের বেলায় মানুষ ঠিক যেমনটা আশা করে ঠিক সেইভাবে - মুহাম্মদ (ﷺ) এর ভুল-ত্রুটি সংশোধন করেছেন সেই মহান সত্তা যাঁর প্রতিনিধিত্ব মুহাম্মদ (ﷺ) করেছেন, যাতে এ সমস্ত ঘটনা মানুষের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

ভণ্ড নবীর ক্ষেত্রে এরকম সতর্কবাণী ও সংশোধনমূলক উপদেশের মাধ্যমে সমর্থকদের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনের পন্থা সত্যি চিন্তা করা যায় না। অন্যদিকে সত্যিকারের নবী বলেই এরকম উপদেশ মুহাম্মদ (ﷺ) এর মানবিক দিকটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে তাঁর উপর দেবত্ব আরোপ করার সম্ভাবনা ধুলিস্মাৎ হয়ে যায়। এরকম দেবত্ব আরোপের কারণেই অতীতের অনেক আসমানী ধর্ম বিকৃত হয়ে গেছে। মুহাম্মদ (ﷺ) কী ধরণের ভণ্ড নবী ছিলেন যিনি নিজের ভুল সিদ্ধান্তের বিবরণ পেশ করে রীতিবর্জিত অদ্ভুত দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন? নাকি তিনি ছিলেন সত্যিকারের নবী যার ভুল-ত্রুটি অপরিহার্যভাবে সংশোধন করা

হয়েছে যাতে বিশ্বাসীরা তাঁর এ সমস্ত মানবিক ভুলকে স্রষ্টার অনুমোদিত ভেবে অবলীলায় মেনে না নেয়।

একজন ব্যক্তি এমন একটি আসমানী গ্রন্থ প্রচার করেছেন যার প্রতিটি অক্ষর স্রষ্টার কাছ থেকে এসেছে বলে দাবী করা হয়। কোন মানুষের জন্য ক্ষণিকের জন্যও চিন্তা করা কঠিন যে, একজন ভণ্ড নবী কণ্ঠ তুলে দাবী করছেন: "এ হল স্রষ্টার অবতীর্ণ গ্রন্থ। স্রষ্টা নিখুঁত এবং সমস্ত ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে। তাই এ গ্রন্থের প্রতিটি শব্দ, বাক্য, অধ্যায় বিশ্বাস করে নাও। ওহ্! আরেকটি কথা...এ গ্রন্থ বলছে যে, আমি নবী হলেও মানবীয় ভুল করে থাকি। আমারও তওবা করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত"। সত্যি এরকম চিত্র অবিশ্বাস্যই বটে! ভণ্ড সংস্কারকরা সাধারণত হয় মিথ্যাবাদী কিংবা প্রতারিত, আর না হয় বিভ্রান্ত হয়ে থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই তারা চেষ্টা চালায় মানুষের আস্থা অর্জনের। কুরআনের রচয়িতা অবশ্যই এ বর্ণনার মধ্যে পড়ে না। যদি কোন মানুষ না হয়ে থাকে তাহলে কুরআনের রচয়িতা আর কে হতে পারে?

পঞ্চম প্রমাণ
ওহীতে অনাগত কালের চিত্র

"The future? Like unwritten books and unborn children, you don't talk about it."
--Dietrich Fischer-Dieskau, *Daily Telegraph* (London, 14 Oct. 1988)

"ভবিষ্যতের কথা? অলিখিত গ্রন্থ আর অনাগত শিশুর মত এ বিষয় নিয়ে কোন কথা বলো না"।
--Dietrich Fischer-Dieskau, *Daily Telegraph* (London, 14 Oct. 1988)

অনাগত বিষয় নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার অর্থই হচ্ছে ভবিষ্যদ্বাণী না মিলবার ঝুঁকি কাঁধে নেয়া। আলবার্ট আইনস্টাইনের উক্তি হল, "আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে কখনো চিন্তিত নই। শীঘ্রই ওটা নিজে কাছে চলে আসবে"। ভবিষ্যতের উপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হচ্ছে শুধুমাত্র সেই সত্তার যাঁর রাজত্ব সমস্ত কিছুর সীমা অতিক্রমকারী। এছাড়া অন্য সবার ভবিষ্যদ্বাণীর ত্রুটি-বিচ্যুতি সহজে অনাবৃত হয়ে ওঠে যখন সত্যের আলো ঐতিহাসিক বাস্তবতার দিগন্ত উন্মোচন করে।

বাইবেলের নানা ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বাইবেলকে যারা "স্রষ্টার অমিয় বাণী" বলে বিশ্বাস করে,তাদের মনে (বাইবেলের) এ সমস্ত ভাবিষ্যদ্বাণীর বৈধতা নিয়ে কোন প্রশ্ন না জাগাই স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যা হল, সৃষ্টিকর্তার অনুমোদন ছাড়া মানব কল্পনার ফসল হিসেবে যা কিছু এতে যোগ করা হয়েছে তা নিয়ে। যে জ্ঞানের উৎস মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান আর ত্রুটিপূর্ণ হাতের রচনা, তার যথার্থতা কতখানি তা যে একদিন প্রকাশিত হবেই তা বলা বাহুল্য।

কুরআনের বহু আয়াতেও ভবিষ্যতের অনেক ঘটনার পূর্বাভাস উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলিমরা দাবী করে যে, কুরআনে ঐতিহাসিক কিংবা বৈজ্ঞানিক এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী নেই যা ভুল সাব্যস্ত করা যায়। অথচ বাইবেলের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেনি। কুরআনের আসমানী উৎসকে মিথ্যা প্রমাণের প্রয়াসে যারা নিবেদিত, তারা প্রায় ১৪০০ বছর ধরে বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীর ত্রুটি খুঁজে বের করার সবরকম চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু তাদের পরিশ্রম ও উদ্দেশ্য কোনটাই সার্থক হয়নি।

লক্ষ্য করার মত ব্যাপার হল, ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাকারীরা সাধারণতঃ তাদের সমালোচনার লক্ষ্য বানায় বিভিন্ন আবেগজনিত বিষয়গুলোকে। নিয়ন্ত্রণহীন পশ্চিমা সমাজের দৃষ্টিতে ইসলামের বিভিন্ন রক্ষণশীল নিয়ম-নীতি অগ্রহণযোগ্য ও অবান্তর বলে মনে হয়। অথচ আসমানী প্রমাণ খণ্ডন করার যে চ্যালেঞ্জ কুরআনে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে তার যথাযোগ্য উত্তর দিতে তারা ঠিকই চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এ অধ্যায়ে সে রকম কিছু প্রমাণ নিয়ে আলাপ করা হয়েছে। এসব প্রমাণ বহু সমালোচকের সমালোচনাকে নিস্ফল করে দিয়েছে, আর বিষয়টি কোনভাবেই উপেক্ষা করার মত নয়।

ইসলামের সূচনালগ্নে মক্কার অল্প সংখ্যক মুসলিম যখন নানাভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ পৌত্তলিক কাফিরদের হাতে নির্যাতিত হচ্ছিল তখন কুরআনে এমন একটি আয়াত অবতীর্ণ হল যাতে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে যে, মুসলিমরা শীঘ্রই পৌত্তলিকদের সাথে যুদ্ধে জয়লাভ করতে যাচ্ছে।

> *"তোমাদের মধ্যেকার কাফিরগণ কি তাদের (পূর্বের কাফিরগণ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? না কি তোমাদের অব্যাহতির কোন সনদ রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবে? এরা কি বলে: আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল? এ দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে"।* (কামার:৪৩-৪৫)

সে সময় সংখ্যার দিক দিয়ে অপর্যাপ্ত মুসলিমরা শক্তি-ক্ষমতাতেও ছিল দুর্বল। পৌত্তলিকদের হাতে প্রহৃত, নিহত ও লাঞ্ছিত হবার ঘটনা হরহামেশা ঘটত। মদীনায় হিজরতের প্রথমদিকেও মুসলিমদের সংখ্যা ও শক্তিতে খুব একটা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেনি। ফলে মক্কার সবচেয়ে প্রভাবশালী কুরায়েশ গোত্র বিনা বাধায় মুসলিমদের জায়গা-জমি, ধন-সম্পত্তি জোরদখল করে নিয়েছিল, এমনকি একজনের স্ত্রীকে পর্যন্ত আটক করে রেখেছিল। গোত্রীয় আশ্রয় ও নিরাপত্তা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত অসহায় মুসলিমদের তারা নির্বিচারে নির্যাতন ও হত্যা করে চলেছিল। লড়াই করার মত যথেষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না বলে মুসলিমরা মুখ বুঁজে প্রতাপশালী কুরায়েশদের সব রকম নির্যাতন সহ্য করে গেছে। তাছাড়া অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য আসমানী অনুমতিও সে সময় মুসলিমরা পায়নি। অন্যদিকে যে সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক সম্পর্কের বন্ধনকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হত সেখানে নিজ গোত্রের, নিজ আত্মীয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা ছিল চূড়ান্ত অবিবেচক সিদ্ধান্ত। এরকম অস্থিতিশীল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যখন কুরআনের আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হল, তখন সঙ্গত কারণেই উমর ইব্ন আল-খাত্তাব (রাঃ) (ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা) বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন এ বলে[৪৪], "আমরা কোন্ দলকে পরাজিত করব"!

পরবর্তীতে মুসলিমদেরকে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার আসমানী অনুমতি দেয়া হল। ততদিনে মুসলিমরা সংখ্যায় ও শক্তিতে ছিল যথেষ্ট প্রবল। নীচের আয়াতটি মদীনায় হিজরতের কিছু আগে মক্কায় অবতরণ করেছিল,

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান

---

৪৪ Sa'eid Hawwa. 1990. Ar-Rasool, Salallahu Alayhi Wa Salam. Second Edition. Cairo: Dar As-Salaam Publishing. pp. 282-3.

করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্যে মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন; তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন শরীক করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী"। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম,নুর:৫৫)

মুসলিমদের তুলনায় সংখ্যায় চার গুণ বেশী হওয়া সত্ত্বেও সুরাহ কামারের ৪৩ থেকে ৪৫ নং আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণীকে বাস্তব প্রমাণিত করে অবিশ্বাসী কুরায়েশরা বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে "পরাজিত" হয়ে "পৃষ্ঠ প্রদর্শন" করেছিল। এর কয়েক বছর পর, ৮ম হিজরীতে শান্তিপূর্ণভাবে মুসলিমদের মক্কা বিজয়ের ঘটনায় সুরাহ নুরের ৫৫ নং আয়াতের বাস্তবায়ন ঘটে। যে ভয়-ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে তারা বাস করছিল তার অবসান ঘটে নিরাপত্তা আর শান্তি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। প্রতিপত্তি ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে তারা একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হল। মক্কায় শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার এ ঘটনা কুরআনের অন্য আরেকটি আয়াতের বাস্তবায়ন,

"...আমি কি তাদেরকে এক নিরাপদ হারামে (মক্কা) প্রতিষ্ঠিত করিনি! যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিয্ক (জীবনোপকরণ) স্বরূপ....?" (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, কাসাস: ৫৭)

এবং,

"তারা কি দেখেনা যে, আমি হারামকে (মক্কা) নিরাপদ স্থান করেছি অথচ এর চতুষ্পার্শ্বে যে সব মানুষ আছে তাদের উপর হামলা করা হয়...?"

(ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, আনকাবুত: ৬৭)

সত্যি ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, আসমানী ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মক্কা আজো "নিরাপদ নগরী"। অনুর্বর মরুপ্রান্তর ও রুক্ষ জলবায়ু সত্ত্বেও মক্কায় খাদ্য ও ফলের অফুরন্ত সম্ভার যেন স্রষ্টার সেই প্রতিশ্রুতির সাক্ষী, *"...সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিয্ক স্বরূপ..."*। এ আয়াতে ফল ও রিয্কের (জীবনোপকরণ) উল্লেখ দেখে অদ্ভূত মনে হতে পারে। কিন্তু নিস্ফলা ধূ-ধূ মরুভূমি, অপ্রতিকূল আবহাওয়া আর ভৌগোলিক অবস্থান সত্ত্বেও পবিত্র নগরী মক্কা সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে খাদ্যের প্রাচূর্য উপভোগ করে আসছে।

মুসলিমরা মক্কায় অবস্থানকালে মক্কা বিজয় প্রসঙ্গে আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল,

> *"যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের কৃতজ্ঞতাবাচক পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং তাঁর সমীপে ক্ষমা প্রার্থণা করো, তিনি তো সর্বাপেক্ষা অধিক তওবা গ্রহণকারী"। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, নাস্‌র: ১-৩)*

এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ "দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ" করবে, আয়াতে এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। সত্যি সত্যি মক্কা বিজিত হবার পর এর অধিকাংশ অধিবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এখানেই শেষ না, মক্কাবাসীদের এ উদাহরণ অনুসরণ করে আরব উপদ্বীপের আশেপাশের এলাকা থেকে অসংখ্য প্রতিনিধি দল এসে তাদের গোত্র ও সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বায়াত (আনুগত্যের অঙ্গীকার) গ্রহণ করেছিল। এত বিপুল সংখ্যক লোকের স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরের এমন ঘটনা অন্য কোন ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায় না। অথচ বিরল এ ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী কুরআনে আগেই করা হয়েছে।

> *"তুমি কি মুনাফিকদেরকে দেখোনি? তারা কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের ঐ সব সঙ্গীকে বলে: তোমরা*

যদি বহিষ্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশত্যাগী হবো এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো কথা মানবো না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করবো। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। বস্তুতঃ তারা বহিষ্কৃত হলে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশ ত্যাগ করবে না এবং তারা আক্রান্ত হলে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না"। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, হাশ্‌র:১১-১২)

মক্কা বিজয়ের আগে মুসলিমরা একদিকে অবিশ্বাসীদের (কাফির) শত্রুতা ও অন্যদিকে ছদ্মবেশী মুসলিম বিশ্বাসঘাতকদের (মুনাফিক) দ্বন্দ্বে পড়ে বিভিন্ন রকম পরীক্ষা ও বিপর্যয়ের সন্মুখীন হয়েছিল। এরকম পরিস্থিতিতে, মদীনায় বসবাসকারী 'বনু নাযির'নামের ইহুদী গোত্রটি মুসলিমদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছিল বলে দশদিনের মধ্যে তাদেরকে মদীনা ত্যাগ করার আদেশ দেয়া হল। মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই বনু নাযির গোত্রকে ২০০০ সৈন্যবাহিনী দিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে ব'লে গোপনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আর ইহুদীদের যদি সত্যি সত্যি মদীনা ছেড়ে চলে যেতে হয় তাহলে মুনাফিকরাও তাদের সঙ্গী হবে বলে কথা দিয়েছিল। পরবর্তী কয়েকটি দিন ছিল সেসব মুসলিমের জন্য উত্তেজনাকর যারা উল্লেখিত আয়াতে (হাশ্‌র:১১-১২) সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিল।

দশদিনের চূড়ান্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে বনু নাযির গোত্রকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হল। সেই সাথে দূর হল মুসলিমদের আশংকা। কারণ কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সত্যি সত্যি মুনাফিকরা ইহুদীদের সাহায্যে এগিয়ে তো এলোইনা, মুসলিমদের প্রতিরোধ করতে তাদের সঙ্গীও হলোনা। এটা এমন এক সময়ের কথা যখন মুসলিমরা জনবলে দুর্বল ছিল। সুতরাং এরকম অপ্রত্যাশিত সহজ বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী যদি (স্রষ্টার পক্ষ থেকে না হয়ে) মানুষের পক্ষ থেকে হত তবে তা মূর্খতা না হলেও নিশ্চিতভাবে হত অসম্ভব আশাবাদীতার নামান্তর।

এরকম আরেকটি সাহসী ভবিষ্যদ্বাণী,

"যেসব আরব মরুবাসী গৃহে রয়ে গিয়েছিল তাদেরকে বল: তোমরা আহূত হবে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পন করে"। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, ফাত্হ:১৬)

আজকে একজন নব্যমুসলিমকে যদি প্রবল শক্তিশালী এক বিপক্ষ দলের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান করা হয় তবে সে এ পরিস্থিতিতে নিজেকে কল্পনা করে নিজ অনুভূতি অনুমান করে নিতে পারে। একজন সাধারণ ধর্মান্তরিত ব্যক্তি যেখানে আত্মশুদ্ধি ও ঈমান দৃঢ় করার সংগ্রামে লিপ্ত তখন এরকম কঠোর ভবিষ্যদ্বাণী তার মত আরো অনেকের জন্য নিরুৎসাহজনক মনে হবার কথা।

এ ধরণের বাণী অদৃষ্টের নির্মাতা স্রষ্টার পক্ষ থেকে না হয়ে মানুষের পক্ষ থেকে আগমন করেছে - এরকম মনে করা অবাস্তব। নিয়তি নির্ধারণকারী স্রষ্টার জন্য উল্লেখিত এ সমস্যা বিবেচনায় আনার প্রয়োজন পড়ে না। এ ভবিষ্যদ্বাণী মুহাম্মদ (ﷺ) এর মত একজন মানুষের পক্ষ থেকে এসেছে, এরকম ধারণা অস্বাভাবিক।

যাহোক মুসলিমদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে এ সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর গভীর প্রভাব ছিল। বিশেষ করে সেই সময়, যখন মুসায়লামা 'আল-কায্যাব' (মিথ্যাবাদী) নিজেকে নবী বলে দাবী করেছিল। এক পর্যায়ে ভণ্ড নবী মুসায়লামার অনুসারী এবং বিশ্বাসী মুসলিমদের মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। চূড়ান্ত বিরোধে তার অনুসারীদের অধিকাংশ মুসলিমদের হাতে নিহত, পরাজিত অথবা মিথ্যা দাবী প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী আরো বেশী বিস্ময়কর প্রমাণিত হয় যখন তা বাস্তবায়িত হতে দেখা যায় মুহাম্মদ (ﷺ) এর মৃত্যুর পর, তাঁর জীবদ্দশায় নয়। তা না হলে তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হত যে তিনি নিজস্ব ভবিষ্যদ্বাণীর সমর্থনে ঘটনাপ্রবাহ সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করেছেন।

কুরআনের সবচেয়ে চমকপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর মধ্যে একটি আমরা দেখতে পাই কুরআনের ১১১ নং সুরাহ "লাহাব"[85] এ। এ সুরাহ'য় বলা হয়েছে, মুহাম্মদ (ﷺ) এর চাচা আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উভয়ই জাহান্নামী। কুরআনের এ দন্ডাজ্ঞা বাস্তবায়িত হয়েছিল কিনা তা যাচাই করে দেখবার বিষয় নয়। কেননা হতভাগ্য এ দম্পতির শেষ পরিণাম প্রত্যক্ষ করার মত সাক্ষী নিশ্চিতভাবেই নেই। ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস হল যে, কেউ যখন ইসলামে প্রবেশ করে তখন তার অতীতের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়। মৃত্যুর পর একজন খাঁটি মুসলিমের আবাস হবে জান্নাত। কোন মুসলিম তওবা (অনুশোচনা) না করে পাপের বোঝাসহ মৃত্যু বরণ করলে তার বিচারের ভার আল্লাহ তাআলার উপর। তিনি চাইলে তাকে সাময়িকভাবে ন্যায়সঙ্গত শাস্তি দিতে পারেন অথবা নিজ প্রজ্ঞা ও করুণায় ক্ষমাও করে দিতে পারেন। অর্থাৎ সত্যিকারের মুসলিম বিপুল পাপের বোঝা সত্ত্বেও জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না,একদিন অবশ্যই সে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের এ প্রতিশ্রুতি কি জন্যে? মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে, জাহান্নামে সাময়িক অবস্থান তার পাপ ও সীমালঙ্ঘনের প্রাপ্য শাস্তি হলেও সে ঈমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভটিকে স্বীকার করে নিয়েছে - স্রষ্টার প্রথম ও শেষ আদেশ[86] যার অনুপস্থিতিতে সমস্ত ভাল কাজ নিস্ফল হয়ে যায়। পাপী হলেও সেই মুসলিম আল্লাহর (ﷻ) উপর সেইভাবে ঈমান এনেছে, যেভাবে আল্লাহ (ﷻ) আদেশ করেছেন। সৃষ্টিকর্তার প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল, যারা তাঁর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করবে

---

[85] এ সুরাহর ভাবার্থ – "ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন উপকারে আসেনি। অচিরেই সে লেলিহান শিখাময় জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে। এবং তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে শক্ত পাকানো রশি (খেজুরের আঁশ দিয়ে বানানো) রয়েছে"। - (অনুবাদক)

[86] মহান আল্লাহর (ﷻ) সত্তা, গুণাবলী ও ইবাদতের একত্ববাদ স্বীকার করে নেয়া।- (অনুবাদক)

তারা একদিন জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে, যদিও তারা স্রষ্টার কিছু কিছু নিষেধ থেকে দূরে থাকতে ব্যর্থ হয়েছে। মহাবিচারের দিন ন্যায়পরায়ণ ও করুণাময় প্রভু বিশ্বাসীদের প্রতি তাদের তাকওয়া (আল্লাহ-ভীতি) ও সৎকাজের অনুপাতে অনুগ্রহ করবেন। এ সমস্ত বিশ্বাসী ব্যক্তি পাপের বোঝা নিয়ে দাঁড়ালে সমানুপাত শাস্তি পেতে পারে, কিন্তু (অবিশ্বাসীদের মত) জাহান্নামে চিরকাল পড়ে থাকবে না। আর এ পরম সৌভাগ্য আল্লাহর (ﷻ) উপর ঈমান আনার কারণে। এটাই পারলৌকিক জীবন (আখিরাত) সম্পর্কে মুসলিমদের বিশ্বাসের ভিত্তি।

আলোচ্য আয়াতের সাথে এ আলোচনার কী সম্পর্ক! খুব সহজ। আবু লাহাব ছিল মুহাম্মদ (ﷺ) এর ঘোর বিরোধীদের একজন। 'মুহাম্মদ (ﷺ)' নামের ব্যক্তিটির প্রতি তার ছিল প্রচন্ড ঘৃণা, মনে-প্রাণে সে তাঁর ধ্বংস কামনা করত। এ বিদ্বেষ এতটাই চরম ছিল যে, মুহাম্মদ (ﷺ) ওহী সম্পর্কে যা-ই বলতেন তার প্রত্যেকটির বিরোধিতা করা আবু লাহাবের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবে ভাবা যেতে পারে এমন একটি সুরাহ যখন অবতীর্ণ হল যেখানে বলা হয়েছে যে -আবু লাহাব কখনও তওবা করবে না, তখন আবু লাহাব অভ্যাস অনুযায়ী এ সুরাহর বিরোধিতা করতে দাঁড়িয়ে বলবে, "আমি তওবা করলাম"। কেননা এটাই তার স্বভাব। মুহাম্মদ (ﷺ) যা'ই বলুক সে সব সময় তার উল্টোটা বলবে। আন্তরিক বিশ্বাসে হোক কিংবা কপটতা করেই হোক, জনসমক্ষে উচ্চকণ্ঠে অথবা স্বজনদের সামনে নির্জনে তার শুধুমাত্র একটি পদক্ষেপই যথেষ্ট ছিল আর তা হল, শাহাদাহ্ উচ্চারণ করে নিজেকে মুসলিম বলে ঘোষণা দেয়া। আবু লাহাবের এ একটি মাত্র কাজ সমস্ত ধর্মকে বিপর্যস্ত করে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল। সে ধর্মান্তরিত হলে, হয় কুরআনের ১১১ নং সুরাহ ভুল সাব্যস্ত হত অথবা "মুসলিমরা শেষ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে" - ইসলামের এ মতবাদ ভুল প্রমাণিত হত।

১১১ নং সুরাহ অবতীর্ণ হয়েছে হিজরতের ৩-৪ বছর আগে। আর আবু লাহাব মারা গেছে ২য় হিজরী সনে সংঘটিত বদরের যুদ্ধের

পরে[87]। তার স্ত্রী মারা গেছে এরও প্রায় ৬ বছর পর, মক্কা বিজয়ের পূর্বে[88]। সুতরাং আবু লাহাব ও তার স্ত্রী এ সুরাহর বিরোধিতা করার জন্যে যথাক্রমে ৫ ও ১০ বছরেরও বেশী সময় হাতে পেয়েছিল। সন্দেহ নেই ঐ সময়ে এমন কিছু মুসলিম আশেপাশে ছিল যারা এ সুরাহটি অনবরত আবৃত্তি করে তাদের অন্তর্দাহ বাড়িয়ে তুলছিল। পরোক্ষভাবে তাদের বক্তব্য যেন ছিল, "তুমি কি জান, ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে তুমি কখনও তওবা করবে না, কখনও ইসলাম গ্রহণ করবে না"। এক্ষেত্রে উভয়ের একজনও যদি বলত, "তাই নাকি! তবে এ আমি তওবা করলাম। সত্যি বলতে, আমি ইসলামও গ্রহণ করলাম, এবার তোমাদের ওহী কী বলে নিয়ে এসো"। সুতরাং কৌতুহল জাগে আবু লাহাব ও তার স্ত্রী কেন এ অতি সহজ পদক্ষেপটি নেয়নি? দশ বছর কি সিদ্ধান্ত নেবার জন্য যথেষ্ট সময় নয়? নাকি মুশরিক বন্ধু-বান্ধবরা এ ব্যাপারে তাদের উৎসাহ যোগায়নি? কিংবা মুসলিমদের সাথে বর্বরাচরণ, মিথ্যারোপসহ শারীরিক নির্যাতন চালানোর মত হীন চরিত্র সত্ত্বেও এ সমস্ত মুশরিকদের নীতিবোধ বাধা দিয়েছিল তওবার ব্যাপারে কপটতা অবলম্বন করতে?

এ দু'জনকে তবে কিসে আটকে রেখেছিল? মুসলিমরা মনে করে – এ দু'জন তওবা করেনি, স্রষ্টার অনুমতি পায়নি বলে। যিনি জীবনযাপনের নিয়মনীতি তৈরী করেছেন, মানবজাতিকে দেহ-মন দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং যাঁর আদেশে তাদের প্রত্যাবর্তন ঘটবে তাঁরই কাছে, যিনি মানুষের মুখ খোলাতে ও বন্ধ করাতে পারেন, হৃদয়কে সংকুচিত কিংবা উন্মুক্ত করে দিতে পারেন, প্রতিকূল অবস্থায় শক্তি

---

[87] Hammad, Ahmad Zaki. 1997. *Father of Flame, Commentary & Vocabulary Reference of Surat al-Masad.* Bridgeview, Illinois: Quranic Literacy Institute. p. 42.
[88] Hammad, Ahmad Zaki. p. 42.

যোগাতে পারেন অথবা নগণ্য বিপদের মুখেও মানুষকে অসার ও শক্তিহীন করে দিতে পারেন – একমাত্র তিনিই পারেন সবচাইতে দৃঢ় ও অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী করতে। কেন! কারণ একমাত্র তিনিই ভবিষ্যৎ জানেন, তিনিই ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেন। তিনি যদি সিদ্ধান্ত নেন যে, ওমুক ব্যক্তির মুখ থেকে কখনও 'ওমুক-ওমুক' শব্দ বের হবে না, তবে তাঁর সিদ্ধান্তই অনিবার্য। একারণে মুসলিমরা বলে যে, ১১১ নং সুরাহর ভবিষ্যদ্বাণী কোন মানুষের পক্ষ থেকে আসা অসম্ভব। এরকম প্রতিশ্রুতি শুধুমাত্র তাঁর পক্ষেই দেয়া সম্ভব যিনি ভবিষ্যৎ জানেন এবং তাঁর অমোঘ বাণীকে তিনি কখনও ব্যর্থ হতে দিবেন না।

উপরের উদাহরণটির চমক শুধুমাত্র বলিষ্ঠ ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে নয়। আরো একটি কারণে, একই রকম দৃষ্টান্তের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ৭৪ নং সুরাহর ১১ থেকে ২৬ নং আয়াতেও। যেখানে আল-ওয়ালিদ ইব্ন আল মুগীরা আল মাখযুমীকে দন্ডাজ্ঞা দেয়া হয়েছে[89]। আল ওয়ালিদ প্রথমদিকের ইসলাম বিদ্বেষীদের একজন। মুহাম্মদ (ﷺ) এর প্রচারিত ওহী মেনে নেয়া তার পক্ষে ভীষণ কঠিন বোধ হচ্ছিল। একবার ইসলামের শত্রুদের আয়োজিত এক গোপন বৈঠকে আল ওয়ালিদ নেতৃত্ব দিয়েছিল। এ বৈঠকে তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে ছড়ানো বিভিন্ন রকম কুৎসা ও অপবাদকে একটি সাধারণ ও ঐকমত্যে রূপ দেয়া (যাতে তা জনমনে বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করে)। এ ঘটনায় তার একান্ত উপলব্ধি এবং প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি চমৎকারভাবে একটি সত্য তুলে ধরে। তা হল, যুক্তির লাইনচ্যুতির ফলে ব্যক্তির মধ্যে যখন দ্বৈতবাদের দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তখন যৌক্তিক চিন্তা ও উদ্ধত অন্ধ আবেগের মধ্যে লড়াই শুরু হয়,

---

[89] Al-Hilali, Muhammad, Ph.D. and Dr. Muhammad Muhsin Khan, M.D. *Interpretation of the Meanings of The Noble Qur'an in the English Language: A Summarized Version of At-Tabari, Al-Qurtubi and Ibn Kathir with comments from Sahih Al-Bukhari. Surah* 74, *Ayat* 11.

"আল ওয়ালিদ মুহাম্মদ (ﷺ) এর কণ্ঠে কুরআন শুনে কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিল। তার মতে, এ কুরআন কোন কবির রচনা নয়, যাদু নয়, নয় কোন উন্মাদের প্রলাপ। বরং এ বাণী আল্লাহ (ﷻ)র পক্ষ থেকে এসেছে। আবু জেহেল এ কথা জানতে পেরে আল ওয়ালিদকে তিরস্কার করতে লাগল এ বলে যে, আল ওয়ালিদ মুহাম্মদ (ﷺ) এর পক্ষ নিয়ে কথা বলছে। কুরায়েশদের মধ্যে তার বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে যে কানাঘুষা চলছে সে কথা জানাতেও ভুললো না। মর্যাদাবোধে আঘাত পেয়ে ক্ষুব্ধ আল ওয়ালিদ ঘোষণা দিল, 'কুরায়েশরা ভাল করেই জানে যে, আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী আর মুহাম্মদের কাছ থেকে আমি কিছু পাবার আশা করি না'। আবু জেহেল বলল, 'তাহলে সবার সামনে তোমার অবস্থান জানিয়ে দাও। তাদের খোলাখুলি ব'লে দাও মুহাম্মদ সম্পর্কে তোমার মতামত কি'। জবাবে আল ওয়ালিদ বলল, 'তার ব্যাপারে কি বলব? আল্লাহর শপথ! আরবী কবিতায় তোমাদের মধ্যে আমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী আর পটু আর কেউ নেই, এমনকি জ্বীনদের কবিতাতেও নয়। সে যা বলছে তা এর কোনটির মতন নয়। আল্লাহর শপথ! এ তো ভীষণ চমৎকার বাণী। তা নীচে যা আছে সব ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছে, উপরে যা আছে সব শ্রেষ্ঠত্বে অতিক্রম করেছে'। আবু জেহেল এবার বলল, 'তোমার এ কথা লোকেরা পছন্দ করবে না, অন্য কিছু ভেবে বল'। আল ওয়ালিদ প্রস্তাব দিল, 'তাহলে আমাকে একটু চিন্তা করতে দাও'। মুহাম্মদ (ﷺ) এর ব্যাপারে কী ধরণের বিশ্বাসযোগ্য অপবাদ রটানো যেতে পারে এ ব্যাপারে কুরায়েশ নেতাদের সাথে কথাবার্তা বলবার জন্যে আবার ফিরে এলো। দেখতে পেলো যে, কেউ বলছে মুহাম্মদ (ﷺ) একজন যাদুকর, কেউ বলছে জ্বিনগ্রস্ত, আবার

> কেউ বলছে সে পাগল। আল ওয়ালিদ বলল, 'তোমরা যা বলছ তার সবকিছু যে বানোয়াট তা আমি ভাল করেই জানি। তবে এগুলোর মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতার সবচেয়ে কাছাকাছি হচ্ছে, সে একজন যাদুকর। কারণ একমাত্র যাদুই পারে বিচ্ছিন্ন করতে পিতা থেকে পুত্রকে, ভাই থেকে ভাইকে, স্বামী থেকে স্ত্রীকে, এমনকি স্বগোত্র থেকে এর সদস্যকে'"।[90]

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, ওহীর প্রভাব সব সময় এমনই হয়ে থাকে। ঈসা (ﷺ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বাইবেলে বলা হয়েছে, "তোমরা কি ভেবেছো আমি পৃথিবীকে শান্তি দিতে এসেছি? আমি বলছি, মোটেও না, বরং আমি এসেছি বিচ্ছেদ তৈরী করতে। কারণ, এখন হতে পাঁচজন গৃহবাসী নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হতে শুরু করবে। তিনজন দাঁড়াবে দু'জনার বিরুদ্ধে আর দু'জন তিন জনের বিরুদ্ধে। পিতা দাঁড়াবে পুত্রের বিরুদ্ধে, পুত্র পিতার বিরুদ্ধে। মা দাঁড়াবে কন্যার বিরুদ্ধে, আর কন্যা মার বিরুদ্ধে। শ্বাশুড়ী দাঁড়াবে ছেলের বউ'র বিরুদ্ধে, ছেলের বউ দাঁড়াবে শ্বাশুড়ীর বিরুদ্ধে"।

(লুক ১২: ৫১-৫৩)

এ ঘটনার কিছু পরে নীচের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হল,

"আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একাই।
আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ।
এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ।
এবং তাকে দিয়েছি স্বচ্ছন্দ জীবনের বহু উপকরণ,
এরপরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরো অধিক দেই।
না, তা হবে না, সে তো আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধচারী।
আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করবো। সে তো চিন্তা করলো এবং সিদ্ধান্ত করলো;
অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত করলো!
আরো অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো!

---

[90] তাফসীর ইবন কাসীর

সে আবার চেয়ে দেখলো।
অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত ও মুখ বিকৃত করলো।
অতঃপর সে পিছনে ফিরলো এবং দম্ভ প্রকাশ করলো।
এবং ঘোষণা করলো: এটা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ছাড়া আর কিছু নয়,
এটা তো মানুষেরই কথা।
আমি তাকে নিক্ষেপ করবো সাকার-এ''।

(ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, মুদ্দাস্সির: ১১-২৬)

উপরের এ আয়াতগুলো কুরআনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ আয়াতগুলোর অন্যতম যা আল ওয়ালিদ ইবন আল মুগীরা আল মাখযুমীর মৃত্যুর প্রায় দশ বছর আগে, প্রথম হিজরীতে অবতীর্ণ হয়েছিল[91]। এবারও (আল ওয়ালিদ সম্পর্কে) কুরআনের দৃপ্ত ঘোষণা যাচাই করে দেখবার দাবী রাখে। আয়াতের রচয়িতা ভবিষ্যতের কথা কী করে নির্ভুলভাবে জানলেন যে, আল ওয়ালিদ কখনও আত্মসমর্পন করে সত্যকে স্বীকার করবে না? কী করে জানলেন যে, সে ইসলামকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে কপটতা করে হলেও ইসলামের শাহাদাহ্ বাণী উচ্চারণ করবে না? আর প্রতারক হলে কোন মরণশীল মানুষ কি কখনও নব্যুয়তের দাবী জানাবার ঝুঁকি নেবে এমন এক ভবিষ্যদ্বাণীর উপর ভিত্তি করে যা সহজে খণ্ডন করা যায়?

যারা মুহাম্মদ (ﷺ) ও তাঁর ধর্মের প্রতি ঘৃণা ও বিরোধিতায় সোচ্চার হয়েছিল, উপরে উল্লেখিত ঘটনার চরিত্রটি এরকম অনেকের ভীড়ে একটি মাত্র উদাহরণ। এরা ছিল এমন প্রকৃতির লোক যারা ইসলামের বিস্তারকে রোধ করতে হীন থেকে হীনতর কৌশল এবং সবচেয়ে জঘন্য কুকর্ম করতে পিছ-পা হয়নি। তা সত্ত্বেও, তারা মুহাম্মদ (ﷺ) সম্পর্কে জ্বলজ্যান্ত মিথ্যা প্রচারের বেলায় সংযত হয়েছিল, কারণ লোকদের কাছে সেগুলো গ্রহণযোগ্যতা পেতো না। ঐ যুগে পক্ষের কিংবা বিপক্ষের,মক্কার সমস্ত আরবের কাছে মুহাম্মদ (ﷺ) এর

---

[91] Ibn Hisham, *As-Seerah An-Nabiwwiyyah*, and Azzirikly, *Al-Aa'lam*.

ব্যক্তিগত চরিত্র সুপরিচিত ছিল। তারা তাঁর চরিত্রের ব্যাপারে এমন কোন অপবাদকে প্রশ্রয় দিত না যার অসঙ্গতি দিবালোকের মত স্পষ্ট। অথচ আজ যারা তাঁর সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না, তারা নানারকম অপবাদ ছড়ানোতে এর বিপরীত আচরণ দেখিয়েছে। যারা তাঁকে সবচেয়ে কাছে থেকে চিনত, একসঙ্গে থেকেছে, ওঠাবসা করেছে, কথাবার্তা বলেছে, তাঁর সাথে বিভিন্ন সময়ে লেনদেন করেছে; জীবনভর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এ ব্যক্তিটিকে জেনেছে - তারা পর্যন্ত অস্বীকার করেছিল তাকে একজন মিথ্যাবাদী, কবি, যাদুকর, মৃগীরোগী, কিংবা এমন কোন মানুষ বলে অপবাদ দিতে যিনি অস্বাভাবিক প্রতিভাবানের বেশী আর কিছু নন।

সুরাহ আর-রূম ('রোমান', ৩০ নং সুরাহ) আমাদের চিন্তার খোরাকে আরো একটি চমৎকার সংযোজন। এ সুরাহ'র ২ থেকে ৪ নং আয়াত অবতরণ করেছিল রোমের উপর পারস্য সাম্রাজ্যের যুদ্ধ বিজয়ের সময়। ঐ সময় সাধারণত যেভাবে খবর পৌছাত (পথিক, কাফেলা ইত্যাদির মাধ্যমে) তার অনেক আগেই মানুষ এ খবর জানতে পেরেছিল। তাছাড়া পরবর্তী ৩ থেকে ৯ বছরের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল যে উল্টে যাবে, অর্থাৎ রোম সাম্রাজ্য পারস্যকে পরাজিত করবে তার ভবিষ্যদ্বাণীও এ আয়াতগুলোতে এসেছে।

ইতিহাসের বিবরণে দেখা যায় যে, ৬১৩ সালে এন্টিওক (Antioch) নামক স্থানে পার্সী বাহিনী রোমান বাহিনীকে পরাজিত করেছিল। বাইজেন্টাইনের[92] অধিবাসীরাও দামেস্কে পরাজিত হয়ে আর্মেনিয়া থেকে বহিস্কৃত এবং স্বপ্নের শহর জেরুযালেমে শত্রুর হাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়েছিল[93]। এরপর পার্সীরা ৬১৭ সালে রোমান অধিকৃত ক্যালসিডান (Chalcedon) এবং ৬১৯ সালে মিশর দখল করে

---

[92] পূর্ব ইউরোপে বিস্তৃত রোমান সাম্রাজ্যের আরেকটি শাখা। - (অনুবাদক)

[93] Ostrogorsky, George. 1969. *History of the Byzantine State.* (Translated from the German by Joan Hussey). New Brunswick: Rutgers University Press. p. 95.

নিলে রোম সাম্রাজ্যের জন্য পরিস্থিতি আরো সংকটপূর্ণ ও নৈরাশ্যজনক হতে লাগল[94][95]। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস ৬২২ থেকে ৬২৭ সাল পর্যন্ত তার ঐতিহাসিক সামরিক অভিযান চালাবার পূর্ব পর্যন্ত রোমের এ পতনোন্মুখ অবস্থা অব্যাহত ছিল। বিখ্যাত সেনাপতি শাহ্‌রবারাজের নেতৃত্বে রোমানরা ৬২২ সালে আর্মেনিয়ার মাটিতে পার্সী সেনাবাহিনীকে হারিয়ে দিল - প্রথমবারের মত তাদের এ বিজয় ঘটেছিল মিশর হস্তচ্যুত হবার ৩ বছর ও এন্টিওকে পরাজিত হবার ৯ বছর পর। আর এ সমস্ত পরাজয়ের ঘটনা ঘটেছে তিন থেকে নয় বছর সময়সীমার মধ্যে[96][97]।

এবার সুরাহ রূমের আয়াত দেখুন,

"রোমকগণ পরাজিত হয়েছে, নিকটবর্তী অঞ্চলে (সিরিয়া, ইরাক, জর্ডান এবং প্যালেস্টাইন); কিন্তু তারা তাদের এ পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে। কয়েক বছরের (তিন থেকে নয় বছরের) মধ্যেই। পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। আর সেই দিন মুমিনরা হর্ষোৎফুল্ল হবে"। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, রূম:২-৪)

ইতিহাসের এ ঘটনা প্রবাহ সত্যিই অদ্ভুত। কেননা মুহাম্মদ (ﷺ) এর সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের বিপুল শক্তি-ক্ষমতা অবক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। আজকের ঐতিহাসিকরা ৩৯৫ থেকে ৪৭৬ সাল পর্যন্ত সময়কালকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যের পতনের যুগ বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। এলারিকের নেতৃত্বে ভিসিগথ সেনাবাহিনী ৪১০ সালের আগস্টে রোম আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। রোম আরো একবার লুণ্ঠিত হয়

---

94 Sykes, Sir Percy Molesworth. 1951. *A History of Persia*. 3rd edition. Vol 1. London: Macmillan & Co., Ltd. p. 483.

95 Ostrogorsky, George. p. 95.

96 Ostrogorsky, George. pp. 100-101.

97 Sykes, Sir Percy Molesworth. Vol 1. pp. 483-484.

৪৫৫ সালের গ্রীষ্মে জার্মান ভ্যান্ডাল ও এলানিদের নেতা গ্যাইসেরিকের হাতে। এরপর হান রাজবংশের আত্তিলা ৪র্থ শতকের মাঝামাঝি এ অঞ্চল পদদলিত করে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। অবশেষে ৫ম শতকের শেষার্ধে এক কালের সুরক্ষিত ও অবিভেদ্য শক্তিশালী রোমান সাম্রাজের শেষ সম্রাট সিংহাসনচ্যুত হতে বাধ্য হন। সুতরাং এরকম একটি বেপরোয়া ভবিষ্যদ্বাণী বেশীরভাগের কাছে অবাস্তব মনে হয়েছিল যাতে বলা হয়েছে, টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া রোমান সাম্রাজ্য পরবর্তী দু'শত বছরের মধ্যে প্রবল ক্ষমতাধর পার্সী বাহিনীর উপর বিজয় লাভ করবে। উবাই ইব্ন খালফ এদেরই একজন যারা এ আসমানী বাণীকে অগ্রাহ্য করেছিল।

এ যুদ্ধের কথা আরব ইতিহাসে বিভিন্ন জায়গায় আলোচিত হয়েছে। সে সময়ের আরবদের কাছে এ দ্বন্দ্ব শুধুমাত্র পারস্য ও রোমক জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। আরবের পৌত্তলিকরা বিশ্বাসগত আদর্শের দিক দিয়ে পার্সী অগ্নি-উপাসকদেরকে ভ্রাতৃস্থানীয় মনে করত। অন্যদিকে মুসলিমরা রোমানদের গণ্য করত 'আহলে কিতাব' বা 'গ্রন্থধারী' বলে। বোঝাই যাচ্ছে যে, রোম-পারস্য যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে দু'টি দলের ঔৎসুক্য কম ছিলনা। বিজিত দলের বিজয় মানে যেন তাদের উপাস্যেরই শ্রেষ্ঠত্বের প্রমান।

পারস্য যখন রোমকে পরাজিত করেছিল তখন আরবের মুশরিকরা (পৌত্তলিকরা) বিজয়োল্লাস করেছিল। পরবর্তীতে (রোমের বিজয় নিয়ে) আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলে মুমিনদের (বিশ্বাসীদের) হৃদয়ে প্রত্যয় আর আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেল। মুহাম্মদ (ﷺ) এর সবচেয়ে ঘনিষ্ট সঙ্গী ও ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বকর আস-সিদ্দিক (رضي الله عنه) এ আয়াত শুনবার পর মুশরিকদের আনন্দ উদযাপনে বাধা দিয়ে জানালেন - এত উল্লসিত হবার কিছু নেই; কেননা শীঘ্রই আল্লাহর (ﷻ) সাহায্যে বিজয়ের পাশা উল্টে যেতে যাচ্ছে। উবাই ইব্ন খালফ আবু বকরকে (رضي الله عنه) 'মিথ্যাবাদী' বলে গালি দিল। উত্তেজিত আবু বকর (رضي الله عنه) বল্লেন, "বরং তুমি মিথ্যাবাদী, হে

আল্লাহর শত্রু'। উবাই এবার আবু বকরকে ১০টি উট বাজী রেখে চ্যালেঞ্জ করে বসল যে, রোম কখনই আগামী ৩ বছরে জয়ী হতে পারবে না। আবু বকর (রাঃ) মুহাম্মদ (ﷺ) এর কাছে গিয়ে বাজীর (এ ঘটনা জুয়া, বাজী ইত্যাদি নিষিদ্ধ হবার আগে ঘটেছিল) কথা জানালে তিনি (ﷺ) তাকে মনে করিয়ে দিলেন যে, আয়াতে ব্যবহৃত আরবী "বিদ'ই" শব্দের অর্থ '৩ থেকে ৯ বছর'। সুতরাং, আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আবু বকরের উচিত বাজীর সময়সীমা বাড়িয়ে দেয়া। এ কথা শুনে আবু বকর উবাইয়ের কাছে ফিরে গেলেন। আবু বকর (রাঃ) কে আসতে দেখে উবাই জিজ্ঞেস করল বাজী নিয়ে আবু বকরের মনে কোন অনুতাপ হয়েছে কিনা। তাকে নিরাশ করে আবু বকর (রাঃ) জানালেন যে, তিনি বাজীর পুরস্কারের পরিমাণ বাড়িয়ে ১০০টি উট এবং মেয়াদ বাড়িয়ে ৯ বছর নির্ধারণ করতে চান। উবাই রাজী হয়ে গেল। ৯ বছর পার হলে আবু বকর লাভ করলেন বিরাট উটের পাল[৭৪] আর ইসলামিক জ্ঞানকোষে যোগ হল আরো একটি নতুন প্রমাণ।

আয়াতের শেষ অংশে লক্ষ্য করার মত আরো একটি অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে, *"...আর সেই দিন মুমিনরা হর্ষোৎফুল্ল হবে"*। মাইক্রোওয়েভ, স্যাটেলাইট, রেডিও কিংবা CNN প্রচার মাধ্যমের অনুপস্থিতিতে সে সময় কোন জায়গায় খবর পৌছাতে কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ লেগে যেত। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় কখনও বা মাস অতিক্রান্ত হত। তাহলে এতটা দৃঢ়তার সাথে কেমন করে এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হল যে, যেদিন পারস্য পরাজিত হবে সেই একই দিন মুসলিমরাও উৎফুল্ল হবে? বিস্ময়কর হলেও সত্যি যেমনটা আয়াতে বলা হয়েছে ঠিক তা-ই ঘটেছিল। ব্যাপার হচ্ছে, যেদিন পার্সী বাহিনী পরাজয় বরণ করল সেই একই দিনে মুসলিমরা বদরের প্রান্তরে কাফিরদের পরাজিত

---

[৭৪] তাফসীর ইবন কাসীর, মুসনাদে আহমেদ, সুনান আত-তিরমিযি, আন-নাসাঈ

করে বিজয়ানন্দ প্রকাশ করছিল। এ কি নিছক কাকতালীয় ব্যাপার, নাকি কোন আসমানী পরিকল্পনা?

১৫ নং সুরাহ'র ৯ নং আয়াতে আল্লাহ (ﷻ)প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,

"আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী"। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, আল-হিজ্‌র:৯)

বিভিন্ন দিক দিয়ে এ আয়াতটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রথমতঃ আয়াতের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মূল কুরআন আজ পর্যন্ত অবিকৃত ও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে, এ আলোচনা আগেই করা হয়েছে। এ অলৌকিক ব্যাপারটির অসাধারণত্ব আরো বেশী অনুভূত হয় যদি পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মগুলোর সাথে তুলনা করা যায়। বর্তমানে পৃথিবীতে আসমানীগ্রন্থের দাবীদার ইসলামই একমাত্র ধর্ম নয়। অথচ অন্যান্য ধর্মে অনুসারীর সংখ্যা যত বিলিয়নই হোক, স্রষ্টার প্রতি তাদের আবেগ যত গভীরই হোক এবং ধর্মগ্রন্থের প্রতি তাদের ভক্তি যত প্রবলই হোক না কেন – ইহুদী কিংবা খ্রিষ্টান কোন ধর্মই মুসা (عليه السلام) ও ঈসা (عليه السلام) এর উপর অবতীর্ণ গ্রন্থের মূল ও অবিকৃত লিপি দেখাতে পারবে না।

দ্বিতীয়তঃ মুহাম্মদ (ﷺ) প্রতারক হলে উপরের আয়াতটির কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ এরকম একটি ভবিষ্যদ্বাণী থেকে তিনি জীবদ্দশায় কোন সুবিধা আদায় করতে পারতেন না। আসমানীগ্রন্থের একটি অক্ষরও যদি এদিক-ওদিক হত তবে প্রকৃতপক্ষে তিনি পুরো গ্রন্থই হারিয়ে ফেলতেন। আর ফলে কুরআনের ৩০০,০০০ এর বেশী অক্ষর সংকটের মুখোমুখি হত।

বিশ্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ৫নং সুরাহ'র ৮২ নং আয়াতের মর্ম বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়,

"তুমি মানবমন্ডলীর মধ্যে মুসলিমদের সাথে অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবে ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে আর তন্মধ্যে মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার অধিকতর নিকটবর্তী ঐসব লোককে

পাবে, যারা নিজেদেরকে নাসারা[৭৭] বলে, এটা এ কারণে যে, তাদের মধ্যে বহু জ্ঞানপিপাসু আলেম এবং বহু সংসার বিরাগী দরবেশ রয়েছে, আর এ কারণে যে, তারা অহংকারী নয়"। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, মায়িদাহ্:৮২)

মুহাম্মদ (ﷺ) এর জীবনের প্রেক্ষাপটে উপরের এ আয়াতটি সত্যি বিস্ময়কর। তার কারণ শুধু এ নয় যে, গত ১৪০০ বছরের দীর্ঘ ইতিহাস এ বাণীর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছে। বরং এ কারণেও যে, মুহাম্মদ (ﷺ) এর জীবদ্দশায় কয়েকবার স্থানীয় বিভিন্ন ইহুদী গোত্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ হবার ঘটনা ঘটেছিল এবং ফলে বেশ কয়েকবার আয়াতটি ভুল প্রমাণিত হবার অবকাশ থাকলেও তা শেষ পর্যন্ত হয়নি। সংখ্যালঘু ইহুদীরা ক্রমবর্ধমান মুসলিম শক্তির পক্ষ নেবে এমনটা স্বাভাবিক ছিল। অথচ মুসলিমদের সাথে বারবার প্রতারণা আর চুক্তিভঙ্গ করা যেন তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। শুধু তাই না, ইতিহাসে কখনই ইহুদীরা মুসলিমদের প্রতি সৌহার্দ্যমূলক মনোভাব দেখায়নি। এতে ১৪০০ বছরের পুরনো এ ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থতা নিশ্চিত হয়। আজকে প্যালেস্টাইনের বুকে যা কিছু ঘটছে তা আয়াতের সত্যতা আরো বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরে।

এ রকম সংকটময় এক পরিস্থিতিতে মুহাম্মদ (ﷺ) এর দেহরক্ষীদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবার ঘটনাটি চিন্তা করলেও অবাক না হয়ে পারা যায় না। পৌত্তলিক কুরায়েশ বংশ, একাধিক ইহুদী গোত্র ও সমস্ত অবিশ্বাসীদের তীব্র আক্রোশের মাঝে মুহাম্মদ (ﷺ) এমন এক সময় ও পরিবেশে পরিবেষ্টিত ছিলেন যেখানে প্রায় সবাই তাঁর মৃত্যু কামনা করছিল। অনেকবার তিনি (ﷺ) জীবননাশের চেষ্টা থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন। তাঁর স্ববংশীয় লোকেরা তাঁকে মারাত্মকভাবে আঘাত করেছে, চাদর পেঁচিয়ে শ্বাসরোধের চেষ্টা করেছে, এমনভাবে পাথর মেরে রক্তাক্ত করেছে যে পায়ের জুতা পর্যন্ত রক্তে ভিজে গিয়েছিল। ইহুদী গোত্রের সাথে আলোচনা করতে গেলে একবার তাঁর

---

[৭৭] ঈসা (O) এর অনুসারীদেরকে কুরআনের আয়াতে নাসারা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপর ভারী পাথরখণ্ড ফেলে এবং আরেকবার খাবারে বিষ মিশিয়ে হত্যার চেষ্টা চালানো হয়েছে (সেই বিষক্রিয়া এত তীব্র ছিল যে একজন সাহাবী সে খাবারের মাত্র এক গ্রাস মুখে দিয়েই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন)। যুদ্ধক্ষেত্রে তো বটেই, যুদ্ধের বাইরেও বিভিন্ন সময়ে একাধিক ব্যক্তি তলোয়ার হাতে তাঁকে (ﷺ) হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। সবাই যাকে ভয় করে চলত, কুরায়েশ বংশের সেই উমর একদিন নবী (ﷺ)'কে হত্যার ঘোষনা দিয়ে ঘর থেকে বের হল। কিন্তু ইচ্ছা পুরণের আগেই নিয়তি তাকে নিয়ে এলো আপন বোনের গৃহে। সেখানে কুরআনের আয়াত শুনে প্রভাবিত হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। আরো দু'বার দু'জন বেদুইন তাঁকে অসতর্ক-অরক্ষিত অবস্থায় পেয়ে (একবার মরুভূমিতে নিদ্রারত, আরেকবার কুয়ার পাশে বিশ্রামরত অবস্থায়) তাঁরই তলোয়ার তুলে নিয়েছিল হত্যার উদ্দেশ্যে। দু'বারই হাত থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল তলোয়ার। অস্ত্র ধরে রাখবার শারীরিক শক্তিটুকু যেন কে শুষে নিয়েছিল। যে রাতে তিনি (ﷺ) (মক্কা থেকে) মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, সে রাতে মক্কার প্রত্যেক গোত্র নিজেদের থেকে একজন করে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল সম্মিলিতভাবে তাঁকে (ﷺ) হত্যা করার জন্যে। যাতে বিশেষ কোন গোত্রকে হত্যার দায়ভার একা বহন করতে না হয়। হত্যা প্রচেষ্টার এরকম আরো দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। সুতরাং, মুহাম্মদ (ﷺ) নিদ্রার সময় যে নিরাপত্তা প্রহরী (সা'দ ইব্ন মালিক, আলি ইব্ন আবু তালিব ও আল-আব্বাস এদের মধ্যে ছিলেন) নিযুক্ত করেছিলেন তা বিনা কারণে ছিল না। কিন্তু নীচের আয়াতটি আগমনের সাথে সাথে পরিস্থিতি বদলে গেল,

"হে রসূল (ﷺ)! যা কিছু তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সবকিছুই পৌছে দাও; আর যদি এরূপ না কর, (তবে) তুমি আল্লাহর পয়গামও পৌছাওনি বলে বিবেচিত হবে, আর আল্লাহ তোমাকে মানুষ (অর্থাৎ কাফির) হতে সংরক্ষিত রাখবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না"। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, মায়িদাহ্:৬৭)

মুহাম্মদ (ﷺ) বুঝতে পেরেছিলেন এ আয়াতে তাঁকে মানুষের হাত থেকে নিরাপত্তা দানের আসমানী নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর আশেপাশে নিয়োজিত প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আদেশ দিলেন, "লোকেরা! তোমরা চলে যাও, কেননা সুমহান আল্লাহ আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন"[100]

সত্যি সত্যি তা-ই হয়েছিল। নিরাপত্তা প্রহরীকে অব্যাহতি দেবার পর মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর জীবননাশের চেষ্টা চলেছে একের পর এক। কিন্তু প্রত্যেকবার ব্যর্থ হয়েছে। অবশেষে তাঁর (ﷺ) জীবনাবসান ঘটেছে কয়েকদিন অসুস্থতায় ভোগার পর চার দেয়ালের ভিতর নিজ গৃহে, প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর কোলে মাথা রেখে। এতসব বর্ণনা কী জন্যে? ভেবে দেখুন, সমস্ত পৃথিবী পিছনে লেগে আছে এমন এক স্থান ও কালে মুহাম্মদ (ﷺ) শুধুমাত্র ওহীতে উচ্চারিত সৃষ্টিকর্তার প্রতিশ্রুতির উপর আস্থাশীল হয়ে দেহরক্ষীদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিলেন। আর ওহীর সেই প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত সত্য বলে প্রমাণিত হল।

পরিস্থিতির এ অসাধারণত্ব অগ্রাহ্য করার মত নয়। ভণ্ড নবীরা নিশ্চিতভাবে মস্তিষ্ক বিকৃতির শিকার। জীবনহানির আশংকা যত বৃদ্ধি পায় ও পরিত্রাণের পথ যত সংকীর্ণ হতে থাকে, ততই তারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে থাকে। চারিদিকে যুদ্ধের আশংকা, অতর্কিত জীবননাশের অপচেষ্টা চালানো হয়েছে বহুবার -এরকম একটি অবস্থায় কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তুলে নেয়ার পিছনে কোন পার্থিব স্বার্থ থাকতে পারে না। কুরআন কোন ভণ্ড নবীর বাণী হলে বরং এর উল্টোটাই মানুষ আশা করে। অনুসারীরা তাদের নবীকে আততায়ীর হাত থেকে রক্ষা করতে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে নিরাপত্তা জোরদার করবে। অথচ সে রকমটা ঘটেনি। এ ঘটনা আবারও কুরআনের সঠিক উৎস নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে।

---

[100] আত-তিরমিযি, আল হাকিম

এ যদি মানুষের মস্তিষ্ক থেকে না এসে থাকে, কার এমন ক্ষমতা আছে জীবনব্যাপী নিরাপত্তা দানের নিশ্চয়তা বাস্তবায়িত করার?

এ অধ্যায়ের সমাপ্তি টানা হচ্ছে "Old Testament" এর অতি পরিচিত একটি কাহিনী দিয়ে। স্বৈরাচারী শাসক ফেরাউন দীর্ঘদিন ধরে একটি জাতিকে নিপীড়ন আর অত্যাচারের মাধ্যমে দমিয়ে রেখেছিল। প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে বনি ইস্রাঈল বংশীয় ইহুদী পুরুষ ও তাদের শিশুদের উপর নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল - এ ভয়ে যে, তারা সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে তার বিরুদ্ধে শক্তিশালী হয়ে উঠবে। মুসা (ﷺ) ঝুড়িতে করে কিভাবে নদীর স্রোতে ভেসে ফেরাউনের রাজপ্রাসাদের প্রান্তে এসে ভিড়েছিল, সে ঘটনা প্রায় সবাই জানে। একদিকে যখন ফেরাউনের আদেশে নিষ্পেষিত ইহুদী দাসদের বিখন্ডিত শবদেহগুলোকে স্তুপীকৃত করা হচ্ছিল, তখন অন্যদিকে শিশু মুসা (ﷺ) রাজকীয় পরিবেশে বেড়ে উঠছিলেন, ভবিষ্যতে পালকের বিরুদ্ধে হুমকির প্রস্তুতি নিয়ে। পরবর্তীতে তিনি (ﷺ) সমস্ত বিশ্বকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন তাঁর আল্লাহর (ﷻ) প্রতি ভয়, বিশ্বস্ততা এবং একনিষ্ঠ ভক্তি দিয়ে।

রাজসভায় ফেরাউনের সাথে মুসা (ﷺ) এর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়, ফেরাউনের একের পর এক আসমানী নিদর্শন অমান্য করা এবং পরবর্তীতে দুঃখ-দুর্দশার কয়েক বছর পর মুসা (ﷺ) আল্লাহর (ﷻ) নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর সম্প্রদায়কে সঙ্গে করে (মিশর থেকে) যাত্রা শুরু করলেন। এরপর ঘটনার জল কোথায় গড়ালো তো সবারই জানা আছে। কাহিনী যে ঢঙ্গেই বলা হোক না কেন, প্রত্যেকে জানে এর শুরুতে, মধ্যেখানে এবং বিশেষ করে শেষে কী ঘটেছিল। ঘটনার শেষে ফেরাউনের বাহিনী সমুদ্রতরঙ্গের দেয়ালের ক্ষমাহীন নিষ্পেষণের তোড়ে নিমজ্জিত হয়েছিল।

লোকমুখে প্রচলিত এরকম একটি জনপ্রিয় কাহিনী কোনমতেই মুহাম্মদ (ﷺ) এর কান এড়িয়ে যাবার কথা না। যাহোক কাহিনী

থেকে যে চিত্রটি মানসপটে ভেসে উঠে তা হল, কয়েক মিলিয়ন টন পানির গভীরে সমাহিত ফেরাউনের পচে-গলে যাওয়া শবদেহ সামুদ্রিক মাছের ভোজে পরিণত হয়েছে। ফেরাউনের দেহ অবিকৃত থাকবে, এরকম ভাবাটা মোটেও স্বাভাবিক ছিল না। অথচ ফেরাউনের মৃত্যুর সময় আল্লাহ (ﷻ) তাকে তার দেহ সংরক্ষণের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা কুরআনে লিপিবদ্ধ আছে,

"অতএব আমি আজ বাঁচিয়ে দিচ্ছি তোমার দেহকে যেন তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্যে উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হয়ে থাকো; আর প্রকৃতপক্ষে অনেক লোক আমার উপদেশাবলী হতে উদাসীন রয়েছে"। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, ইউনুস: ৯২)

মাত্র ১৮৯৮ সালে দ্বিতীয় রেমেসিসের উত্তরাধিকারী মারনেপটাহ্'র সংরক্ষিত মরদেহ King's Valley'র থিব্স শহরে আবিস্কৃত হয়েছে[101]। বাইবেলের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের প্রমাণ অনুযায়ী একেই মিশরত্যাগী ইস্রাইলীয়দের সময়ের ফেরাউন ('Pharaoh of Exodus') বলে মনে করা হয়। অন্যান্য রাজকীয় মমির (যার মধ্যে আছে বানর, বিড়াল, কুকুর, কুমির এমনকি মাছও) সঙ্গে এ মরদেহ কায়রো যাদুঘরে প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে নিদর্শনস্বরূপ ফেরাউনের দেহকে সংরক্ষিত রাখার যে প্রতিশ্রুতি কুরআনে দেয়া হয়েছিল তা অবশেষে, মুহাম্মদ (ﷺ) এর মৃত্যুর ১২০০ বছরের বেশী সময় পরে সত্য প্রমাণিত হল বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ ঘটনার ১২০০ বছর আগে মুহাম্মদ (ﷺ) এর পক্ষে কী করে এর ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হল? আর কেনইবা তিনি এত সূক্ষ্ম বর্ণনা নিয়ে বিপদজনক অনুমানের আশ্রয় নিতে যাবেন? এর পিছনে একটাই সম্ভাবনা থাকে, এ বাণী তাঁর নিজস্ব রচনা নয়।

---

[101] Bucaille, Maurice. P. 239.

ষষ্ঠ প্রমাণ

অজানা বিষয়ের ওহী

(রসূলুল্লাহ ﷺ এর অভিজ্ঞতার উর্ধ্বের জগত)

"No one ever approaches perfection except by stealth, and unknown to themselves."
--William Hazlitt, *Sketches and Essays*, "On Taste"

"সংগোপনে ও নিজেদের অজ্ঞাতে ছাড়া কেউ পূর্ণতা লাভ করে না"।
- উইলিয়াম হ্যাযলিট, *Sketches & Essays*, "On Taste".

আরো ভাল হত যদি এ অধ্যায়ের নাম দেয়া যেত – "বৈজ্ঞানিক প্রমাণ"। কিন্তু এ ধরণের শিরোনাম আবার পশ্চিমা শ্রোতাদের কানে বেমানান ঠেকে, কেননা বিজ্ঞান ও ধর্ম – তাদের কাছে পরস্পর বিরোধী দু'টি বস্তু। জর্ডানো ব্রুণো (Geordano Bruno) (যাকে খ্রিষ্টান ধর্মবিরোধী মতামত প্রকাশের জন্য ১৬০০ সালে খুঁটিতে বেঁধে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল) কিংবা গ্যালিলিও (যিনি নিজের মত প্রত্যাহার করে ১৬৩৩ সালে অনুরূপ শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন) – এ দু'জনার উদাহরণ এ প্রসঙ্গে উল্লেযোগ্য। উভয়ই টলেমীর স্বীকৃত Geocentric দর্শন (যে দর্শন অনুযায়ী 'পৃথিবী হল সমস্ত কিছুর কেন্দ্রবিন্দু') প্রত্যাখ্যান করে কোপার্নিকাসের Heliocentric দর্শন (অর্থাৎ, পৃথিবী নয় বরং সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত) সমর্থন করার অপরাধে নির্যাতিত হয়েছিলেন। তাদের সমর্থিত দর্শন যদিও বা ঠিক, কিন্তু তা ছিল (গীর্জা ও সমাজে) প্রচলিত মতের সাথে সংঘর্ষমূলক। বোঝাই যাচ্ছে সে সময় পশ্চিমা সমাজে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ধর্মীয় চিন্তার মধ্যে কী ধরণের অসঙ্গতিপূর্ণ দ্বন্দ্ব বিরাজ করছিল। প্রকৃতপক্ষে আজকে যা প্রমাণিত সত্য বলে সবাই জানে তা সে সময়ের বহু গীর্জার লালিত বিশ্বাসের সাথে অবিশ্বাস্যরকম বিপরীত ও বেমানান ছিল। যে সমস্ত প্রতিবাদী সাহসী কণ্ঠ সে সময় গীর্জার ভুল দর্শনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল তাদের অধিকাংশই পরবর্তীতে আগুনের ভস্মে পরিণত হয়েছে, সেই সাথে উপড়ে ফেলা হয়েছে তাদের শিকড়। অপরাধীদের ডুবিয়ে মারা হত যে অতল জলের গভীরে, তাতে নিশ্চুপ হয়ে গেছে তাদের নিস্ফল আর্তি।

দিনের পর দিন ধরে গীর্জার কঠোর, অসহিষ্ণু ও নিষ্ঠুর মনোভাবের কারণে সমাজে এক রকম ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। সত্য বলে প্রমাণিত হবার পরও নানা বাস্তবতার বিরুদ্ধে গীর্জার সরকারী বলপ্রয়োগের কারণে সাধারণ জনগণের মধ্যে

যথেষ্ট ক্ষোভ ও অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করে। এরই ফলশ্রুতিতে এক পর্যায়ে গীর্জা (ধর্ম) ও রাষ্ট্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হয়ে যেতে বাধ্য হয়। এ ঘটনার পিছনে জড়িয়ে আছে মর্মান্তিক রক্তাক্ত ইতিহাস ও অসংখ্য দুঃখ-দূর্দশার কাহিনী। পরিণামে প্রায় দুই'শ বছরেরও বেশী সময় ধরে বর্তমান খ্রিষ্টান সমাজে ধর্ম ও বিজ্ঞান এ দু'টি প্রাঙ্গণ একে অপরের ব্যাপারে মাথা ঘামানোকে অনধিকার চর্চা বলে মনে করে আসছে। আর অধিকাংশের কাছে এর বিকল্প অন্য কোন শান্তিপূর্ণ সমাধান অচিন্ত্যনীয়।

অন্যদিকে ইসলামে ধর্ম ও রাষ্ট্র – এ দু'টি বিষয়কে আলাদা করে দেখবার কোন অবকাশ নেই। প্রথম থেকেই ইসলামী শিক্ষা ব্যাপক বলে স্বীকৃত যার প্রবেশ ও প্রভাব রয়েছে মানবজীবনের প্রতিটি অঙ্গনে। ইসলামের সমর্থকরা যুক্তি দেখায় যে, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার আদেশরূপে মানবোস্তিত্বের সমস্ত পরিমণ্ডলকে নিয়ন্ত্রণকারী যে আসমানী বাণী এসেছে তা মানবজাতির চূড়ান্ত পথনির্দেশনা হিসেবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সঙ্গতিশীল। কিছু কিছু ধর্মে যে নিয়ন্ত্রণহীন-অবাধ জীবনযাপন প্রণালী অনুমোদন করা হয়েছে, তাকে প্রাধাণ্য দিতে গিয়ে ইসলামের বিরোধীরা ইসলামের মত এরকম ব্যপক একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধানকে কটাক্ষ করতে প্ররোচিত হয়েছে। এ ধরণের অবাধ ধর্মবিশ্বাসগুলোর মূল বিস্তৃত হয়েছে প্রধাণতঃ মানবরচিত দর্শন অথবা মূল ধর্মগ্রন্থের বিকৃত অপব্যাখ্যা থেকে।

ইসলাম ধর্মের শিক্ষা যে শুধু ধর্মবিশ্বাস ও ইবাদতের স্তম্ভগুলো নিয়ে আলোচনা করে তা-ই নয় সেই সাথে রাজনীতি, ব্যক্তিগত আচার-আচরণ, পরিবারিক ও সামাজিক কাঠামো, অর্থনীতি, সাধারণ (দেওয়ানী) ও দুর্নীতি সংক্রান্ত আইন-কানুন সহ বাস্তব জীবনের অন্যান্য গন্ডী সম্পর্কে প্রজ্ঞাময় সৃষ্টিকর্তার 'ইচ্ছা' বা আদেশ সম্পর্কেও বিস্তারিত বর্ণনা করে। বিজ্ঞান ও মানবোস্তিত্বের ধরণ, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, প্রকৃতি-সবকিছু সম্পর্কে এ ধর্মে শিক্ষা দেয়া হয় যা জ্ঞানের বিস্তারকে উৎসাহিত করে এবং সংকীর্ণ মানসিকতার সমালোচনা করে। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তি অথবা জ্ঞানবান নারী-পুরুষের জন্য। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একই ধরণের প্রশ্ন বার বার করা হয়েছে, "তারা কি চিন্তা করে না"? অথবা "তারা কি দেখে না"? কুরআনে সেই সমস্ত রীতি-নীতি ও সংস্কারের সমালোচনা

করা হয়েছে যা গড়ে উঠেছে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের উপর ভিত্তি করে। সবচেয়ে কঠোর নিন্দা করা হয়েছে তাদের, যারা স্রষ্টার প্রজ্ঞাপূর্ণ পথ পিছনে ফেলে ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছে। এর একটি উদাহরণ হল, যে সব বিষয় স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ (ﷻ) নিষিদ্ধ করেছেন তার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, *"...প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপকাজ, অন্যায় ও অসংগত বিদ্রোহ ও বিরোধিতা ..."। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, আল-আ'রাফ:৩৩)*

মুহাম্মদ (ﷺ) এর অন্তর্ধানের পর মুসলিম বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক মেধার এক প্রচন্ড বিস্ফোরণ প্রত্যক্ষ করেছে। এর পিছনে অবদান সেই আসমানীবাণীর যা ইসলামী বিশ্বাস বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজনীয় সব ধরণের জ্ঞানকে মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছে। যে ধর্মে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে সালাত ও বছরের একটি নির্দিষ্ট মাসে সিয়ামকে বাধ্যতামূলক বলে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, তাতে প্রয়োজনের তাগিদে সময় ও ক্যালেণ্ডারে হিসাব রাখার বিষয়টি যে উন্নতি লাভ করবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। একইভাবে যে ধর্মের নিয়ম হল, নির্দিষ্ট শতাংশ উদ্বৃত্ত সম্পদ (যেমন, কৃষিজাত সম্পদ, সোনা ইত্যাদি) অভাবীদের মধ্যে বিতরণ করা, সেখানে হিসাব-গণনার পদ্ধতি (ওজন, পরিমাপ, গণিত ইত্যাদি) উন্নতি লাভ করবে তাও প্রত্যাশিত। আরবী সংখ্যার ব্যবহার, অংকে অভ্যুত্থান ঘটানো সংখ্যা 'শূন্য'র প্রচলন, বীজগণিতকে স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে রূপ দেয়া, এলগরিদম, ওজন মাপক যন্ত্রের উন্নতি সাধন – এ সমস্ত কৃতিত্বের দাবী ইতিহাসে মুসলিমরাই করতে পারে। ১২শ শতকে ইউরোপীয়রা অংকে আরবী সংখ্যা ব্যবহার করতে শুরু করলে আধুনিক পশ্চিমা জগতে আরবী সংখ্যার অনুপ্রবেশ ঘটে। 'শূণ্য'হীন, বড় বড় সংখ্যা লেখার ঝামেলাপূর্ণ রোমান পদ্ধতির বদলে জায়গা করে নেয় সহজ আরবী পদ্ধতির সংখ্যামালা।

ইসলাম ধর্মে প্রতিমা, প্রতিকৃতি তৈরী নিষিদ্ধ। তাই বহু মুসলিম শিল্পী তাদের শৈল্পিক দক্ষতার স্ফুরণ ঘটিয়েছে পাথর, তাঁত আর কাঠের উপর জ্যামিতিক নকশায় 'এরাবেস্ক' নামক অভিনব শিল্পের মাধ্যমে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতির অঙ্গন মুসলিমদের অবদানে সমৃদ্ধ। 'সাইন' আর 'কোসাইন' টেবিল তৈরী হয়েছে, কিউবিক সমীকরণ সংজ্ঞায়িত হয়েছে, দ্বিঘাত সমীকরণের রুট বা মূলসংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে, এভাবে ধীরে ধীরে বিশ্লেষণধর্মী ও সাধারণ ত্রিকোণমিতি প্রসার লাভ করেছে এবং জ্যামিতিক জ্ঞান উন্নত হয়েছে।

স্রষ্টার আসমানী বাণী প্রচারের অভিপ্রায়ে মুসলিম পর্যটক ও ব্যবসায়ীরা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছিল। এছাড়া মক্কায় 'কাবা' (ইব্রাহিম ﷺ নির্মিত ইবাদতের ঘর) এর দিক মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায়ের আদেশ বাস্তবায়িত করার তাগিদে প্রয়োজন দেখা দিল সঠিক দিক নির্ধারণ পদ্ধতির। ফলে ভৌগোলিক নকশা ও দিক নির্দেশক যন্ত্রের উন্নতি বিধান শুরু হল। চুম্বকীয় কম্পাস, অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ হিসাব, আকাশে নক্ষত্রের নকশা এবং এস্ট্রোল্যাব আবিষ্কৃত হল। মানমন্দির স্থাপিত হল, ক্রমে জ্যোতির্বিদ্যা উন্নত বিজ্ঞানে রূপ নিল। সে সময় মুসলিমরা এমন উন্নত কিছু ভৌগোলিক নকশা তৈরী করেছিল যা কয়েক শতাব্দী ধরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।

ইসলাম ধর্মে জ্ঞান অর্জন ও বিস্তারকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। ফলে কাগজ ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব পেতে শুরু করে। আধুনিক বর্ণমালার ভিত্তি যে আরবী কুফী বর্ণমালা তা আবিষ্কৃত হয়েছিল ইউফ্রেটিসের (ফোরাত) তীরে। রেশম পোকার মথ ব্যবহার করে চীনাদের কাগজ তৈরীর পদ্ধতি মুসলিমরা গ্রহণ করেছিল। পরে তারা রেশমের পাশাপাশি কাপড়, কাঠ ও ছিন্ন কাপড় ব্যবহার করে এ কাগজ শিল্পকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এ কাগজ শিল্প ভীষণ উন্নত ছিল এবং এর জন্যে দরকার পড়ত বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার।

যন্ত্রবিজ্ঞান, আলোক ও তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা, জৈব ও অজৈব রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যা, ভূগোল, উদ্ভিদবিজ্ঞান এবং কৃষিবিদ্যা সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বেশ অগ্রগতি ঘটেছিল। প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটেছিল এক্সল, লিভার, পুলি, বাতচক্র (Windmill), পানিচক্র ও দন্তচক্র ইত্যাদি যন্ত্রের এবং বেশ কিছু পদ্ধতির - যেমন, আকরিক থেকে ধাতু বের করে আনার জন্য তাপ প্রয়োগের পদ্ধতি (Calcination), লঘুকরণ পদ্ধতি, পাতন পদ্ধতি, স্ফটিককরণ পদ্ধতি ইত্যাদি। অভিকর্ষের তত্ত্ব ও বায়ুর স্থিতিস্থাপক তত্ত্বসহ অন্যান্য তত্ত্ব উন্নত হয়েছিল। হাসপাতাল তৈরী হয়েছিল এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি ঘটেছিল, যার মধ্যে আছে নতুন নতুন ঔষধ ও শল্যচিকিৎসার নানা পদ্ধতির আবিষ্কার। সে সময় অনুশীলন করা হত শিশু জন্মদানের এমন একটি শল্যচিকিৎসার পদ্ধতি আজ 'Cesarean' নামে অত্যন্ত পরিচিত।

এ সমস্ত আবিস্কার ও অগ্রগতির গুরুত্ব ও প্রসার সম্পর্কে নিজ নিজ ক্ষেত্রের বিশারদদের ভাল জানা আছে। তবে কেউ এ ব্যাপারে আরো গবেষণা করতে চাইলে Islam and Science[102] নামের সংক্ষিপ্ত ও সহজপাঠ্য রচনাটি কাজে আসবে।

পাঠকরা যেন ভুল না বোঝেন এজন্য এখানে বলা প্রয়োজন যে, এ সমস্ত ঐতিহাসিক অবদানের উপর ভিত্তি করে কুরআনের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণের চেষ্টা করা হচ্ছে না। বরং এটাই ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য যে, ইসলাম ধর্মের ইতিহাসে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে কখনও আলাদা করে দেখা হয়নি। যারা মুসলিমদের পশ্চাদপদ জাতি বলে মনে করে, এ আলোচনায় তাদের বোঝা উচিত মুসলিমরা (ইউরোপীয়) রেনেসাঁর অনেক আগে থেকেই সভ্যতা ও প্রযুক্তির শিখরে অবস্থান করছিল। ভিক্টর রবিনসন তার *The Story of Medicine* বইতে লিখেছেন,

> "ইউরোপ যখন অস্তাচলের অন্ধকারে নিমজ্জিত, কর্ডোভা[103]র পথ-ঘাট তখন উজ্জ্বল বাতির আলোয় আলোকিত; ইউরোপ ছিল আবর্জনায় পূর্ণ, আর কর্ডোভায় ছিল জনগণের জন্য হাজার খানেক গোসলখানা; ইউরোপ ঢেকে ছিল পোকামাকড়ে, সেখানে কর্ডোভার লোকেরা প্রতিদিন অন্তর্বাস বদলাতো; ইউরোপ ছিল কর্দমাক্ত, কর্ডোভার পথঘাট ছিল শান-বাঁধানো; ইউরোপের প্রাসাদগুলোর ছাদে ধোঁয়া নির্গমনের জন্যে ফুটো করা হত, আর কর্ডোভার অট্টালিকায় ছিল চমৎকার সূক্ষ এরাবেস্ক জালি; ইউরোপের সম্ভ্রান্তরা পর্যন্ত যেখানে অক্ষর জ্ঞান থেকে বঞ্চিত ছিল, সেখানে কর্ডোভার শিশুরা বিদ্যালয়ে যেত লেখাপড়া শিখতে; ইউরোপের পুরোহিতরা পর্যন্ত খ্রিষ্টধর্মের দীক্ষার পাঠ (Baptismal service) পড়তে জানতো না, এদিকে কর্ডোভার শিক্ষকরা আলেকজান্দ্রিয়ার মত বিশাল পাঠাগার স্থাপন করে ফেলেছিল"।[104]

---

[102] Authored by Shabir Ahmed, Anas Abdul Muntaqim and Abdul-Sattar Siddiq, and published by the Islamic Cultural Workshop, P.O. Box 1932, Walnut, CA 91789; (909) 399-4708.

[103] তৎকালীন মুসলিম অধিকৃত স্প্যানিশ শহর কর্ডোভা একসময় "বিশ্বের রত্ন" (Jewel of The World) হিসেবে পৃথিবীময় সুপরিচিত ছিল।

[104] Robinson, Victor, M.D. 1943. The Story of Medicine. New York; The New Home Library. P. 164.

প্রসঙ্গক্রমে আরো একটি মন্তব্য উল্লেখ করা হল,

"আরবরা সময়ের সাথে সাথে নিয়ম-কানুনের ক্ষেত্রে সুশৃঙ্খল হতে শিখল। তারা লুণ্ঠণ ও ধ্বংসপ্রিয়, রক্তপিপাসু অসভ্য জাতি আর রইল না। বরং জ্ঞানপিপাসু এবং অতীত সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক এক উন্নত জাতিতে পরিণত হল। অন্যান্য জাতির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে এবং সবার মধ্যে নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস ছড়িয়ে দিতে শুরু করল, ফলে বিজয়ী ও বিজিত উভয়ে দ্রুত মিলেমিশে গেল। আর এ মিলমিশের ফলে নতুন এক সভ্যতা জন্ম নিল – সারাসেনিক সভ্যতা। আরব প্রাণশক্তির স্পর্শে প্রাচীন গ্রীক, রোমান ও পার্সী সংস্কৃতি নতুন জীবন পেল এবং আরব মেধা ও ইসলামী চেতনায় সমন্বিত হল। প্রথম তিন'শ বছর (৬৫০-১০০০ সাল) ইসলামী জগত সারাবিশ্বে সবচাইতে সুসভ্য ও প্রগতিশীল ছিল। তারা সুদৃশ্য নগরী, সুরম্য মসজিদ আর সুশৃঙ্খল বিশ্ববিদ্যালয় (যেখানে প্রাচীন বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান সমাদৃত ও সংরক্ষিত হত) নির্মানের মাধ্যমে অন্ধকার যুগের তমসায় ডুবে থাকা পশ্চিমা খ্রিষ্টানদের সাথে লক্ষণীয় বৈপরিত্য বজায় রেখেছিল"[105]।

"নবধারা ও সতেজ প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ আরব মেধা কল্যাণকর জ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটি পালন করেছিল সুষ্ঠুভাবে; যে ধারা এক সময় গ্রীকরা শুরু করে ছেড়ে দিয়েছিল। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রীকদের যদি জনক ধরা হয়, তবে আরবদের বলা যায় পালক-পিতা। তারা উন্মুক্ত মন এবং ব্যাখ্যায় চূড়ান্ত সরলতার পরিচয় দিয়ে দলিল-প্রমাণ লিপিবদ্ধ এবং ব্যপক বিচার-বিশ্লেষণ করেছে। আজকের আধুনিক বিশ্ব জ্ঞানের সেই আলো ও শক্তির উপহার ল্যাটিন সূত্রে লাভ করেনি, করেছে আরবদের মাধ্যমে।....এবং তারা পশ্চিমের চেয়ে প্রায় এক শতাব্দী এগিয়ে থেকে মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন স্থানে জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল, যেমন – বসরা, কুফা, বাগদাদ, কায়রো, কর্ডোভা ইত্যাদি। মসজিদ নির্ভর ধর্মীয় জ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে প্রথমে শুরু হয়ে, পরবর্তীতে

---

[105] Stoddard, Lothrop, Ph.D. 1922. *The New World of Islam.* Second Impression. London: Chapman and Hall, Ltd. p. 3.

এ সমস্ত কেন্দ্রেই বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তৈরী হয়েছিল। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জ্ঞানের আলো শুধু মুসলিম বিশ্বে সীমাবদ্ধ না থেকে সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। পূর্ব কিংবা পশ্চিম, চারিদিক থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে এসে জড়ো হত। বিশেষ করে কর্ডোভায় তো প্রচুর খ্রিষ্টান শিক্ষার্থী ছিল। স্পেইনের সাহচর্যে গড়ে ওঠা আরব দর্শন পরবর্তীতে লক্ষণীয়ভাবে প্রভাবিত করেছিল পশ্চিম ইউরোপীয় চিন্তাধারাকে বিশেষ করে প্যারিস, অক্সফোর্ড আর উত্তর ইটালীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে"[106]।

"নিজস্ব ইতিহাস গ্রন্থ পাঠে অভ্যস্ত অনেক পশ্চিমার বিশ্বাস হল, অতীতের মুসলিমরা ছিল র্বর, অবিশ্বাসী। তাই এ তথ্য জেনে তারা খুব আশ্চর্য বোধ করে যে, মুসলিম পন্ডিতরা আমাদের আধুনিক চিন্তার জগতকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে তাদের বিজ্ঞান, চিকিৎসা, গণিত, ভূগোল আর দর্শন দিয়ে। যে সমস্ত ক্রুসেডার পবিত্র ভূমিতে (জেরুযালেম) মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিতে গিয়েছিল তারাই পরে ইউরোপে ফিরে এসেছে সহমর্মিতা, কাব্য, বীরত্ব, যুদ্ধবিদ্যা এবং রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কে নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা নিয়ে। একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে আমাদের (পশ্চিমা) ধারণা মুসলিম পন্ডিতরা পরিমার্জিত করেছে। তারা ইতিহাস সংরক্ষণকে উন্নত করেছিল এবং গ্রীকদের রেখে যাওয়া অনেক জ্ঞান ইউরোপে ছড়িয়ে দিয়েছিল"[107]।

"জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ফল্গুধারা হিসেবে কুরআনের যে প্রভাব, তা দেখে সত্যি অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। আকাশ-পৃথিবী থেকে শুরু করে মানবজীবন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয় এখানে স্থান পেয়েছে। ফলে এ পবিত্র গ্রন্থের ব্যাখ্যার সূত্র ধরে রচিত হয়েছে বিষয় ভিত্তিক অগণিত প্রবন্ধ ও আলোচনা। এভাবে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনার জন্যে এবং পরোক্ষভাবে মুসলিম বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তারের জন্য কুরআনের অবদান অনস্বীকার্য"[108]।

---

106 Wells, H.G. Volume 2,pp. 708-710.
107 Michener, James A. p. 74.
108 Hirschfield, Hartwig. P. 9.

কুরআনের ব্যাপারে এরকম স্বীকৃতিসূচক মন্তব্যের তালিকা দীর্ঘ। তাই সবগুলো উল্লেখ করে পাঠকদের একঘেঁয়েমিতে না ফেলে, আর একটি মাত্র উক্তি তুলে ধরা হচ্ছে। History of Europe গ্রন্থে থ্যাচার ও শুইলের এ উক্তিটিকে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এইচ. জি. ওয়েল্‌স তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করে এর সত্যতাকে সমর্থন করেছেন,

"তথাকথিত আরবী সংখ্যার উৎপত্তির উৎস কোথায় তা পরিস্কার জানা যায় না। থিওডরিক দ্য গ্রেটের শাসনামলে, বিথিয়াস প্রথম কিছু সংকেত ব্যবহার করেছিলেন যা আজ যে নয়টি সংখ্যা আমরা ব্যবহার করি কিছুটা তার মতন। গার্বার্টের এক ছাত্রও আমাদের সংখ্যার অনুরূপ সংখ্যা ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু ১২শ শতাব্দীতে আরব গণিতজ্ঞ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসা আবিস্কারের আগে পর্যন্ত 'শূন্য'র ব্যবহার আমাদের কাছে অজানা ছিল। ইব্‌ন মুসার আরো অবদান আছে, তিনি সর্বপ্রথম দশমিক ভগ্নাংশ চিহ্ন ব্যবহার করে প্রত্যেকটি সংখ্যার অবস্থানের মান নির্দেশ করেছিলেন। জ্যামিতিতে আরবরা ইউক্লিডের আবিস্কারের উপর খুব বেশী কিছু যোগ করেনি, কিন্তু বীজগণিত (Algebra) মূলতঃ তাদেরই আবিষ্কার। এছাড়া তারা গোলক সংক্রান্ত ত্রিকোণমিতি (Spherical Trigonometry), সমকোণী ত্রিভূজে কোণের বিপরীত দিকের বাহু ও অতিভূজের অনুপাত (sine), স্পর্শক (tangent), কোণপূরকের স্পর্শরেখা (cotangent) আবিষ্কার করেছিল। পদার্থবিদ্যায় তারা সরল দোলক আবিস্কার করেছিল এবং আলোকবিদ্যার (Optics) উপর বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিল। জ্যোতির্বিদ্যাকে (Astronomy) তারা উন্নত রূপ দিয়েছিল। তারা কয়েকটি মানমন্দির নির্মান করেছিল, এবং জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যবহারের জন্যে এমন কিছু যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছিল যার প্রচলন আজো দেখা যায়। তারা হিসাব করে বের করেছিল ক্রান্তিবৃত্ত বা সূর্যের বার্ষিক পরিভ্রমণ পথের কোণ (Angle of the ecliptic) এবং অয়নচলের কোণের (Precession of equinox) মান। জ্যোতিবির্দায় তাদের ব্যাপক জ্ঞান নিঃসন্দেহে লক্ষণীয়।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে তারা গ্রীকদের রেখে যাওয়া কাজের উপর বিশেষ অগ্রগতি সাধন করেছিল। তারা শরীরবিদ্যা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেছে, এবং সে সময়ে তাদের ভেষজবিদ্যা (ঔষধের গুণাগুণ ও প্রয়োগ সংক্রান্ত বিদ্যা) আজকের দিনের মতই উন্নত ছিল। তাদের অনেক চিকিৎসা পদ্ধতি আজো প্রচলিত আছে। তাদের শল্যচিকিৎসকরা এনাস্থেশিয়া বা অচেতন করার প্রক্রিয়া জানত এবং এভাবে তারা বেশ কিছু জটিল অপারেশন সফলতার সাথে করেছে। যে সময় ইউরোপের গীর্জাগুলো চিকিৎসার অনুশীলনকে নিষিদ্ধ করেছিল, চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ-নিরাময় গীর্জার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ধর্মীয় প্রথায় ব্যঘাত ঘটাবে এ আশঙ্কায়। অথচ সেই একই সময় আরবরা চিকিৎসাকে উন্নত বিজ্ঞানে পরিণত করেছিল। রসায়নে তাদের সূচনা ছিল অভিনব। তারা অনেক নতুন নতুন রাসায়নিক উপাদান আবিষ্কার করেছিল যেমন, এলকোহল, পটাশ, সিলভার নাইট্রেট, ঊর্ধ্বপাতিত ক্ষয়িষ্ণু দ্রব্য, নাইট্রিক ও সালফিউরিক এসিড।....শিল্পে তারা সারা বিশ্বকে হারিয়ে দিয়েছিল তাদের নান্দনিক নকশা ও কারিগরী দক্ষতায়। সোনা, রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ, লোহা এবং ইস্পাত – সবরকম ধাতুর উপর তারা কাজ করেছে। বয়ন শিল্পে তাদেরকে কখনও কেউ অতিক্রম করতে পারেনি। তারা অসাধারণ গুণসম্পন্ন কাঁচ ও মৃৎশিল্প উৎপন্ন করেছে। কাপড় রঞ্জিত করার গোপন তথ্য তাদের জানা ছিল। এছাড়া তারা কাগজও তৈরী করেছে। চামড়া প্রস্তুত করার নানা প্রক্রিয়া তারা জানত, সারা ইউরোপে তাদের এ কাজ ভীষণ জনপ্রিয় ছিল। তারা উৎপন্ন করত ভেষজ রঙ্গীণ আরক, সুগন্ধি এবং সিরাপ। আখ থেকে চিনি তৈরী করত, আর বানাত নানা ধরণের পানীয়। বৈজ্ঞানিক পন্থায় জমি চাষ করত এবং ব্যবহার করত উন্নত পানি-সেচ পদ্ধতি। তারা সার ব্যবহারের গুরুত্ব বুঝত এবং মাটির গুণাগুণের সাথে মিল রেখে শষ্যকে উপযোগী করে তুলত। উদ্যানবিদ্যাতেও তারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল এবং বৃক্ষের কলম পদ্ধতি অনুশীলন করে বৈচিত্রময় ফুল-ফল উৎপাদন করত। তারা প্রাচ্য থেকে নানা রকম গাছপালা পশ্চিমা জগতে আমদানী করেছে। কৃষিপদ্ধতির উপর অনেক গবেষণামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় তারা তাদের অসামান্য অবদান রেখে গেছে"।

মানবজাতির বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ক্ষেত্রে কাগজ উৎপাদনের ভূমিকা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা সবাই উপলব্ধি করতে পারে। আরবরা সম্ভবতঃ চীনাদের কাছ থেকে এর উৎপাদন পদ্ধতি শিখে মধ্যএশিয়া অতিক্রম করে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ইউরোপীয়রা আবার আরবদের কাছ থেকে তা পেয়েছে। এর আগে বই-পত্র লেখা হত পশুর চামড়া অথবা প্যাপিরাসের উপর। আরবরা মিশর জয় করে নেওয়ার পর ইউরোপ প্যাপিরাসের সরবরাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল। কাগজ পুনরায় সহজলভ্য না হলে মুদ্রণশিল্প খুব সামান্যই অগ্রসর হত। আর সেই সাথে খবরের কাগজ ও বইপত্রের মাধ্যমে জনশিক্ষার প্রসার হয়ে পড়ত প্রায় অসম্ভব। অন্ধকার যুগে ইউরোপের পিছিয়ে থাকবার পিছনে এ সমস্ত কারণের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব থেকে থাকবে – এ ব্যাপারটি স্বীকার করতে ঐতিহাসিকদের কেন যেন ভীষণ অনীহা..."[109]।

এতক্ষণের আলোচনায় ইসলামী বিশ্বে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়ার কথা। এবার এ অধ্যায়ের আসল বক্তব্যে ফিরে আসা যাক। কুরআনের আসমানী উৎসের প্রমাণ হিসেবে মুসলিমরা কুরআনের কিছু আয়াত বেশ আগ্রহের সাথে পেশ করে থাকে। এ সমস্ত আয়াতে মানবপ্রকৃতি থেকে শুরু করে যে মহাবিশ্বে মানুষের বসবাস তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তুলে ধরা হয়েছে। ১৪০০ বছর ধরে রহস্যাবৃত থাকার পর সম্প্রতি আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে এ সব আয়াতের বিষয়বস্তু প্রমাণিত হয়েছে।

মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে এমনি কিছু মনোমুগ্ধকর আয়াতে কুরআন সমৃদ্ধ এবং এ নিয়ে ইতোমধ্যে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ডঃ মরিস বুকাইলের সাম্প্রতিক রচনা "The Bible, The Qur'an and Science"[110]। এছাড়া ইসলামী বইয়ের দোকানের শেল্‌ফে এ বিষয়ের উপর প্রচুর বইপত্র উপচে পড়ছে। আর ইন্টারনেটে তো নিত্য নতুন সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল আসছেই।

---

[109] Wells, H.G. Volume 2, pp. 710-712.

[110] ধর্ম ও বিজ্ঞানের মাঝে গভীর সম্পর্ক সংক্রান্ত তথ্য দানে বইটি উপকারী হলেও, ডঃ মরিস বুকাইল ইসলামিক জ্ঞানের কিছু জরুরী শাখার ব্যাপারে বিরোধীতাপূর্ণ মতের পরিচয় দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ হাদীসের প্রামাণিকতা ও বিশুদ্ধতা এবং মুহাম্মদ (ﷺ) এর মর্যাদা সম্পর্কে তার মতামত, কোন কোন স্থানে স্পষ্টতঃই যথার্থ নয়।

কুরআনের এ সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ উপস্থাপন করার পর যারা বাস্তবসম্মত আলোচনার অনধিকার প্রবেশের সম্ভাবনাকে অন্য চোখে দেখে তারা চোখ পাকিয়ে দাবী করে যে 'আমাদের গ্রন্থেও এরকম অনেক আসমানী ভবিষ্যদ্বাণী আছে'। এক্ষেত্রে দু'টি বিষয় বিবেচ্য। প্রথমটি হল, এ দাবী কতখানি সত্য তা পরীক্ষা করে দেখা, আর দ্বিতীয়টি – একটি সহজ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য হওয়া আর তা হল, (হলোই বা সত্য) তাতে কী হয়েছে?'

বাইবেলকে যদি আসমানী উৎসের প্রমাণে ভরপুর ধরা হয় তবে মনে কৌতুহল জাগে যে, স্রষ্টার উদ্ধৃতি দিয়ে কেন বলা হয়েছে যে, তিনি সৃষ্টির উপর আলো বর্ষণ করেছিলেন নক্ষত্র সৃষ্টি করারও তিন দিন আগে (জেনেসিস ১:৩-৫ চরণের সাথে জেনেসিস ১:১৪-১৯ মিলিয়ে দেখুন)? অদৃশ্য জগতের সম্ভাবনার সীমা মানুষের কল্পনার বাইরে। কিন্তু আলোর প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের সাধারণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বলে যে, আলোর অস্তিত্বের জন্যে দায়ী যে ফোটন তা বিচ্ছুরণের জন্যে কোন না কোন উৎস অবশ্যই থাকতে হবে। একইভাবে কেউ যুক্তিসঙ্গতভাবে কৌতুহল প্রকাশ করতে পারে যে, পৃথিবী সৃষ্টির দুই দিন (জেনেসিস ৯-১৩) আর সূর্য সৃষ্টির তিনদিন আগে (জেনেসিস ১৪-১৯) কিভাবে সকাল ও সন্ধ্যা ঘটা সম্ভব (জেনেসিস ১:৩-৫)? সূর্য উদয় ও অস্ত যাবার জন্যে কোন দিগন্ত যেখানে নেই, এমনকি স্বয়ং সূর্যই যেখানে অস্তিত্ব লাভ করেনি সেখানে কেমন করে সকাল আর সন্ধ্যা হবে? বাইবেলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পশু সৃষ্টির এক দিন আগে, পঞ্চম দিনে পাখীরা সৃষ্ট হয়েছিল। অথচ বিজ্ঞানীদের ফসিল গবেষণার ফলাফল এর বিপরীত তথ্য তুলে ধরেছে। বাইবেলে উল্লেখিত বিভিন্ন ব্যক্তির বংশতালিকার উপর ভিত্তি করে ইহুদীরা কাল বা সময় গণনা করে। সেই গণনা অনুযায়ী (২০০০ সালে) দাবী করা হয়েছে যে, পৃথিবী ৫৭৬১ বছরের পুরনো। সৌরজগত প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন বছর ধরে অস্তিত্বশীল এবং পৃথিবীর বুকে মানুষের আদি পদচারণা যেখানে শত সহস্র বছরের পুরোন (পিকিং মানব, জাভা মানব ও ল্যানটিয়ান মানবের ফসিল ৪,০০,০০০ থেকে ১০,০০,০০০ বছরের পুরোন) সেখানে এ হিসাব বৈজ্ঞানিক তথ্য অগ্রাহ্য করে। বিশ্বব্যাপী বন্যা হয়েছিল বাইবেলের তথ্য অনুযায়ী ইব্রাহীম (ﷺ) এর তিন'শ বছর আগে, অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব ২১শ কিংবা ২২শ শতাব্দীতে। বাইবেলের এ তথ্য সত্যি হলে অবশ্যই বলতে হয় যে, সে সময় ব্যাবিলনের উরে (Ur) গড়ে ওঠা

তৃতীয় রাজবংশ এবং মিশরের ১১তম রাজবংশ এ বিশ্বময় বন্যার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিল। কারণ ইতিহাসের পাতায় এ দুই রাজবংশের উপর বন্যার কোন প্রভাব দেখা যায় না। বোঝা যাচ্ছে যে, বিশ্বময় বন্যার ব্যাপারে বাইবেলের সময় হিসাব নিয়ে চিন্তাভাবনার অবকাশ আছে।

যাহোক এ সবকিছু একপাশে সরিয়ে রেখে, আলোচনার খাতিরে যদি ধরে নেয়া হয় যে, বাইবেলের বর্ণনা কিছুটা বিজ্ঞান পাঠাগার আর কিছুটা ২৫শ শতকের Farmers' Almanac [111] পত্রিকার মিশ্রণ, তারপরও কিন্তু, "তাতে কী হয়েছে?' প্রশ্নের চ্যালেঞ্জ কিন্তু থেকেই যায়। ইসলাম ধর্মে স্বীকার করা হয় যে, ইহুদী ও খ্রিষ্টান উভয় ধর্মের সূচনা হয়েছিল আসমানী গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে। আরো বলা হয় যে, পুরাতন ও নতুন বাইবেলের উপর প্রতিষ্ঠিত এ দু'টি ধর্মই একজন শেষ নবীর আগমনের প্রতীক্ষায় আছে, কেননা তাদের ধর্মগ্রন্থে তাঁর আগমনের পূর্বাভাস দেয়া আছে। সুতরাং 'কোন্ ধর্মটির ভিত্তি ওহীর উপর' এ প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং প্রশ্ন দাঁড়ায় – কোন্‌টি সবশেষে অবতীর্ণ আসমানী ধর্ম? এবং কোন্ ধর্মটি সময় ও মানুষের হস্তক্ষেপে বিকৃতির শিকার হওয়া থেকে নিস্তার পেয়েছে? এ রকম একটি ধর্ম যদি মানুষের কাম্য না হয় তবে আর কোন্‌টি হবে?

এখন ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের জন্যে চ্যালেঞ্জ হল, কুরআনকে এ প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দেয়া। এ ব্যাপারে প্রচুর চেষ্টা চালানো হয়েছে, কিন্তু কুরআনের মাত্র একটি সুরাহ্‌র সমকক্ষ রচনা করার চ্যালেঞ্জ আজ পর্যন্ত সাফল্যের মুখ দেখেনি। মুসলিমদের দৃঢ় বিশ্বাস, কখনও তা দেখবেও না।

এ প্রসঙ্গে সতর্কতা হিসেবে একটি ব্যাপার উল্লেখ করা দরকার। আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রচেষ্টায় মানুষ ধর্মীয় আবেগে অনেক সময় সাধারণ জ্ঞানের সীমা লঙ্ঘন করে ফেলে। কুরআনের কিছু আয়াত আছে যেগুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখনও পর্যন্ত অস্পষ্ট। এগুলো নিয়ে আরো গবেষণা করার অবকাশ আছে।

---

[111] ১৮১৮ সাল থেকে প্রকাশিত Farmers' Almanac উত্তর আমেরিকার সাময়িক পত্রিকা। এ পত্রিকাটি অন্যান্য বিষয় সহ আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত উপাত্ত-তথ্য সরবরাহের জন্য প্রসিদ্ধ। - (অনুবাদক)

সুতরাং এ সমস্ত আয়াতের সত্যিকার অর্থ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে এগুলোর বৈজ্ঞানিক অর্থ ব্যাখ্যা করতে যাওয়া কিছুটা বিচক্ষণহীনতার পরিচায়ক হবে, তা সে ব্যাখ্যা কুরআনের সমর্থনে কিংবা বিপক্ষে যা-ই হোক না কেন। এ সব আয়াত সম্পর্কে সবচেয়ে বিবেচক মন্তব্য হল, এগুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও অর্থ এখনও অজানা বলে এগুলোকে উদাহরণ হিসেবে ধরে কুরআনের স্বপক্ষে বা বিপক্ষের প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানোর প্রয়াস ঠিক নয়। কালের আবর্তনে মানুষের জ্ঞানের উন্নতির ফলে হয়ত এ আয়াতগুলোর সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এক সময় মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব হবে। ততদিন পর্যন্ত এগুলোর অর্থ বিজ্ঞানের কাছে অজানা থাকবে। এরকমই একটি আয়াত কুরআনের সত্তর নম্বর সুরাহ্'র চতুর্থ আয়াতটি, যার অনুবাদ হল এরকম,

"ফেরেশতা এবং রূহ (জিবরাঈল আঃ) তাঁর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন এক দিন যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান"। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, মা'আরিজ:৪)

কোন কোন মুসলিমের কাছে মনে হয়েছে, এ আয়াত "আপেক্ষিকতার তত্ত্ব" (Theory of Relativity) এর সাথে সম্পর্কিত, এবং হতেও পারে তা সত্যি। আবার সত্যি না-ও হতে পারে। "আপেক্ষিকতার তত্ত্ব" অনুযায়ী গতির আপেক্ষিক দু'টি ভিন্ন ভিন্ন অপ্রতিরোধী অবস্থার প্রেক্ষাপটে সময়, আয়তন ও ভর পরিবর্তিত হয়। অন্য কথায় একটি স্থির ও একটি চলমান পর্যবেক্ষকের কাছে সময়, আয়তন ও ভরের প্রত্যক্ষণ বিভিন্ন মনে হবে। আজকের যুগে মানুষ যে গতিতে চলাফেরা করে,তাতে প্রত্যক্ষণের এ পার্থক্য খুবই তুচ্ছ। যদি এমন হয় কেউ তার ২,৮০০ সালের মডেলের ফোর্ড গাড়ীটিকে বদলে আলোর গতির কাছাকাছি নিয়ে যেতে সক্ষম হল তবে, প্রত্যক্ষণের এ পার্থক্য লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে। মহাশূন্যচারী এবং একজন স্থির পর্যবেক্ষক সেক্ষেত্রে একই পৃথিবীর দুটি ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবে।

"আপেক্ষিকতার তত্ত্বের" এ বিশেষ দর্শন অনুযায়ী, গতি যখন আলোর বেগের (৫.৮৮ X ১০ ১২ মাইল/বছর) সমান হয় তখন সময়ের প্রত্যক্ষণ ধীরগামী ও মন্থর হয়ে যায়, আয়তন কমে যায় এবং ভর বেড়ে যায়। আপেক্ষিকতার তত্ত্বের ব্যাখ্যা অধিকাংশের কাছে কঠিন মনে হয়। আলবার্ট আইনস্টাইন 'লরেন্জ

ট্রান্সফর্মেশন' নামের গাণিতিক সমীকরণটি ব্যবহার করে – স্থির ও গতিশীল, দু'টি ভিন্ন ভিন্ন পর্যবেক্ষকের সময় ও মহাশূন্যের দু'টি ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষণের মধ্যে সম্পর্ক তুলে ধরেছেন। সময়ের সাপেক্ষে গাণিতিক সমীকরণটি এরকম,

$$t' = (1 - v^2/c^2)^{-1/2} (t - vx/c^2)$$

যেখানে,
v = অতিক্রান্ত বেগ
c = আলোর বেগ (৫.৮৮ x ১০^{১২} মাইল/বছর)
x = মহাশূণ্যে অবস্থান ($x^2 = c^2 t^2$ সমীকরণ দ্বারা সংজ্ঞায়িত)
t' ও t হল সময়ের দু'টি ভিন্ন প্রত্যক্ষণ

উল্লেখিত আয়াত থেকে সংখ্যাগুলো তুলে এনে সমীকরণে বসিয়ে দেয়া যাক। t ' এর মান ৫০,০০০ বছর এবং t কে একটি মাত্র দিন ধরলে ((২.৭৩৯৭ x ১০-৩ বছর) সাধারণ বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিতে v এর মান আসে আলোর সত্যিকার বেগের থেকে প্রায় চুল পরিমাণ কম, অর্থাৎ খুবই সামান্য পার্থক্য। সত্যিই v এর মান আলোর বেগের এত কাছাকাছি আসে যে সাধারণ ক্যালকুলেটরে v /c এর মান শেষ দশমাংশ পর্যন্ত গণনা করা সম্ভব না।

কুরআনের সাথে কিভাবে তা সম্পর্কিত? কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী মানুষ সৃজিত হয়েছে মাটি থেকে, জ্বিন আগুন থেকে আর মালাইকারা (ফেরেশতারা) আলো থেকে। এখন কারো কারো মতে, পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে "আপেক্ষিকতার তত্ত্ব" (Theory of Relativity) অনুযায়ী সময়ের ভিন্নধর্মী প্রত্যক্ষণই শুধু পেশ করা হয়নি, সেই সাথে আরো বলা হয়েছে যে, মালাইকারা যা থেকে সৃষ্ট হয়েছে (অর্থাৎ আলো) তার গতিতে চলাফেরা করে। যেভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা বিশ্বাসযোগ্য ও চমৎকার, এমনকি তা সত্যি হবার সম্ভাবনাও আছে। কিন্তু এটাই যে আলোচ্য আয়াতের সুনিশ্চিত অর্থ,এ কথা দাবী করা দুঃসাহসী কল্পনার মত।

"তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর একদিন সব কিছুই তাঁর সমীপে সমুত্থিত হবে যে দিনের পরিমাপ হবে তোমাদের হিসেবে হাজার বছরের সমান"।
(ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, সাজদাহ্:৫)

উল্লেখিত আয়াত দু'টি (মা'আরিজ: ৪ এবং সাজদাহ্:৫)একে অপরের বিরোধিতা করছে এ দাবী ঠিক নয়, কেননা দু'টি আয়াতের বিষয়বস্তু ও পরিপ্রেক্ষিত সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুসলিমদের সাধারণ উপলব্ধি হল যে, প্রথম আয়াত মালাইকা (ফেরেশতা) ও রূহের (জিবরীল ﷺ) আরোহণ নিয়ে আলোচনা করেছে। অন্যদিকে দ্বিতীয় আয়াতটি করেছে মহাবিচারের দিন নিয়ে। যে দিন সমস্ত বিষয় বিচারের জন্যে আল্লাহ (ﷻ)র কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।[112]

যারা ভিন্ন অর্থবোধক এরকম দু'টি আয়াতের মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করে এদের পরস্পরের অর্থে বিরোধিতা প্রমাণের চেষ্টা করে, তাদের এ দাবী এক রকম হাস্যকরই বটে। বৈজ্ঞানিক দলিল-প্রমাণ বিশ্লেষন করার জন্য বস্তুনিষ্ঠ হওয়া এবং অকাট্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত। মুসলিম গবেষকদের যেমন উচিত অনুমানের সীমা অতিক্রম না করা, তেমনি অমুসলিম সমালোচকদেরও উচিত ত্রুটিপূর্ণ যুক্তি-তর্ক পরিহার করে চলা। তাছাড়া ইসলামের সমালোচকদের উপলব্ধি করা উচিত যে, কোন নির্দিষ্ট আয়াতে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অভাব থাকলেই সেই আয়াতটির গ্রহণযোগ্যতা বাতিল হয়ে যায় না। কুরআনের এমন অনেক আয়াত আছে যেগুলো সুদীর্ঘ ১৩০০ বছর ধরে প্রামাণিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। কেবলমাত্র ১৯শ ও ২০শ শতকে বিজ্ঞান যখন উন্নত হয়েছে, তখনই এগুলোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রমাণিত হয়েছে। কোন কিছুকে প্রামাণিক দলিল হিসেবে ধরা না গেলে তা প্রমাণের ঘাটতি বুঝায়, সত্যের ঘাটতি বুঝায় না। ফলে কোন দাবীকে তখনই অগ্রাহ্য করা যায় যখন তা বিপরীত কোন সত্যের পরিপন্থী প্রমাণিত হয়। সেক্ষেত্রে সেটাকে শুধুই অনুমান ও প্রচলিত সংস্কার বলে মেনে নিতে হয়। আর এ ব্যাপারটিই পবিত্র কুরআনে লক্ষ্যণীয়ভাবে অনুপস্থিত। ঠিক যেরকম উপরে বলা হল, পুরাতন ও নতুন বাইবেলের একটি কি দু'টি চরণ আমাদের পরিচিত জাগতিক সত্যের সাথে অসামন্জস্যপূর্ণ অথবা ঐ গ্রন্থেরই অন্য কোন চরণের সাথে বিরোধিতামূলক। ঘটনা যাই হোক উভয় ক্ষেত্রে (পুরাতন ও নতুন বাইবেল) এটাই স্পষ্ট হয় যে, বর্তমানে এ গ্রন্থগুলোর যে নমুনা আমরা দেখছি সেগুলোর রচয়িতা কোন আসমানী সত্তা নয়। অন্যদিকে কোন গ্রন্থে এরকম কোন ত্রুটি বা অসামন্জস্যতা খুঁজে পাওয়া না গেলে ভিন্ন একটি সম্ভাবনার কথা মনে উদিত হয়। আর সত্যি বলতে কুরআন নিজেই চ্যালেঞ্জ করেছে,

---

112 ইবন আব্বাস (Σ) এর তাফসীর অনুযায়ী।

"তারা কেন কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? আর যদি ওটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট হতে হত তবে তারা ওতে বহু গরমিল পেতো"। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, আন-নিসা:৮২)

বাইবেলে যে রকম অনেক উক্তি আছে যেগুলো প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক অথবা বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে বিরোধিতাপূর্ণ, সেরকম কিছু কুরআনের বেলায় খুঁজে বের করার চেষ্টা পন্ডশ্রম হবে। মুসলিমরা বেশ দৃঢ়তার সাথে দাবী করে যে, এরকম বিরোধিতাপূর্ণ কোন বক্তব্য কুরআনে নেই। কারণ কুরআন শুধু বিজ্ঞান নয় বরং সমস্ত মানব জ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ – ঠিক যেমনটি স্রষ্টার আসমানী গ্রন্থ থেকে প্রত্যাশা করা যায়। এ দাবী বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করে যখন কুরআনের বিভিন্ন তথ্যের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। এরকম তথ্য-প্রমাণ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করার সুযোগ এ বইতে নেই, তবে সংক্ষেপে কিছু কিছু দিকের উপর আলোকপাত করা যায়। যারা এ বিষয়টি নিয়ে আগ্রহী তাদের জন্যে দু'টি বই হল, ডঃ মরিস বুকাইলের লেখা *The Bible, The Qur'an and science* এবং ডঃ মীর আনিস উদ্দীনের লেখা *The Universe Seen Through The Quran (Scientific findings confirmed)*। এছাড়া ইসলামী বইয়ের দোকানে আরো অনেকের লেখা ছোট ছোট নিবন্ধ পাওয়া যায়। ইসলামী দাওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত *"A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam"*[113] প্রাথমিক পর্যায়ে জানার জন্যে বেশ তথ্যবহুল একটি পুস্তক।

ভূতত্ত্ব (Geology)

আরব বেদুইনের কাছে 'পাহাড়-পর্বত' এ সমতল পৃথিবীর বুকে নেহায়েতই এক ঝামেলার বস্তু। কাফেলার যাত্রী, কৃষক, পর্যটক আর মুহাম্মদ (ﷺ) এর যুগের মেষপালকের কাছে পাহাড়-পর্বত সুবিধার চেয়ে অসুবিধা তৈরী করে বেশী। তাই অধিকাংশের কাছে পাহাড়-পর্বত নিয়ে চিন্তাভাবনা কিছুটা যেন অদ্ভুত, আরো

---

113 সম্পূর্ণ বইটি ইন্টারনেটে আছে http://www.islam-brief-guide.org ওয়েবসাইটে। এছাড়া বইটি পাওয়া যাবে এ ঠিকানায়, The Islamic Foundation of America, P.O. Box 3415, Merrifield, VA 22116, USA, Tel.: (703) 914-4982, e-mail: ifam@erols.com

বেশী অদ্ভুত এর উপকারী দিক খুঁজবার চেষ্টা করা। এমনকি আজকের যুগেও হাতে গোণা অল্প কিছু সংখ্যক মানুষকে এ নিয়ে গবেষণা করতে দেখা যায়। আর এর গুরুত্ব ও উপকার নিয়ে লেখালেখি করেছে এমন লোকের সংখ্যা তো আরো কম। পায়ে হেঁটে পর্বতাভিযান, উল্লাসময় স্কী, মসৃন পাহাড়ের ঢালে আনন্দময় বনভোজন আর আমোদ-প্রমোদের বাইরে পাহাড়ের যে আরো কোন উপকার আছে তা অনেকেই ভাবেন না। সন্দেহ নেই যে, বিস্তৃত সমতলে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়ানো ছিটানো উঁচু-নীচু পাহাড় দৃষ্টির একঘেঁয়েমি কাটায়, কিন্তু বেদুইনদের মনে এরকম আনন্দময় বিলাসিতা খুব একটা আবেদন সৃষ্টি করে না। কারণ পাহাড়ের উপস্থিতিতে তাকে বাধ্য হতে হয় কাফেলা নিয়ে অনেকখানি পথ ঘুরে যাবার ঝামেলা পোহাতে, পাহাড়ের খাড়া অমসৃন গায়ে শষ্যভূমি তৈরী করতে অথবা হারানো মেষ খুঁজবার জন্যে পাহাড়ের বিপদজনক চড়াই-উৎড়াই অতিক্রম করতে।

মাত্র কিছুদিন আগে আধুনিক ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান পাহাড়ের আসল গুরুত্ব আবিষ্কার করেছে। মানুষ জানতে পেরেছে যে, পাহাড়েরও মূল বা শিকড় আছে। ট্যারবাক (Tarbuck) ও লুটজেন্স (Lutgens) এর উক্তি, "(পাহাড়ের) এ সমস্ত মূলের অস্তিত্ব ভূ-কম্পন ও অভিকর্ষজ উপাত্ত থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে"[114]। একটি তিন থেকে চার মাইল উঁচু পাহাড় সাধারণত পৃথিবী-পৃষ্ঠের নীচে ত্রিশ থেকে চল্লিশ মাইল দীর্ঘ শিকড়ের অধিকারী[115]। দন্ডাকার এ শিকড় বিশাল পাহাড়ের অকল্পনীয় ভার বহন করতে সাহায্য করে, এবং এভাবে ভূতত্ত্ববিদদের পরিভাষায় Isostasy বা ভূমির ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে[116]। সুতরাং খালি চোখে মানুষ ভূপৃষ্ঠের উপর পর্বতের যে অংশ দেখে থাকে তা প্রকৃতপক্ষে এর সম্পূর্ণ অংশের তুলনায় খুবই সামান্য। চল্লিশ মাইল দীর্ঘ শিকড় খাড়াভাবে কঠিন ভূত্বকের নীচে কোমল asthenosphere স্তর[117] পর্যন্ত দৃষ্টির অন্তরালে প্রোথিত আছে, অনেকটা

---

[114] Tarbuck, Edward J. and Frederick K. Lutgens. 1982. *Earth Science.* 3rd ed. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company. p. 157.

[115] Tarbuck, Edward J. and Frederick K. Lutgens. 1982. *Earth Science.* 3rd ed. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company. p. 157.

[116] Cailleux, Andre. p. 222.

[117] পৃথিবীর বাইরের শক্ত ভূত্বক (Lithosphere) অপেক্ষাকৃত কোমল-এ Astheosphere স্তরের উপর ভাসমান অবস্থায় আছে। - অনুবাদক

কাঠের খণ্ডে উঁচু হয়ে থাকা পেরেকের মাথার মত কিংবা খাড়া কীলক বা গোঁজের মত। এ তথ্যের সাথে এবার কুরআনে পাহাড়ের বর্ণনায় যে শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে তা মিলিয়ে দেখুন,

"আমি কি পৃথিবীকে বিছানা বানিয়ে দেইনি? ও পাহাড়সমূহকে পেরেকরূপে গেড়ে দেইনি?" (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, নাবা:৬, ৭)

সম্প্রতি ভূতত্ত্ব বিশারদরা ধারণা করছেন যে, ভূমির স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য রক্ষায় পাহাড়-পর্বতের অবদান রয়েছে। কারণ দেখা গেছে পর্বতগুলো সাধারণত মহাদেশীয় স্তরের (Continental plates) সংযোগস্থলগুলোতে অবস্থিত, যেন দুটি মহাদেশীয় স্তরের মধ্যে সংযোজকের ভূমিকা পালন করছে। এ ধরণের সংযোজকের উপস্থিতি না থাকলে ভূত্বকের (Lithosphere) সংঘর্ষশীল স্তরগুলো একটি অপরটির উপর উঠে যেত, ফলে ঘন ঘন ভূমিকম্প হত। ভূগর্ভের পুঞ্জিভূত চাপ মাঝে মাঝে ফাটলের মধ্য দিয়ে বের হয়ে আসবার ফলে ভূমির স্তরের (Continental plates) যে স্থান পরিবর্তন ঘটে তাতে কখনও কখনও এরকম ভূমিকম্প ঘটতে দেখা যায়। সবকয়টি পর্বত যেহেতু এরকম সংঘর্ষশীল অঞ্চলের প্রতিনিধি, তাই পর্বত সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গেলে পৃথিবীর সমতল ভূমি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলত আর আমরা পেতাম এক সদাকম্পমান ধরণী। ২০শ শতাব্দীর শেষের দিকে মহাদেশীয় স্তর সম্পর্কে গবেষণার পরই কেবল এ সমস্ত জ্ঞান মানুষের করায়ত্ব হয়েছে। সুতরাং সারকথা হল, পাহাড়-পর্বতের ভারসাম্য রক্ষাকারী ভূমিকা না থাকলে পৃথিবী পৃষ্ঠ সারাক্ষণ আন্দোলিত অবস্থায় থাকত। মূল্যবান এ তথ্যটি আধুনিক ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের একটি সাড়া জাগানো আবিষ্কার বলে মনে করা হয়। অথচ চৌদ্দ'শ বছরের পুরোন একটি গ্রন্থে এ তথ্যই অত্যন্ত সহজ ভাষায় এসেছে,

"আর তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয়..."। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, নাহ্‌ল:১৫)

বিশ্বসৃষ্টি (Creation of the Universe)

বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে অন্যতম অবিতর্কিত তত্ত্ব হল,সমস্ত বিশ্বজগত সৃষ্টি হয়েছে গ্যাস ও পদার্থের ক্ষুদ্র কণিকার সমন্বয়ে গঠিত উত্তপ্ত ও ধোঁয়াটে এক মিশ্রণ থেকে।[118]

---

[118] Weinberg, Steven. 1988. The First Three minutes, A Modern View of the Origin of the Universe. Basic Books; Harper Collins Publishers. Pp. 101-121.

এভাবে আজো নতুন নতুন নক্ষত্র জন্ম নিতে দেখা যায় গ্যাসীয় নেবুলার (মনে করা হয় যে, এগুলো আদি ধোঁয়াটে পিন্ডের অবশিষ্টাংশ) কেন্দ্রে।

এ প্রসঙ্গে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে,

"অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধুম্র বিশেষ। অনন্তর তিনি ওটাকে ও পৃথিবীকে বললেন: তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়..."। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, হা-মীম-আস্‌সাজদাহ্:১১)

আয়াতে মূল ধুলার মেঘ থেকে সৃষ্ট আকাশমন্ডলীকে "ধুম্র" হিসেবে বর্ণনা করা যথার্থ হয়েছে। এক্ষেত্রে "মেঘ" শব্দটির বদলে "ধুম্র" শব্দটি আরো বেশী স্থানোপযোগী। কারণ মেঘ শব্দটি আমাদের মনে সাধারণত অপেক্ষাকৃত শীতল এবং স্থিতিশীল কোন বস্তুর ভাব তৈরী করে। অন্যদিকে "ধুম্র" বা ধোঁয়া বলতে ভাসমান কণায় পরিপূর্ণ কোন ঘূর্ণায়মান, উত্তপ্ত গ্যাসীয় পদার্থ বোঝায়। মহাশূন্যে গ্যালাক্সির অবস্থা পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করতে যেয়ে বিজ্ঞানীরা ঠিক এরকমই চিত্র আবিষ্কার করেছে। উপরের আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে – *"তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়..."*। বিভিন্ন পদার্থের কণাগুলো পুঞ্জিভূত হয়ে যেভাবে ঘন ও ভারী একটি বস্তু তৈরী হয়েছিল তা বিবেচনা করলে এ বর্ণনাটিও যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তা বোঝা যায়। এ প্রচণ্ড ঘন ও ভারী কেন্দ্রীয় বস্তুটির বিস্ফোরণের ফলেই 'বিগ ব্যাং' এর উদ্ভব হয়ে থাকবে। যার পরিণামে সম্প্রসারণশীল এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি। এ প্রসঙ্গে কুরআনের আরো একটি আয়াত,

"যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ওতপ্রতোভাবে, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম...?" (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, আম্বিয়া:৩০)

বিশ্বজগত সৃষ্টি, বিশেষ করে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির অভিন্ন উৎস বিষয়ক মতবাদের জন্ম বিংশ শতাব্দীতে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে, ১৯২০ সালে আলেকজান্ডার ফ্রীডম্যান (Alexander Friedmann) এবং এ্যাব জর্জ লেমেয়াত্‌র (Abbé Georges Lemaître) বিগ ব্যাং মতবাদটি প্রস্তাব করার পর, এখন পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত একমাত্র মতবাদ হল ১৯৪০ সালে জর্জ গ্যামো (George Gamow) এবং তার সহকর্মীদের উদ্ভাবিত সৃষ্টিতত্ত্ব (creationist theory)।

এ পর্যবেক্ষণ অনেক বিরোধী মতবাদকে বিশ্লেষণের জন্য চ্যালেঞ্জের ময়দানে টেনে আনে। এদের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে - যদি 'বিশ্বজগত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার' তত্ত্ব ১৯২০ সালের আগে পর্যন্ত মানুষের চিন্তায় স্থান না পেয়ে থাকে, তাহলে এটা সত্যিই অসাধারণ কাকতালীয় ঘটনা বলতে হবে যে, এর ১৩০০ বছর আগেই কোন মানুষের মাথায় 'বিগ ব্যাং' এর মত বৈপ্লবিক চিন্তাটি মাথায় এসেছিল। বিগ ব্যাং মতবাদটি (অথবা আজকাল যেমন বলা হচ্ছে, "উত্তপ্ত বিগ ব্যাং" - ০.০০০১ সেকেন্ডে এর উষ্ণতা হিসাব করা হয়েছে $১০^{৩২}$ ডিগ্রী কেলভিন) প্রস্তাব করার মত উন্নত প্রযুক্তিগত যে জ্ঞানের প্রয়োজন পড়ে তা চিন্তা করলে সেটা আরো বেশী হতবুদ্ধিকর মনে হয়।

'বিগ ব্যাং' তত্ত্বটি দু'টি ধারণার উপর ভিত্তিশীল। প্রথমটি হল, আইনস্টাইনের 'আপেক্ষিকতার তত্ত্ব'যা বস্তুর মধ্যকার অভিকর্ষজ ক্রিয়াকে নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে। আর দ্বিতীয়টি মহাজাগতিক সূত্র (Cosmological principle) যা এত বেশী জটিল যে এ বইতে এর ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব না। এ তত্ত্বের অকাট্যতা নির্ভর করে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও লিথিয়ামের স্তর, সেই সাথে (১৯৬৫ সালে আবিষ্কৃত) মাইক্রোওয়েভ তেজষক্রিয়তা পরিমাপের ক্ষমতার উপর। বিগ ব্যাং তত্ত্ব সম্পর্কে চিন্তাভাবনা উদয়ের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রযুক্তির অস্তিত্ব বিংশ শতাব্দীর আগে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও ছিল না। রাতের আকাশের দিকে খালি চোখে তাকিয়ে চিন্তাভাবনা ছাড়া, ওহীর পাশাপাশি গবেষণার আর কোন উৎস বিদ্যমান ছিল বলে জানা নেই।

"মহাদেশীয় সম্প্রবাহ" (The theory of continental drift) তত্ত্বটিও সাম্প্রতিক একটি প্রস্তাবনা, ১৮০০ শতকের শুরুর দিকে এর সূত্রপাত। ফ্রেডরিক উইলহেম হাইনরিখ আলেকজান্ডার ফ্রেইহার (ব্যারন) ফন হামবল্ট (সংক্ষেপে আলেকজাণ্ডার হামবল্ট) লক্ষ্য করলেন যে, দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশটির প্রান্তরেখা আফ্রিকা মহাদেশের প্রান্তরেখার সাথে যেন খাপে খাপ মিলে যায়। তিনি প্রস্তাব করলেন যে, আটলান্টিকের দু' পাশের মহাদেশগুলো কোন এক সময় সংযুক্ত ছিল।

এর প্রায় পঞ্চাশ বছর পর এন্টনিও স্নাইডার পেলেগ্রিনি উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের কয়লা খনির ফসিলের প্রকৃতির মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কার করেন।

১৯১২ সালে সর্বপ্রথম জার্মান আবহাওয়াবিদ আলফ্রেড ওয়েগনার "মহাদেশীয় সম্প্রবাহ" তত্ত্বটি বিশ্বের কাছে তুলে ধরলেন। তিনি বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক ও জীবাশ্মসংক্রান্ত নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করার পর প্রস্তাব দেন যে, সবগুলো মহাদেশ একত্রিত হয়ে এক সময় একটি অভিন্ন মহাদেশ ছিল। এ অভিন্ন মহাদেশটির নাম দেন তিনি - 'Pangaea'। আরো বলেন যে, মহাদেশগুলো বিচ্ছিন্ন হবার এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল Triassic যুগে (২৪৫ থেকে ২০৮ মিলিয়ন বছর আগে)। এরপর ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হতে হতে আজকের অবস্থায় এসে পৌছেছে।

১৯৩৭ সালে আলেক্সান্ডার এল.দ্যু টোয়া (Alexander L. Du Toit) 'দুটি মূল ভূ-খন্ডের মতবাদ' প্রবর্তন করেন – একটি উত্তরের লরেশিয়া (Laurasia) এবং অপরটি দক্ষিণের গন্ডোয়ানাভূমি (Gondwanaland)। মহাদেশীয় ঢালের সাদৃশ্য, একই ধরণের বরফ, পাথর ও ভূতাত্ত্বিক গঠন, জীবাশ্ম নমুনার মিল (উল্লেখিত প্রমাণগুলোর পাশাপাশি, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের আটলান্টিক উপকূলের জুরাসিক যুগের ২০৮ থেকে ১৪৪ মিলিয়ন বছর পুরোন সমুদ্র-তলানি পর্যবেক্ষণ করেও প্রমাণিত হয়েছে যে, ঐ সময়ের আগে সেখানে কোন সমুদ্র ছিল না), সমুদ্রপৃষ্ঠের প্রসারতা এবং চুম্বকীয় সংখ্যা (লৌহ-চুম্বকীয় পদার্থ পৃথিবীর চুম্বকীয় ক্ষেত্রের দিক অনুযায়ী লম্বালম্বি অবস্থানের ফলে দানা বাঁধে। দানা বাঁধা স্ফটিকের মুক্তি, অবস্থান পরিবর্তন, এবং পাললিক স্তরে জমে থাকা বিন্যাস থেকে প্রত্যেকটা মহাদেশের ধাপে ধাপে অবস্থান পরিবর্তনের দলিল পাওয়া যায়।)-এ সমস্ত কিছু আজকের সর্বজনবিদিত "মহাদেশীয় সম্প্রবাহ" মতবাদটিকে সমর্থন যোগায়। ফলে স্পষ্টতঃ বোঝা যাচ্ছে যে, এ মতবাদটি বিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার। অন্যদিকে চৌদ্দ'শ বছর আগে পবিত্র কুরআন নীচের আয়াতটি উল্লেখ করেছে (ভাবার্থ),

"তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করেছেন ...."। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, রা'দ:৩)

জ্যোতিষ্কমন্ডলী (Heavenly Bodies)

সুরাহ ইউনুসের (১০ নং সুরাহ) ৫ নং আয়াতে সূর্য ও চন্দ্রকে দু'টি ভিন্ন শব্দ দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। আরবী ভাষায় দু'টি শব্দের অর্থই হল 'আলো'। কিন্তু 'দি-ইয়া-আন' শব্দ দিয়ে সূর্যকে আলোর উৎস এবং 'নূ-রান' শব্দ দিয়ে চাঁদকে আলো প্রতিফলনকারী হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। লেইন (Lane) রচিত

Arabic-English Lexicon এর মন্তব্য, ".....বলা হয় যে, 'দুই-ইয়া-আন' মূল ও অপরিহার্য আলো কিন্তু 'নূ-রান' হচ্ছে ঘটনাচক্রে পাওয়া আলো"।[119] এ ব্যাপারে কুরআন ও বাইবেলের বর্ণনার যথার্থতা ও সূক্ষ্মতায় রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। বাইবেলের (জেনেসিস ১:১৬) বর্ণনায়, "সৃষ্টিকর্তা দুটি মহান আলো সৃষ্টি করলেন; বড় আলোটির কর্তৃত্ব দিনে আর ছোট আলোর কর্তৃত্ব রাতের বেলায়"। অন্যদিকে কুরআন এ দু'টি জ্যোতিষ্ককে একই ধরনের না বলে এদের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেছে।

মহাশূন্যের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী এবং দিবা-রাত্রির বৃত্তাকার কক্ষপথের কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে,

"আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে"। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, আম্বিয়া:৩৩)

উপরের এ আয়াতটিকে এবার সুরাহ যুমারের ৫ নং আয়াতের[120] সাথে মিলিয়ে দেখা যাক, যেখানে দিন ও রাত্রিকে "কাও-ওয়া-রা" শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ – কুন্ডলী পাকিয়ে গোটানো বা জড়ানো, ঠিক যেমন করে মাথার চারিদিকে পাগড়ী প্যাঁচানো হয়। কুরআনের এ বর্ণনা গ্রহ ও চন্দ্রের গোলাকার কক্ষপথ তো অন্তর্ভুক্ত করেছেই, পৃথিবী যে গোলাকার তারও ইঙ্গিত দিয়েছে। এছাড়া সুরাহ ইয়াসীনের ৩৮ নং আয়াত নির্দেশ করে যে, সমস্ত সৌরজগত গতিশীল,

"এবং সূর্য ভ্রমণ করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ"। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, ইয়াসীন:৩৮)

বাস্তবে এ তথ্য সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সূর্যকে সৌরজগতে গ্রহগুলোর কেন্দ্রে আপেক্ষিকভাবে নিশ্চল মনে হলেও মহাকাশ বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছে যে,

---

119 Lane, Edward William. 1980. *An Arabic-English Lexicon Derived from the Best and the Most Copious Eastern Sources.* Beirut, Lebanon: Librairie Du Liban. Book I, Part 8, p. 2865, column 3.

120 "তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিবস দ্বারা। সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকেই পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত"। (ভাবার্থ, যুমার:৫)

প্রকৃতপক্ষে সূর্য আকাশগঙ্গা গ্যালাক্সির কক্ষপথের চারিদিকে মহাকাশে পরিভ্রমণ করছে।

পশ্চিমের মহাকাশচারীরা যখন মহাশূন্যে পড়ে যাবার ভয়ে দিগন্ত অন্বেষণ করতে দ্বিধান্বিত, এ রকম সময়ে কুরআনের এ তথ্য তখনকার মানুষের প্রচলিত ধারণার কাছে ছিল অর্থহীন। আর এ অবস্থা বজায় ছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী, হয়ত বা হাজার বছর ধরে।

"সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা, এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে চলছে"। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, ইয়াসীন:৪০)

উপরের আয়াতে চন্দ্র ও সূর্যের নিজস্ব কক্ষপথের এ বর্ণনা সত্যিই অভিনব। আরো অদ্ভুত তথ্য হল যে, সূর্য ও চন্দ্র কেউ কারো নাগাল পায় না। অথচ এক সময় মানুষের মধ্যে এ ধারণা প্রচলিত ছিল যে, সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য ও চন্দ্র একে অপরের নাগাল ধরে ফেলে। মুহাম্মদ (ﷺ) এর জীবদ্দশাতেও একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল বলে জানা যায়, অথচ আলোচ্য আয়াতটি মানুষের আদিম ধারণাকে শুধরে দিয়েছে।

শরীরবিদ্যা (Physiology)

কোষ জীবদেহের গঠনের একক। কোষের সাইটোপ্লাজমের অধিকাংশ (৮০% থেকে ৮৫%) তৈরী হয়েছে পানি দিয়ে। আমরা এ-ও জানি যে, পানির অনুপস্থিতিতে জীবন অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। কারণ শুকিয়ে যাওয়া কোষ মানেই মৃত কোষ। ১৯শ শতাব্দীর প্রথমদিকে আবিষ্কৃত এ সমস্ত জ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞানীদের কাছে প্রকাশিত হবার বহু আগে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে,

"...এবং সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে..."। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, আম্বিয়া:৩০)

ইলেক্ট্রোফিজিওলজিক পরীক্ষা ও কোষের ভিতরে সূক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং আধুনিক উন্নত রন্জণ পদ্ধতি, জমাট বাঁধানোর প্রক্রিয়া, ছেদন ও আনুবীক্ষণিক কৌশল ব্যবহার করে মানুষ জানতে পেরেছে যে, ব্যথা ও তাপ অনুভব করার গ্রাহী অংশ

চামড়ার বাইরের ত্বকীয় স্তরে সীমাবদ্ধ। জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী প্রত্যেকটি ধর্মই সাধারণত অনুসারীদের সামনে জান্নাতের অগণিত প্রতিদানের কথা বার বার মনে করিয়ে দেয়, অথচ জাহান্নামের ভয়াবহ পরিণামের কথা তারা বলতে গেলে প্রায় এড়িয়েই চলে। এভাবে জাহান্নামের হুমকিকে উড়িয়ে দিয়ে ধর্মে উদাসীন ব্যক্তির আধ্যাত্মিকতাকে অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেয়া হয়। এ নরক অর্থাৎ জাহান্নামের শাস্তি কতটা যন্ত্রণাদায়ক? জাহান্নামের অধিবাসীদের সীমাহীন যন্ত্রণার বর্ণনা দিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে,

"...যখন তাদের চর্ম বিদগ্ধ হবে, আমি তৎপরিবর্তে তাদের চর্ম পরিবর্তিত করে দিব যেন তারা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব সম্মানী, প্রজ্ঞাময়"।

(ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, আন-নিসা:৫৬)

বর্তমান শতাব্দীর অতি পরিচিত তথ্য চৌদ্দ'শ বছর আগে মুহাম্মদ (ﷺ) এর কাছে বর্ণনা করা হয়েছে। সেটা ছিল এমন এক সময় ও স্থান যখন মানবদেহের উপর গবেষণা অঙ্গব্যবচ্ছেদের পর্যায় পর্যন্ত গড়ায়নি। যারা ভাবছেন মুহাম্মদ (ﷺ) এর যুগে কার এমন ভয়াবহ শাস্তি দেবার এবং এ শাস্তির সূক্ষ বর্ণনা দেবার ক্ষমতা ছিল, তাদের এ আয়াতে উত্তর দেয়া হচ্ছে, *"নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব সম্মানী, প্রজ্ঞাময়"।*

ফ্রন্টাল লোবগুলো (Frontal lobe) মস্তিষ্কের সন্মুখের দিকে অবস্থিত। এগুলোকে 'frontal' lobe বলার কারণ এগুলো সামনের দিকে থাকে। কেউ কপালে টোকা দিলে মস্তিষ্কের যে অংশ আঙ্গুলের স্পর্শে আসে তা-ই হল ফ্রন্টাল লোব। এ সন্মুখভাগ (Frontal lobe) মস্তিষ্কের এমন একটি এলাকা যা ব্যক্তির যাবতীয় প্রেরণা, পরিকল্পনা, কর্ম-প্রবণতার জন্য দায়ী। আচরণগত ও চারিত্রিক গুণের অন্তর্গত সবকিছু মস্তিষ্কের সবচেয়ে সামনের অংশে ঘটে। যেমন সুপরিচিত একটি সূত্রে বলা হয়েছে, "কর্মপ্রেরণা এবং পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণের দূরদর্শিতা সবকিছু Frontal lobe এর অগ্রবর্তী Prefrontal lobe ঘটে থাকে"।[121] বিস্ময়ের ব্যাপার হল, এ বাস্তবতার উল্লেখ দেখা যায় কুরআনে নীচের আয়াতে,

---

[121] Seeley, Rod R., Trent D. Stephens and Philip Tate.1996. Essentials of Anatomy and Physiology. 2nd edition. St. Louis: Mosby-Year Book, Inc. p.211.

"সাবধান! সে যদি বিরত না হয় তবে আমি তাকে অবশ্যই ছেঁচড়িয়ে নিয়ে যাবো, মস্তকের সন্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ ধরে। মিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠ সন্মুখের কেশগুচ্ছ ওয়ালা"। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, আলাক:১৫,১৬)

"না-সি-ইয়াহ্" (অথবা "না-সি-ইয়া-তিন") শব্দটিকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অনুবাদ করা হয় 'সন্মুখের কেশগুচ্ছ' হিসেবে। প্রকৃতপক্ষে এ শব্দটির আরো সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে "মাথার সামনের অংশ"।[122]

একটি মজার গল্প আছে – দেহের কোন্ অংশটির সাহায্যে মানুষ চিন্তাভাবনা করে তা নিয়ে এক ব্যক্তির কৌতুহলের শেষ ছিল না। শেষাবধি অনেক ভেবে সে বের করল যে, ক্রমাগত চিন্তার ফলে শরীরের যে অঙ্গটিতে ব্যথা অনুভব করবে সেখানেই তার মস্তিষ্ক। সুতরাং লোকটি বসে বসে চিন্তা করতে শুরু করে দিল....। বেশ কিছুক্ষণ পর কাঠের যে শক্ত টুলের উপর বসে সে চিন্তা করছিল সেটি একসময় তার খাজনা দাবী করা শুরু করল। ফলে শেষ পর্যন্ত ব্যথার জায়গায় চিন্তা কেন্দ্রীভূত করে লোকটি সিদ্ধান্তে পৌছাল যে, এটাই চিন্তাভাবনার জন্য দায়ী। এ মজার গল্পটি শুধু শিশুদেরই আমোদ দেয় না, বড়দেরও দেয়। ব্যাপার হচ্ছে ১৪০০ বছর আগে মরুভূমির এক বেদুইনের পক্ষে এটা ভেবে বের করা অসম্ভব, যা আধুনিক বিজ্ঞান বর্তমান শতকে আবিষ্কার করেছে। আরো বেশী অসম্ভব কল্পনা হল, হাজার বছর আগের অক্ষরজ্ঞানহীন এক মরুভূমির কাফেলার নেতার পক্ষে এরকম মন্তব্য করা। কোন স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের মনে এরকম কোন কিছু উদয় হওয়া মোটেও সঙ্গত হবে না যে, "১২০০ বছর আগে, এমনকি দু'শ বছর আগে এক বেদুইন দেহের কোন্ অংশটিকে পাপ আর মিথ্যাচারিতার জন্য দায়ী বলে ভেবে বের করেছে? কেন, সেরিব্রাল কর্টেক্সের (cerebral cortex) সামনে অবস্থিত prefrontal অংশ"! কেউ যদি সত্যি সত্যি এরকম কথা বলে তাহলে বলতে হবে যে, তার অন্য কোন সন্দেহজনক গোপন উদ্দেশ্য আছে, কেননা এরকম কিছু ধারণা করা সাধারণ চিন্তাশক্তির বিপরীত।

---

[122] Wehr, Hans.

ইব্ন নাফিস রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া বর্ণনা করার ৬০০ বছর আগে এবং উইলিয়াম হার্ভে ১৬২৮ সালে তাঁর *Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus* (The Anatomical Exercises Concerning the Motion of the Heart and Blood in Animals) বইটি প্রকাশের প্রায় ১০০০ বছর আগে মহিমাময় কুরআনের আয়াতে খাদ্য পরিপাক, রক্ত সঞ্চালন, বিশোষণ এবং মল-নিঃসরণ সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে,

"অবশ্যই (গৃহপালিত) চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে তোমাদের জন্যে শিক্ষা রয়েছে; ওগুলোর উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে তোমাদেরকে আমি পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ, যা পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু"। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, নাহ্‌ল:৬৬)

রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া, খাদ্য পরিপাক ক্রিয়া, অন্ত্রের বিশোষণ এবং বিভিন্ন গ্রন্থির নিঃসরণ - এ বিষয়গুলো গত কয়েক শতাব্দী আগেও মানুষের কাছে অজ্ঞাত ছিল। এরকম একটি আয়াত যার মধ্যে উল্লেখিত এ প্রক্রিয়াগুলোর সবকয়টি একসঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে; সত্যি, সময়ের কথা চিন্তা করলে এটা বেশ বেমানানই মনে হয়!

জলাশয় (Waterbody)

পবিত্র কুরআনে সৃষ্টিজগতের কিছু অসাধারণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা ও গৌরব বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন,

"তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্ট, মজাদার এবং অপরটি লবণাক্ত, বিস্বাদ; উভয়ের মধ্যে রেখেছেন এক অন্তরায়, এক শক্ত ব্যবধান"। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, ফুরকান:৫৩)

এবং,

"তিনি দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করেন যারা পরস্পর মিলিত হয়, এ দু'য়ের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা ওরা অতিক্রম করতে পারে না। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে?" (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, রহমান:১৯-২১)

প্রথম আয়াতে যেন নদীর মোহনায় অবস্থিত লোনা পানির অদৃশ্য প্রতিবন্ধকের কথা বলা হয়েছে। আজ নদী ও সমুদ্রের মোহনার কথা কারো অজানা নয়, যেখানে নদীর মিঠা পানি থেকে সমুদ্রের লোনা পানি পৃথক থাকে। কিন্তু এ তথ্য সেই সময় ও সেই স্থানের লোকদের জানবার কথা নয় যেখানে নদীর উপস্থিতি বিরল এবং যখন পানির লবণাক্ততা মাপার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়নি।

চৌদ্দ'শ বছর আগে পানিকে শুধুমাত্র দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হত – পানের যোগ্য অথবা অযোগ্য। অন্য কোন শ্রেণীতে বিভক্ত করার দরকার বা সুযোগ তখন ছিল না। আর তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের কুয়ার পানি আজো কিছুটা লোনা। সুতরাং আধুনিক উন্নত সময়ের তুলনায় মুহাম্মদ (ﷺ) যে পিছিয়ে থাকা সময় ও স্থানে বাস করতেন সেখানে ঈষৎ লোনা পানিকে খুব সম্ভব পানের যোগ্য হিসেবেই গণ্য করা হত।

ঘটনা যাই হোক, এমনকি আজকের যুগেও কেউ যখন চিন্তা করে নদীর পানি সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে, তখন ধারণা করে যে একদিন এ দুই জলাশয়ের পানি একে ওপরের উপর প্রভাব ফেলবে। সপ্তম শতাব্দীর এক সহজ সাধারণ মানুষ, যার সমুদ্রের লবণাক্ততা পরীক্ষা করার একমাত্র উপায় হল জিহ্বায় চেখে দেখা, সাধারণ কিছু নৌযানের মধ্যে যার সমুদ্র-ভ্রমণের সুযোগ ছিল সীমাবদ্ধ, তার চিন্তাভাবনা যে খুব সাধারণ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। নদীর মোহনার দিকে তাকিয়ে সপ্তম শতাব্দীর কোন লোকের পক্ষে এরকম ভাবাই স্বাভাবিক যে, নীল নদ কিংবা দজলা-ফোরাতের মত প্রবল স্রোতশীলা কোন নদী সমুদ্রের ঈষৎ লোনা পানির সাথে মিশে লবাণাক্ততা কমিয়ে দেবে। অথচ এরকমটা যে কখনও ঘটতে দেয়া হবে না, তা ধারণা করা তার সাধ্যের বাইরে। আর মরুর বুকে বাসকারী ব্যক্তি, যার সমুদ্র ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নেই তার জন্যে তো আরো অসম্ভব। সপ্তম শতাব্দীর লোকের মুখ থেকে অন্যরকম কোন কিছু আশা করা সাধারণ বিবেচনা বোধের বিপরীতই বলা চলে। এ সবকিছু চিন্তা করলে, মরুবাসী সমুদ্রাভিযানের অভিজ্ঞতাশূন্য কোন লোকের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। ফলে মুহাম্মদ (ﷺ) এর অকৃত্রিমতা নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। কোন লোক ভণ্ড হলে তার পক্ষে এরকম প্রস্তাবনা তুলবার কী যুক্তি থাকতে পারে?

উল্লেখিত দ্বিতীয় আয়াতটিতে (সুরাহ রহমান: ১৯-২১) সম্ভবতঃ এ বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে যে-মহাসাগর আর সাগরের মধ্যে লবণাক্ততা, তাপমাত্রা এবং ঘনত্বের দিক দিয়ে পার্থক্য আছে, ফলে কোথায় এদের মিলন ঘটবে তা কোন নির্দিষ্ট সীমানা দিয়ে নির্দেশ করা যায় না[123]। যেমন, ভূমধ্য সাগর আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে মিলিত হয়েছে একটি স্থির ও সুনির্দিষ্ট প্রান্তরেখায়। কয়েক'শ কিলোমিটার দীর্ঘ ভূমধ্যসাগর, ১০০০ মিটার প্রশস্ত জায়গা জুড়ে, অপেক্ষাকৃত বেশী উষ্ণ ও লবণাক্ত এবং কম ঘনত্ববিশিষ্ট পানি নিয়ে জিব্রাল্টার প্রণালীতে গিয়ে পড়েছে[124]। অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা, কম লবণাক্ত এবং বেশী ঘনত্বের আটলান্টিক মহাসাগরের সীমানা ভূমধ্যসাগরের তুলনায় স্থির, তীক্ষ্ণ। প্রবল স্রোত, উত্তাল জলরাশি আর নিয়মিত জোয়ার সত্ত্বেও এ দুই জলাশয়ের পানি পরস্পরের সাথে মেশে না। এমনকি মোহনাতেও না। এটাকেই দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত "...*এ দু'য়ের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা ওরা অতিক্রম করতে পারে না*" - এর দৃষ্টান্ত ধরা হয়। অন্য সব সমুদ্র ও মহাসাগরের মোহনাগুলোতেও এ আশ্চর্যজনক ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি দেখা যায়।

সমুদ্রের আরো একটি ব্যাপার হল আভ্যন্তরীণ গভীর তরঙ্গমালা। কুরআনে এরকম বর্ণনা প্রথমে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে এবং তা মনে হওয়াটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। কারণ বস্তুতঃ এ বিষয়টি একটি অতি সাম্প্রতিক আবিষ্কার। আধুনিক সমুদ্র-বিজ্ঞান (Oceanography) আমাদের জানায় যে, গভীর আভ্যন্তরীন তরঙ্গমালা "....দেখতে পাওয়া যায় পানির ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্ববিশিষ্ট দুটি স্তরের মাঝখানে (pycnocline)।"[125] সমুদ্র গভীরে তরঙ্গমালার প্রবাহ ঠিক সমুদ্রে পৃষ্ঠের তরঙ্গের মতই, এমনকি তা আছড়ে পড়ে বিচূর্ণ হতে পারে। তবে সমুদ্রপৃষ্ঠের তরঙ্গের মত একে খালি চোখে দেখা যায় না কিংবা পর্যবেক্ষণও করা যায় না। এ কাজের জন্য প্রয়োজন পড়ে জটিল ধরণের উন্নত যন্ত্রপাতি। আর এ কাজ নিশ্চয়ই কোন মরুবাসী জনপদের পক্ষে সম্ভব নয় যাদের কাছে সাঁতারের মত সহজ কাজটিই ছিল রীতিমত কঠিন।

---

[123] Davis, Richard A., Jr. 1972. *Principles of Oceanography*. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Co. pp. 92-93.

[124] Kuenen, Philip H. 1960. *Marine Geology*. New York: John Wiley & Sons, Inc. p. 43.

[125] Gross, M. Grant. 1993. *Oceanography, a View of Earth*. 4th ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc. p. 223.

এম. গ্রান্ট গ্রস (M. Grant Gross) তাঁর সমুদ্র-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বইতে গভীর সমুদ্রের তরঙ্গমালার যে নকশা একেঁছেন সেটি লক্ষ্যণীয়। তাঁর তরঙ্গের নকশায় দু'স্তর দেখানো হয়েছে, একটি সমুদ্রপৃষ্ঠের উপর, আরেকটি সমুদ্রগভীরে। উচ্চ-ঘনত্ববিশিষ্ট গভীর সমুদ্র এবং অপেক্ষাকৃত কম ঘনত্ববিশিষ্ট সমুদ্রপৃষ্ঠের মধ্যেখানে এ স্তর দু'টি অবস্থিত[126]। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে এ চিত্র কুরআনের নীচের আয়াতের সাথে অসাধারণভাবে মিলে যায়,

"অথবা গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকার সদৃশ যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর, এমনকি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না; আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন না তার জন্যে কোন জ্যোতি নেই"। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, নূর:৪০)

আয়াতে সমুদ্রপৃষ্ঠ এবং সমুদ্র গভীরের স্তর নিয়ে শুধু বলা হয়নি, সেই সাথে এ বর্ণনাটিও যোগ করা হয়েছে,"*... গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকার ...*" যে অন্ধকারে কারো পক্ষে দেখতে পাওয়া আদৌ সম্ভব না। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০০০ মিটার গভীরে আলোর অভেদ্যতা খুব সাম্প্রতিক আবিষ্কার, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তা বের করা হয়েছে। কারণ, ফুসফুস বিস্ফোরিত হবার ভয় থাকে বলে সমুদ্রের এত গভীরে যাওয়া কোন মানুষের পক্ষে অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার[127]। সমুদ্রের নীচে মোটামুটি অন্ধকার স্তর পেতে হলেও কমপক্ষে ৫০ মিটার নীচে ডুব দিতে হয়। অন্যদিকে কোনরকম যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়া একজন ডুবুরীর পক্ষে ১৫ মিটারের বেশী গভীরে যাওয়া ভীষণ বিরল উদাহরণ। আর সবার আগে তাকে অবশ্যই এমন এক জনপদবাসী হতে হবে যাদের গহীন সমুদ্রে সাঁতারের অভিজ্ঞতা আছে।

বায়ুমণ্ডল (Atmosphere)

পর্বত আরোহণ করেছে এমন ব্যক্তি মাত্রই জানে যে, ভূমি থেকে উচ্চতা যত বৃদ্ধি পায় বায়ুও তত হালকা হতে থাকে। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮,০০০ ফুটের উর্ধ্বে আরোহণ করা হলে পাহাড়ী অসুস্থতা অথবা শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে। এ

---

[126] Gross, M. Grant. p. 224.

[127] Elder, Danny; and John Pernetta. 1991. *Oceans*. London: Mitchell Beazley Publishers. p. 27.

প্রসঙ্গে দু'টি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন, প্রথমতঃ মধ্যপ্রাচ্যে এরকম উঁচু জায়গা বলতে গেলে প্রায় একেবারেই নেই। সুতরাং মুহাম্মদ (ﷺ) এর যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এটা খুবই যৌক্তিক যে, উচ্চতাজনিত শ্বাসকষ্টের ব্যাপারটি মানুষের কাছে ছিল অপরিচিত। ১৮০০ শতকের শেষভাগে এ ব্যাপারটি সম্পর্কে মানুষ প্রথম জানতে পেরেছে, এবং আরো পরে ১৯৩৭ সালের দিকে এরকম শ্বাসকষ্টের শরীরগত কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে[128]। সমতল অথবা নিম্নাঞ্চলে বসবাসকারীদের মধ্যে পর্বতারোহণের কষ্ট স্বীকার করার উদ্দীপনা থাকবে এ সম্ভাবনা খুব কম। বিশেষ করে সেই পর্বতের উচ্চতা যদি হয় ৮,০০০ ফুট বা তার বেশী। তাছাড়া প্রতিকূল পরিবেশে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে যে সমস্ত লোকেরা সারাক্ষণ ব্যস্ত, তাদের কাছে নিছক আমোদের জন্যে পর্বতাভিযান একেবারে অজানা বিষয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, আধুনিক কলাকৌশল আর দ্রুতগামী যানবাহন আবিষ্কারের আগে পাহাড়ী এলাকায় বসবাসকারীরা সে এলাকার জলবায়ুর সাথে অভ্যস্ত হয়ে যেত। যারা পশুর পাল চরাতে পাহাড়ী ঢাল বেয়ে উপরে উঠত, তারা এক স্তর থেকে আরেক স্তর অতিক্রম করত খুব ধীরে, ফলে উচ্চতার পরিবর্তন মানিয়ে নেবার জন্যে শরীর যথেষ্ট সময় পেত। সুতরাং কোন আরবের পক্ষে ৮ থেকে ১০ হাজার ফুট উচ্চতা ভেঙ্গে পর্বত আরোহণের ইচ্ছা জাগার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। প্রথমেই বলা হয়েছে যে, মরুভূমিতে এরকম উঁচু পাহাড়ের উপস্থিতি বিরল। তার উপর আধুনিক যানবাহন ও যন্ত্রপাতিও সে সময় ছিল না। অথচ কুরআনের এক আয়াতে অনেক উচ্চতায় বুকের সংকীর্ণতা ও শ্বাসবদ্ধ অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে,

"অতএব আল্লাহ যাকে হিদায়াত করতে চান, ইসলামের জন্যে তার অন্তঃকরণ খুলে দেন, আর যাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তার অন্তঃকরণ খুব সংকুচিত করে দেন, এমনভাবে সংকুচিত করেন যে, মনে হয় যেন সে আকাশে আরোহণ করছে, এমনিভাবেই যারা ঈমান আনে না তাদের উপর আল্লাহ অপবিত্রতা ও পঙ্কিলতাকে বিজয়ী করে দেন"। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, আন'আম:১২৫)

সম্প্রতি আবহাওয়াবিদরা বৃষ্টিপাতের জন্যে দায়ী 'কিউমুলাস মেঘ' সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা করেছেন। দেখা গেছে ছোট ছোট কিউমুলাস মেঘ বাতাসে সঞ্চালিত হয়ে একত্রিত হয়, এভাবে ধীরে ধীরে মেঘের আকার বৃদ্ধি পেতে

---

128 Encyclopaedia Britannica. CD-ROM. Under "Altutude sickness".

থাকে। এক পর্যায়ে জলীয়বাষ্পের ভর খড়ের গাদার মত খাড়াভাবে বাড়তে শুরু করে[129][130]। মেঘপুঞ্জ যখন যথেষ্ট উঁচুতে লম্বাকার ধারণ করে, তখন উপরের বায়ুমণ্ডলের শীতল স্পর্শে তা ঘনীভূত হতে থাকে - এরই পরিণাম হল বৃষ্টি। এ সমস্ত বিশ্লেষণের জন্যে আবহাওয়া বিশারদদের নির্ভর করতে হয়েছে স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফ, এরোপ্লেন, আবহাওয়া বেলুন, কম্প্যুটারসহ অন্যান্য উন্নতমানের যন্ত্রপাতির উপর। অন্যদিকে কুরআনে এ ব্যাপারে কী বলা হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দেয়া যাক,

"তুমি কি দেখো না, আল্লাহ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, তৎপর তাদেরকে একত্রিত করেন এবং পরে পুন্জীভূত করেন, অতঃপর তুমি দেখতে পাও, ওর মধ্য হতে নির্গত হয় পানিধারা; আকাশস্থিত শিলাস্তুপ হতে তিনি বর্ষণ করেন শিলা..."। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, নূর:৪৩)

"আকাশস্থিত শিলাস্তুপ (পর্বততুল্য মেঘপুঞ্জ) হতে তিনি বর্ষণ করেন শিলা"? এখানে বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘপুঞ্জকে যে পুঞ্জিভূত স্তুপ বলে চিত্রায়িত করা হয়েছে তা সত্যি দৃষ্টি কাঁড়ার মত। আবার শিলা বর্ষণকারী মেঘকে বর্ণনা করা হয়েছে পর্বতের মত সুউচ্চ স্তুপ হিসেবে। আসলেই এ বর্ণনা একদম যথার্থ। কিউমুলনিম্‌বাস মেঘ যখন ৩ -৪ হাজার ফুট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট মূল থেকে ২৫-৩০ হাজার ফুট পর্যন্ত (পর্বতসদৃশ) দীর্ঘাকার ধারণ করে তখন এর উপরের স্তর বায়ুমণ্ডলের বিশেষ এক অবস্থার সংস্পর্শে এসে ঘনীভূত ও শীতল হয়ে শিলা উৎপন্ন করে।[131]

নীচে উল্লেখিত কুরআনের এ আয়াতটি পানিচক্রের এক চমৎকার বর্ণনা দিয়েছে,

"তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহ আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন এবং তার দ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন,..."। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, যুমার:২১)

---

[129] Anthes, Richsrd A., John J. Alistair B. Fraser, and Hans A. Panofsky. 1981. The Atmosphere. 3rd ed. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Co. pp. 268-269.

[130] Miller, Albert and Jack C. Thompson. 1975. Elements of Meteorology. 2nd ed. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Co.pp. 141.

[131] Miller, Albert; and Jack C. Thompson. P. 141.

এখনকার যুগে অনেকের কাছে পানিচক্র অজানা কোন বিষয় নয়। কিন্তু ২১শ শতাব্দীর আধুনিক পরিমন্ডল থেকে বের হয়ে কেউ যদি জানবার চেষ্টা করে হাজার বছর আগে, এমনকি শ'দুয়েক বছর আগেও এ সম্পর্কে মানুষ কী ধারণা পোষণ করত, তবে অবাক না হয়ে পারবে না।

১৭শ শতাব্দীর বিখ্যাত দার্শনিক রেনে ডেকার্তে (Rene Descartes) প্রস্তাব তুলেছিলেন যে, সমুদ্রের পানি ভূগর্ভস্থ নানা প্রণালীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে পাহাড়ের চূড়ায় জমতে থাকে। যেন প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে তৈরী পানির উঁচু দুর্গ। অন্যদিকে এথানাসিয়াস কার্শার (Athanasius Kircher) মত প্রকাশ করেছিলেন যে, সমুদ্রের পানি জোয়ারের প্রবল স্রোতে ভূগর্ভস্থ খাঁজের মধ্যে দিয়ে তাড়িত হয় এবং এক সময় খোলা ছিদ্রপথে প্রস্রবণ হিসেবে নির্গত হয় (দেখুন, Mundus subterraneus [ভূগর্ভস্থ জগত], 1664)। কেউ কেউ আবার এমন একটি ধারণার কথা উল্লেখ করেছে যে, সমুদ্রের সাথে বিশালাকার ভূগর্ভস্থ সমুদ্র সংযুক্ত আছে যেগুলো থেকে নদী-নালা আর ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। এর উদাহরণ হল, ১৬৯৫ সালে প্রকাশিত জন উডওয়ার্ডের "Essay Towards a Natural History of the Earth and Terrestrial Bodies" রচনাটি।

১৫৮০ সালে বার্নার্ড পালিসি প্রথম পানিচক্রের ব্যাপারে সঠিক তথ্য তুলে ধরেন তার "Discours Admirables (Admirable Discourse)" বইতে। সেখানে তিনি বৃষ্টির পানিকে সমস্ত নদী ও প্রস্রবণের একমাত্র উৎস বলে উল্লেখ করেছেন।

হাওয়াইতে অবস্থিত ওয়াইয়ালিয়াল পর্বতে বসবাসকারী মানুষ (যেখানে পৃথিবীতে বৃষ্টিপাতের হার সর্বোচ্চ, বছরে গড়ে ১১,৭০০ মি.মি.) কিংবা মরুভূমির বুকে বৃষ্টির জন্যে কাঙ্গাল বেদুইন - কারোরই জানা ছিল না বৃষ্টিচক্রের রহস্য। ১৭শ শতকের শেষের দিকে পিয়েরে পেরল্ট (Pierre Perrault) এবং এডমে ম্যারিওট (Edmé Mariotte) সীন নদীর অববাহিকায় সর্বপ্রথম তাদের গবেষণায় প্রমাণ করেছিলেন যে, বৃষ্টিপাত পৃথিবীর বার্ষিক পানি প্রবাহ সরবরাহের জন্য পর্যাপ্ত[132]।

---

[132] *Encyclopaedia Britannica*, CD-ROM.

অথচ কুরআনের আয়াত পানিচক্রের এ বাস্তবতা বর্ণনা করেছে চৌদ্দ'শ বছর আগেই।

অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ও ভ্রূণতত্ত্ব (Anatomy & Embryology):
ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে কুরআনের আয়াত এত নিখুঁত ও চমকপ্রদ যে শুধুমাত্র এ ব্যাপারটি নিয়েই প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। অসাধারণ এ বিষয়টির বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্যে এ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিসর যথেষ্ট নয়। তবু এর কিছু কিছু লক্ষণীয় দিক নিয়ে সামান্য আলোচনা করা যাক। পাঠকদের মধ্যে যারা আরো বিস্তারিত জানতে আগ্রহী তারা এ সম্পর্কে আলোচনা সমৃদ্ধ অন্যান্য বই থেকে জ্ঞান পিপাসা মেটাতে পারেন।

'জন্মের সময় শিশু পিতামাতা উভয়ের কাছ থেকে বৈশিষ্ট্য লাভ করে'– এ ধারণাটি পশ্চিমা বিশ্বের কাছে দীর্ঘদিন অপরিচিত ছিল। ১৭৫১ সালে পিয়েরে ল্যুই মরি দ্য মপারটুই (Pierre-Louis Moreau de Maupertuis) তার *Systeme de La Nature* বইতে প্রস্তাবনা পেশ করার আগে পর্যন্ত বিষয়টি অজানাই ছিল। এ প্রস্তাবনার আগে পর্যন্ত গর্ভধারণ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার মূল ভিত্তি ছিল ৪র্থ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের এরিস্টটলীয় মতবাদ। এরিস্টটলের বিশ্বাস ছিল ভ্রূণ সৃষ্টি হয় রক্তস্রাবের ঘনীভবন প্রক্রিয়ার ফলে, যে প্রক্রিয়ায় বীর্য প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। এরকম বহুল প্রচলিত একটি ধারণায় বাইবেলের অন্ততঃ একজন লেখক যে প্রভাবিত হয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ (আইয়ুব:১০:১০; Job 10:10) এর চরণে বলা হয়েছে যে, "তুমি কি আমাকে দুধের মত ঢেলে এবং পনিরের মত জমাট বাঁধিয়ে সৃষ্টি করোনি...." । অথচ ল্যাযারো স্পালানযানি প্রমাণ করলেন যে, এন্টনী ফন লিউয়েনহুকের (Antonie van Leewenhoek) অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে আবিষ্কৃত স্পার্মাটোযোয়া - বীর্যের মধ্যে উপস্থিত প্যারাসাইট ছাড়া আর কিছু নয়। স্বয়ংভবন বা অজীবজনন তত্ত্ব (The theory of spontaneous generation) এবং প্রাকবিন্যাস তত্ত্ব (The theory of preformation) অনুযায়ী - পূর্ণাঙ্গ মানবাকার বিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকার ভ্রূণ শুক্রাণুর মাথার অংশে [Jan Swammerdam, 1637-1680] অথবা স্ত্রী ডিম্বাণুর মধ্যে [DeGraaf, 1641-1693] অবস্থান

করতে থাকে যার নাম দেয়া হয়েছে 'হোমানকুলাস'। এ সমস্ত তত্ত্বের পাশাপাশি ১৮শ শতকের দিকে আরো একটি তত্ত্ব জন্ম নিল আর সেটি হল পিতা-মাতা থেকে শিশুর উদ্ভব লাভের তত্ত্ব (The theory of biparental inheritance)। অবশেষে ২০ শতাব্দীর প্রথমভাগে ড্রিশের (Driesch) গবেষণার ফলশ্রুতিতে পূর্বে প্রচলিত সমস্ত ভুল ধারণার অবসান ঘটে। অন্যদিকে এর আগে ১২০০ বছর ধরে ভ্রুণ সম্পর্কে কুরআনের শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ মুসলিমরা কিন্তু ঠিকই অবগত ছিল,

"হে লোকসকল! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে,...."। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, হুজুরাত:১৩)

এবং,

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি সংমিশ্রিত শুক্র বিন্দু হতে,..."। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, দাহ্‌র:২)

কুরআনের আয়াত ও তৎকালীন ভ্রুণতত্ত্ববিদদের মতামতের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব নিয়ে ১৪শ শতাব্দীর ইসলামী মনীষী ইবনে হাজ্‌র আল আসকালানী (রহ.) মন্তব্য করেছিলেন,

> "অনেক ভ্রূণতত্ত্ববিদ দাবী করেন সন্তানের জন্ম প্রক্রিয়ায় পুরুষ বীর্যের ভূমিকা নেই। তাদের মতে, পুরুষ বীর্যের ভূমিকা শুধুমাত্র রজঃস্রাবের রক্তকে জমাট বাঁধানোর কাজে সীমাবদ্ধ। অথচ নবী (ﷺ) এর কথা এ বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রকৃতপক্ষে ভ্রূণ গঠণ প্রক্রিয়ায় পুরুষের বীর্য নারীর বীর্যের মত সমানভাবে অংশগ্রহণ করে"[133]।

এ প্রসঙ্গে সেই ঘটনাটি উল্লেখ্য যখন এক ইহুদী ব্যক্তি মুহাম্মদ (ﷺ) এর কাছে প্রশ্ন তুলেছিল, "হে মুহাম্মদ! মানুষ কোথেকে সৃষ্ট হয়েছে?" তিনি (ﷺ) উত্তর দিলেন, "সে সৃষ্টি হয়েছে পুরুষের নুৎফাহ্‌ (শুক্রাণু) ও নারীর নুৎফাহ্‌ (ডিম্বাণু) উভয় থেকে"[134]।

---

[133] *Fateh Al Bari Shareh Sahih Al Bukhari.* Ibn Hajar Al Asqualani, Bab Alqadar. Cairo: Al Mat'ba Assalafiyah. Vol II, Page 480.

[134] মুসনাদে আহমদ

এখানেই শেষ নয়, কুরআন ও হাদীসে আরো বলা হয়েছে যে, অতি সামান্য পরিমাণ বীর্য গর্ভধারণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।

"অতঃপর তার বংশ উৎপন্ন করেছেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে"।
(ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, সাজদাহ:৮)

হাদীসে আছে, "মানুষ সৃষ্টি হয় নিঃসৃত তরলের সামান্য কিছু অংশ থেকে, এর সবটুকু থেকে নয়"[135]। এ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি বিগত দুই'শ বছরের আগে বৈজ্ঞানিক মহলের কাছে অজানা ছিল। ১৮৭৫ সালে বিজ্ঞানী হার্টউইগ প্রথমবারের মত শুক্রাণুর অংশগ্রহণে ডিম্বাণুর গর্ভাধারণ প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক বর্ণনা দিয়েছিলেন।

অপরিণত ভ্রুণ ক্রমান্বয়ে পরিণত রূপ নেয় গর্ভাশয় প্রাচীরের অভ্যন্তরে ঝুলে থাকা এ্যামনিও ক্রায়োনিক থলির কোমল দূর্গের ভিতরে। গর্ভাশয়কে আবার ঘিরে থাকে মাতৃ উদরের সুরক্ষিত দেয়াল। পরপর তিন স্তরের এ অন্তরালের কথাই সম্ভবত উল্লেখ করা হয়েছে কুরআনে নীচের আয়াতে,

"তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন..."। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, যুমার:৬)

আরো একটি কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় হল, ১৫শ শতাব্দীর আগে কখনও ভ্রুণবৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ের বর্ণনা বৈজ্ঞানিক লেখালেখিতে স্থান পায়নি। এতে খুব একটা অবাক হবার কিছু নেই। কারণ প্রাকবিন্যাস তত্ত্ব এবং স্বয়ংভবন বা অজীবজনন তত্ত্ব (the theories of preformation and spontaneous generation) অনুযায়ী মানুষের ধারণা ছিল যে, ভ্রুণ প্রথম পর্যায় থেকেই পরিপূর্ণ মানব আকৃতি ও অবয়ব বিশিষ্ট হয় যা সময়ের প্রবাহে শুধু আকার ও আয়তনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরকম বহুল প্রচলিত একটি ভুল ধারণা এক সময় বিতর্কের সন্মুখীন হয়। প্রথমতঃ ১৫শ শতকে ভ্রুণ-বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা ও আনুমানিক চিত্র প্রকাশিত হতে থাকে। এর পরই ১৭শ শতকে ফন লিউয়েনহুকের অনুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার এ বিষয়টির উপর গবেষণাকে আরো

---

[135] মুসলিম।

এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা এ যন্ত্র ব্যবহার করে পাখীর ভ্রুণ নিয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনা চালাতে সক্ষম হন। মানুষের ভ্রুণ নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছিল এর আরো কয়েক বছর পরে। মানবভ্রূণের পর্যায়ক্রম রূপান্তরে বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে আরো বেশ কয়েক বছর সময় লেগেছিল। আর ২০শ শতাব্দীতে স্ট্রিটারের আবিষ্কারের আগে এ জ্ঞান বৈজ্ঞানিক দলিলপত্রে অন্তর্ভুক্ত হবার সুযোগ পায়নি। অথচ ভ্রূণ বিকাশের পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে কুরআনের জ্ঞান প্রায় ১৩শ বছরের পুরনো যা রাম্পল্‌স্টিলস্কিনকেও লজ্জায় ফেলে দেবে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ভ্রূণবিকাশের যে বর্ণনা কুরআনে পাওয়া যায় তা কতখানি যথার্থ? এ প্রশ্নটি অবশ্যই যাচাই করে দেখবার মত।

ভ্রূণ বৃদ্ধির পাথমিক পর্যায় শুরু হয় শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনে যাইগোট তৈরীর মধ্য দিয়ে। এরপর যাইগোট বিভাজিত হয়ে blastocyst নামের বস্তু গঠন করে যা গর্ভাশয়ে স্থাপিত হয়। যাইগোট হচ্ছে মলিন, ক্ষুদ্র কণার মত একটি বস্তু। আর ব্লাস্টোসিস্ট থেকে তৈরী হয় chorionic villi যা জরায়ুর আবরন ভেদ করে এর সাথে এঁটে থাকে এবং তৈরী করে প্রয়োজনীয় পুষ্টি। গর্ভাশয়ের করিওনিক ঝিল্লিকে পরিবেষ্টন করে থাকে রক্তের আনুবীক্ষণিক স্তর। ভ্রূণবৃদ্ধির এ পর্যায়ে রক্ত নিশ্চল থাকে, শিরা-উপশিরায় রক্তের কোন রকম আদান-প্রদান হয় না। কিন্তু ক্ষুদ্রাকৃতির আনুবীক্ষণিক ব্লাস্টোসিস্ট ঠিকই রক্তের চুইয়ে পড়া পুষ্টিবিধায়ক থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে নিতে পারে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে এ ব্লাস্টোসিস্টকে অতি ক্ষুদ্রাকার রক্তপিন্ডের মত দেখায়। আর এ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানটি ২০শ শতাব্দীর সংযোজন। অন্যদিকে কুরআনের আয়াতে চৌদ্দ'শ বছর আগেই এর চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে,

"অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিন্ডে, অতঃপর রক্তপিণ্ডকে পরিণত করি গোশ্‌তপিন্ডে এবং গোশ্‌তপিণ্ডকে পরিণত করি হাড়সমূহে। অতঃপর হাড়সমূহকে ঢেকে দেই গোশ্‌ত দ্বারা; অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রূপে; অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান!" (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, মু'মিনুন:১৩-১৪)

উপরের আয়াতে যে বর্ণনা দেখা যায় তার যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ ২০শ শতাব্দীর আবিষ্কার – বিন্দুর মত ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থা, জরায়ু-গাত্রের সাথে আঠার মত

লেগে থাকা ব্লাস্টোসিস্ট, আনুবীক্ষণিক ব্লাস্টোসিস্টের রক্তপিণ্ডের মত চেহারা। ভ্রূণবিকাশের বিভিন্ন পর্যায় এ আয়াতে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। কারণ আরবী শব্দ 'আলাকা' (যাকে রক্তপিণ্ড বলে অনুবাদ করা হয়েছে) সত্যিকার অর্থে তিনটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে - প্রথমতঃ রক্তের পিণ্ড, দ্বিতীয়তঃ জোঁকের মত চেহারা, আর তৃতীয়তঃ লেগে থাকা বা ঝুলে থাকা[136]। আর সত্যি সত্যি এ পর্যায়ে মানব ভ্রূণকে আকার এবং গঠনের দিক দিয়ে ঠিক জোঁকের মতই দেখায়।

ডঃ কিথ ম্যুর এমন এক ব্যক্তিত্ব যার অবদানকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কেউ কেউ হেয় করতে চাইবে। কিন্তু বিশ্বের সবচাইতে বড় শারীরস্থানবিদ (anatomist) এবং ভ্রূণতত্ত্ববিদের (embryologist) অবদানকে এক কথায় উড়িয়ে দেয়া সহজ বিষয় নয়। টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গব্যবচ্ছেদ ও কোষবিদ্যার সম্মানিত অধ্যাপক ডঃ কিথ ম্যুর, দীর্ঘ আট বছর ধরে চিকিৎসা বিভাগের প্রাথমিক বিজ্ঞান শাখার সহযোগী ডীন এবং অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে কর্তব্যরত ছিলেন। তিনি ১৯৮৪ সালে Canadian Association of Anatomists এর পক্ষ থেকে কানাডায় অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যার সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন পুরস্কার J.C.B. গ্রান্ট এওয়ার্ড লাভ করেন। এছাড়া তিনি ছিলেন কানাডিয়ান ও আমেরিকান শারীরবিদদের আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ এবং জীববিজ্ঞান পরিষদ কাউন্সিলের (the Council of the Union of Biological Sciences) পরিচালক। তিনি ভ্রূণবিদ্যার উপর *The Developing Human* শিরোনামে যে বইটি লিখেছেন সেটি অসামান্য গুরুত্বের কারণে বিশ্বের মোট আটটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আর ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত এ বইটির তৃতীয় সংস্করণে ইসলামিক ব্যাখ্যাও সংযোজিত হয়েছে। এ সংস্করণে ডঃ ম্যুর কুরআনে উল্লেখিত ভ্রূণবিকাশের বর্ণনার সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রাপ্ত তথ্যের নিবিড় সম্পর্কের উপর মন্তব্য করেছেন। "আধুনিক ভ্রূণবিদ্যার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ারও বহু বছর আগে, সপ্তম শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ ভ্রূণতত্ত্ব নিয়ে কিছু নিখুঁত ও নির্ভুল বর্ণনা"[137] সম্পর্কে তিনি তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

---

[136] Lane, Edward William. Book I, Part 5, p. 2134, column 3.

[137] Moore, Keith L. 1983. *The Developing Human, Clinically Oriented Embryology, With Islamic Additions*. 3rd ed. Jeddah: Dar Al-Qiblah with permission of W.B. Saunders Co. Foreword.

ডঃ ম্যুরের মতে, কুরআনে সুরাহ মু'মিনুনের ১৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত 'মুদগাহ্' শব্দটির অর্থ প্রকৃতপক্ষে 'চর্বিত পিণ্ড'। তিনি এ ব্যাপারটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে - নরম ময়দার ছাঁচে কাঁমড় বসালে ঠিক যেরকম দাঁতের ছাপ বসে যায়, ভ্রূণবিকাশের এ পর্যায়ে ভ্রূণের কর্তিত বাঁকানো আকৃতিকে অনেকটা সেরকম দেখায়।

"...অতঃপর রক্তপিণ্ডকে পরিণত করি গোশ্তপিণ্ডে এবং গোশ্তপিণ্ডকে পরিণত করি হাড়সমূহে। অতঃপর হাড়সমূহকে ঢেকে দেই গোশ্ত দ্বারা..." (মু'মিনুন:১৪) - কুরআনের এ আয়াত মানবদেহে মাংস তৈরীর আগে কোমলাস্থি তৈরীর পর্যায়ক্রমিক ধারা যথার্থভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

এরপর বলা হয়েছে,*"....অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রূপে; অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান!" (মু'মিনুন:১৪)"*। এ আয়াতের উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এটাই যে, অপরিবর্ধিত ভ্রূণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ৮ম সপ্তাহে সম্পূর্ণ বিকশিত ভ্রূণে (fetus) রূপ নেয় যার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ মানবদেহের সবগুলো বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকে।

কুরআনে আরো বলা হয়েছে,

"....তারপর শুক্র হতে, তারপর রক্তপিণ্ড হতে, তারপর পূর্ণাকৃতি বা অপূর্ণাকৃতি মাংসপিণ্ড হতে,...."। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, হাজ্জ:৫)

এ আয়াত সম্ভবতঃ ইঙ্গিত বহন করছে যে, ভ্রূণবিকাশের এ পর্যায়ে কোন কোন টিস্যু স্বতন্ত্র রূপে থাকে, আবার কোন কোনটি থাকে না।

এভাবে কুরআনের আয়াত নিয়ে ক্রমাগত বিশ্লেষণ চালিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু তাতে আলোচনা খুব দীর্ঘ হয়ে যাবে। আর সেই সমস্ত আলোচনা এ বইয়ের মূল উদ্দেশ্যও নয়। যারা এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে আগ্রহী তাদের জন্য ডঃ ম্যুরের বইয়ের পাশাপাশি আরো একটি বই হল ডঃ মোহাম্মদ আলী আকবরের লেখা *Human Development, As Revealed in the Holy Quran and Hadith,* এ বইটি ইসলামী বইয়ের দোকানে পাওয়া যাবে।

উপসংহারে বলা যায় যে, উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলোর কোনটিই ১৭শ শতকে অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের আগে জানা সম্ভব ছিল না। এন্টনী ফন লিউয়েনহুকের

এ আবিষ্কার সর্বপ্রথম এ সম্ভাবনাকে আমন্ত্রণ জানায়। আনুবীক্ষণিক আকারের কারণে এ সমস্ত ব্যাপার এর আগে মানুষের দৃষ্টির অগোচরে লুক্কায়িত ছিল। এখন অন্যান্য ধর্মীয়দলগুলো ডঃ ম্যুরের মত আরো অনেকের মতামতের গ্রহণযোগ্যতা প্রত্যাখ্যান করতে পারে তার কারণ হল, তিনি এমন কিছু প্রমাণ তুলে ধরেছেন যা এদের কাছে মোটেই পছন্দনীয় নয়। আর এটা বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, এরকম একজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব এ ব্যাপারে আপোষ করবেন। আরেকটি বিষয় হল, ডঃ ম্যুরের বইটি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত এবং আরবীভাষীদের দেশে এর সহজলভ্যতা অত্যন্ত সীমিত। সুতরাং বিদ্যাগত সত্যানুসন্ধানের আন্তরিক প্রচেষ্টা ব্যতীত ডঃ ম্যুর উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ বইটি লিখেছিলেন, এমনটা ভাবা ঠিক হবে না।

অন্যান্য

মধু একটি অসাধারণ গুণসম্পন্ন বস্তু। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী মধু হল এমন এক উপাদান, *"ওর (মৌমাছির) উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগমুক্তি..."। (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, নাহল:৬৯)*

Encyclopaedia Britannica'র ভাষায়,

"মধু কিছুটা অম্লীয়, এতে আছে মৃদু জীবাণুনাশক (Antiseptic) উপাদান যা ক্ষত ও পোড়ার চিকিৎসায় বহুকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। খুব সহজে পরিপাক হয় এমন খাদ্যগুলোর মধ্যে মধু অন্যতম। রুটি জাতীয় খাদ্য, মিছরি, ফল থেকে খাদ্যজাত দ্রব্য, শস্য থেকে তৈরী খাদ্য (যেমন সিরিয়াল) ও ঔষধ প্রস্তুতিতে এর ব্যবহার সুবিদিত"।[138]

ঠান্ডা ও এলার্জিজনিত রোগের ঔষধ তৈরীতে বহুল ব্যবহৃত মধুর চিকিৎসা গুণ সাংঘাতিক। হাদীস থেকে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক অসুস্থতার জন্যে আছে প্রতিষেধক চিকিৎসা ব্যবস্থা। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেছেন, "আল্লাহ (ﷻ) এমন কোন রোগ দেননি যার কোন চিকিৎসা তিনি পাঠাননি"।[139] এ ছিল যখন তাঁর

---

138 Encyclopaedia Britannica. CD-ROM

139 সহীহ আল-বুখারী, রিয়াদ; দারুস-সালাম. ভলিউম ৭, হাদীস # ৫৬৭৮, পৃ. ৩২৬।

বিশ্বাস তখন স্বাভাবিকভাবে যে কেউ আশা করতে পারে যে, মুহাম্মদ (ﷺ) কুরআনের রচয়িতা হলে এ বইতে রোগপ্রতিকারের ব্যবহারিক জ্ঞান সম্পর্কেও কিছু অনুচ্ছেদ পাওয়া যাবে। অথচ সেরকম কিছু চোখে পড়েনা। বরং চিকিৎসা ও আরোগ্য সম্পর্কে কুরআনে কোন রকম বর্ণনার অনুপস্থিতি নজর কাড়ার মত। ডঃ মুহাম্মদ মুহসিন খানের (ইংরেজী ভাষায়) অনূদিত শুধুমাত্র সহীহ আল-বুখারীর সপ্তম ভলিউমের চিকিৎসা সংক্রান্ত অধ্যায়েই এ বিষয়ের উপর কমপক্ষে আটান্নটির মত হাদীস সংযোজিত হয়েছে। এছাড়া প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপদেশ সংক্রান্ত হাদীসের সংখ্যা এত বিপুল যে এ নিয়ে অসংখ্য বই-পত্র লেখালেখি হয়েছে। সুতরাং এটা ভাবা মোটেও সঙ্গত হবে না যে, মুহাম্মদ (ﷺ) এর চিন্তাভাবনাতে রোগ-নিরাময়ের কোন স্থান ছিল না। বরং তিনি এ বিষয়টি নিয়ে বেশ ভালই চিন্তাভাবনা করতেন। তিনি যদি কুরআনের রচয়িতা হয়েই থাকেন তাহলে মনে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, বিষয়টি নিয়ে মুহাম্মদ (ﷺ) এর এতখানি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও কুরআনে তার কোন প্রতিফলন নেই কেন? বরং এর বিপরীতে, কুরআনে রোগ-প্রতিরোধ সম্পর্কে একটি মাত্র আয়াতের উল্লেখ দেখা যায় আর তা হচ্ছে, মধুর রোগ নিরাময় গুণের বর্ণনা। আর এটাও লক্ষ্য করার মত বিষয় যে, পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত রোগ-নিরাময় সম্পর্কিত একমাত্র তথ্যটি পুরোদস্তুর সঠিক।

Fingerprinting বা 'আঙ্গুলের ছাপ' একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে জন্ম নিয়েছিল ১৯ শতকের শেষের দিকে। ১৮৮০ সালে বিজ্ঞান বিষয়ক ব্রিটিশ পত্রিকা 'Nature' মানুষের হাতের আঙ্গুলের অনন্য প্রকৃতির উপর প্রথম আলোকপাত করে। পরবর্তীতে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটন আঙ্গুলের ছাপ বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতির প্রস্তাব দেন। এ পদ্ধতিতে আঙ্গুলের ছাপের আবর্তন, চক্রাকার জালি ও পূর্ণবৃত্ত পরীক্ষা করে দেখা হয়। এভাবে ধীরে ধীরে আঙ্গলের ছাপ পরীক্ষার জন্যে 'গ্যালটন-হেনরী' নামের পদ্ধতি উন্নতি লাভ করে। ১৯০০ সালে এ পদ্ধতি প্রকাশিত হলে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড তা লুফে নেয় এবং এর ব্যবহারিক প্রয়োগ শুরু করে। আজ সারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আরো উন্নত ও পরিমার্জিত রূপে এ পদ্ধতির ব্যবহার ছড়িয়ে পড়েছে। আর পুরো বিজ্ঞানটি গড়ে উঠেছে প্রতিটি মানুষের আঙ্গুলের ছাপের অমিলের উপর ভিত্তি করে। কেননা দুই ব্যক্তির আঙ্গুলের ছাপ কখনও

একরকম হয় না। অথচ দুর্নীতি তদন্তের জন্যে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা এ বিজ্ঞান শুরু করার প্রায় ১৩০০ বছর আগে পবিত্র কুরআনে এ সূক্ষ্ম বিষয়টি প্রচ্ছন্নভাবে এসেছে। কুরআনের এক আয়াতে কিয়ামতের দিন মানবজাতির পুনরুত্থান নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহর (ﷻ) সৃষ্টিক্ষমতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রশ্ন করা হয়েছে,

"মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার হাড়গুলো কোনক্রমে একত্র করতে পারব না? বরং হ্যাঁ, অবশ্যই আমি তার অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম।" (ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, কিয়ামাহ্:৩, ৪)

আলোচিত প্রমাণের সারসংক্ষেপ

> "Knowledge is what we get when an observer, preferably a scientifically trained observer, provides us with a copy of reality that we can all recognize."
> --Christopher Lasch, "The Lost Art of Political Argument," *Harper's*, Sept. 1990

"কোন পর্যবেক্ষক, বিশেষ করে বিজ্ঞানে দীক্ষিত কোন পর্যবেক্ষক, সহজেই চেনা যায় এমন কোন বাস্তব নমুনাসহ আমাদের সামনে যা উপস্থাপন করে - তাই হল জ্ঞান"।

> --- ক্রিস্টোফার ল্যাশ, *"The Lost Art of Political Argument,"* *Harper's*, Sept. 1990

মহিমান্বিত ধর্মগ্রন্থ কুরআন নিয়ে স্বয়ং কুরআনের আয়াত,

"কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না - অগ্র হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ"।
(ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, হা-মীম আস্‌সাজদাহ্‌: ৪২)

কুরআনে দৃঢ় ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, এর বাণী অভ্রান্ত, নির্ভুল; সেই সাথে এতে সমস্ত অমুসলিমের প্রতি অন্ততঃ একটি ভুলও খুঁজে বের করার বলিষ্ঠ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে। কোন কোন সমালোচক বলে থাকে যে, মুহাম্মদ (ﷺ) আসলেই অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন। এর উত্তরে ডঃ মরিস বুকাইলের মন্তব্য,

> "...কেউ কেউ খুব সহজে এ অলীক প্রস্তাবনা তুলেন যে, মুহাম্মদ খুব সূক্ষ্মদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন, যিনি নিজস্ব চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে (কুরআনের) সবকিছু উদ্ভাবন করেছেন। অথচ আধুনিক বিজ্ঞান এসব তথ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে অন্ততঃ কয়েক শতাব্দী পরে। এ ধরণের অবাস্তব দাবী করতে গিয়ে লোকেরা মাঝে মাঝে আরো একটি দিক উল্লেখ করতে ভুলে যায়, আর তা হচ্ছে - মানুষ যত বড় চিন্তাবিদ ও প্রতিভাবানই হোক না কেন, অসামান্য সাফল্যের পাশাপাশি তারা বড় রকমের ভুল-ভ্রান্তিও কিন্তু করে থাকেন"[140]।

---

[140] Bucaille, Maurice. p. 162.

অথচ মহিমাময় কুরআনে 'বড় রকমের ভুল' তো দূরের কথা, সূক্ষ ভুলও কোথাও চোখে পড়ে না। কুরআনের বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা ও শিক্ষার বৈচিত্র বিবেচনা করলে সামান্যতম ত্রুটি না থাকার এ ব্যাপারটি আরো বেশী বিস্ময়কর মনে হয়। (চৌদ্দ'শ বছর আগে) কুরআনের কিছু কিছু আয়াতের নিগুঢ় অর্থ ঐ যুগের মানুষের কাছে প্রচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট ছিল – এটা ধরে নেয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়[141]। সে সময় ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্বল্পতা এর একটি কারণ। তাছাড়া কুরআনে বর্ণিত অনেক চিন্তা-ধারণা সে সময়ে সমাজে প্রচলিত চিন্তা-ধারণা, প্রথার সাথে ছিল বিরোধিতামূলক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ সমস্ত বর্ণনা বৈজ্ঞানিক মহলে তর্ক-বিতর্কের ঝড় তুলেছে। তাই একটি প্রশ্ন মনে উঁকি দেয় - মুহাম্মদ (ﷺ) যদি প্রতারকই হন, তবে কেন তিনি এমন যুগবিরোধী বিতর্কিত দাবী ও ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করে নিজেকে সমালোচনার পাত্র বানাবেন?

মুহাম্মদ (ﷺ) প্রবঞ্চক হয়ে থাকলে, তাঁর পক্ষে সেই চৌদ্দ'শ বছর আগে নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পর্কে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করা কী করে সম্ভব হল - এ ব্যাপারটি অবশ্যই চিন্তা উদ্রেককারী। ডঃ মরিস বুকাইল বলেছেন,

> "বৈজ্ঞানিক তথ্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়িয়ে, ১৪০০ বছর আগে এক ব্যক্তি কী করে আধুনিক নানা তথ্যের এতটা সংশোধন করে গেছেন এবং এমন কিছু মন্তব্য রেখেছেন যা আজকের বিজ্ঞান কেবল এ কিছুদিন আগে যাচাই করতে পেরেছে। এ ধরণের অবাস্তব প্রস্তাবনা (যে, সমস্ত কিছু তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবন) সম্পূর্ণ অসমর্থনীয়"[142]।

অমুসলিমরা কখনও কখনও আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে 'আমাদের গ্রন্থ বনাম তোমাদের গ্রন্থ' জাতীয় যুক্তির আশ্রয় নিয়েছে। তাদের যুক্তি হল, 'আমাদের গ্রন্থ বলে এই, আর তোমাদের গ্রন্থ বলে ঐ। আমাদের গ্রন্থ সঠিক, অতএব

---

[141] কুরআন মূলতঃ হেদায়েতের নির্দেশিকা। কোন কোন আয়াতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের কাছে অজানা রয়ে গেলেও আয়াতগুলোর মাধ্যমে যে হেদায়েত উদ্দেশ্য তা ঠিকই তারা উপলব্ধি করেছিলেন, যদিও এ সমস্ত আয়াতের অন্য একটি দিক (বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা) সম্পর্কে আজকের যুগের মানুষ আরো বেশী জানতে পেরেছে। মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবারা (রাঃ) কুরআনের আয়াত সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী ছিলেন এবং বুঝা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে কুরআন অবতরণের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য তারা পূরণ করেছিলেন। - (অনুবাদক)

[142] Bucaille, Maurice. p. 148.

তোমাদেরটি ভুল'। তাদের এ যুক্তি শুধুমাত্র তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যদি উভয় গ্রন্থ বৈধতার মাপকাঠিতে সমান নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়। এখন বিজ্ঞ পাঠকদের উপরই এ বিচারের ভার ছেড়ে দেয়া হল যে, কোন্ ধর্ম গ্রন্থটি বেশী নির্ভরযোগ্য।

অমুসলিমরা ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে নানা রকম আবেগপ্রবণ যুক্তি দেখিয়ে থাকে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাদের সমালোচিত নিয়ম-নীতিগুলো আসলে (ইসলামের নামে) প্রচলিত কিছু স্থানীয় ও সামাজিক প্রথা, প্রকৃত ইসলামের সাথে যার কোন সম্পর্কই নেই। এগুলো বাদ দিলে, অন্যান্য যে সব বিষয় নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে যেমন, (পুরুষের জন্য) একাধিক বিয়ের অনুমতি, (নারীদের জন্যে) পর্দার আদেশ, পারিবারিক ভূমিকা, খাদ্যের ব্যাপারে রক্ষণশীলতা ইত্যাদি বিষয়ের ভিত্তি ধর্মীয়। এ সব ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ পাশ্চাত্যের লাগামহীন জীবন-প্রণালীতে অভ্যস্ত মানুষের কাছে অবান্তর মনে হয়। অথচ তাদের এ ধরণের পক্ষপাতমূলক পছন্দ-অপছন্দ কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ হতে পারে না। বরং, নিজ 'ভাল-লাগা, না লাগার' ভিত্তিতে এরকম বাছ-বিচার অত্যন্ত বিপদজনক। কুরআনে আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

"...বস্তুত তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছো যা তোমাদের পক্ষে বাস্তবিকই মঙ্গলজনক, পক্ষান্তরে তোমরা এমন বিষয়কে পছন্দ করছো যা তোমাদের জন্যে বাস্তবিকই অনিষ্টকর এবং আল্লাহই অবগত আছেন আর তোমরা অবগত নও"।
(ভাবার্থ, কুরআনুল করীম, বাকারা:২১৬)

নিজের পছন্দ-অপছন্দকে বেশী প্রাধান্য দেবার প্রবণতা, প্রজ্ঞাময় স্রষ্টার মনোনীত পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করে দিতে পারে।

যাহোক, এতসব তাত্ত্বিক যুক্তি দাঁড় করাবার হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও কুরআনের অন্ততঃ একটি ভুল খুঁজে বের করার কিংবা কুরআনের মত দশ-শব্দবিশিষ্ট একটি সুরাহ রচনা করে আনবার চ্যালেঞ্জ কিন্তু অব্যর্থই থেকেই যায়। এ চ্যালেঞ্জের মুখে কোন প্রচেষ্টাই এখনও পর্যন্ত সাফল্যের মুখ দেখেনি। সুতরাং কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ অবশ্যই বিশেষ গুরুত্ব ও বিবেচনা পাওয়ার যোগ্য।

এবার কিছু পরিসংখ্যানমূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। একটি ব্যাপার উপেক্ষা করার উপায় নেই, তা হল – কুরআনে উল্লেখিত বেশকিছু ভবিষ্যদ্বাণী সে সময়ের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। যেমন, রোম বনাম পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল, আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর প্রতি জাহান্নামের

দন্ডাদেশ ইত্যাদি। এগুলো এমন ধরণের ভবিষ্যদ্বাণী যা সঠিকভাবে ফলে যাবার সম্ভাবনা খুবই কম। তাসত্ত্বেও যদি ধরে নেয়া হয় যে, প্রতিটি ঘটনা বাস্তবায়িত হবার সম্ভাবনা শতকরা ৫০ ভাগ তবুও এ ধরণের যতগুলো ভবিষ্যদ্বাণী কুরআনে স্থান পেয়েছে হিসাব করলে দেখা যাবে তার সবকয়টি সঠিক প্রমাণিত হবার সম্ভাবনা আরো ক্ষীণ। উদাহরণস্বরূপ, দু'টি ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে যাদের প্রত্যেকের সম্ভাব্য দু'টি পরিণতির মধ্যে যে কোন একটি ঘটবার সুযোগ আছে - তাদের (ভবিষ্যদ্বাণী দু'টির) উভয়কে এক সঙ্গে হিসাবে ধরলে উভয়ের সঠিক প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনা একের মধ্যে চার। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে তিন রকমের ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে - প্রথম ভবিষ্যদ্বাণীটি সঠিক ও দ্বিতীয়টি ভুল, অথবা প্রথমটি ভুল ও দ্বিতীয়টি সঠিক কিংবা উভয়ই ভুল। ফলে উভয় ভবিষ্যদ্বাণীই সঠিক প্রমাণিত হবার সম্ভাবনা একের মধ্যে চার।

একইভাবে তিনটি ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যেকের সঠিকভাবে ফলে যাবার সম্ভাবনা – আটের মধ্যে এক। এভাবে ভবিষ্যদ্বাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে এদের প্রতিটির জন্য সঠিক হবার সম্ভাবনা ক্রমে অর্ধেক হতে থাকে। সুতরাং কুরআনের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী একসঙ্গে বিবেচনা করলে, প্রত্যেকটির সঠিক হবার সম্ভাবনা আরো কমে যায়। এতক্ষণের আলোচনায় কুরআনে বর্ণিত ষাটটির বেশী প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। এ যাবৎ ইসলাম ধর্মের মনীষীরা যতগুলো প্রমাণ বের করেছেন এ প্রমাণগুলো তার সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। যাহোক এ ষাট'টি প্রমাণের প্রত্যেকটির সঠিক হবার সম্ভাবনা যদি ৫০% ও ধরা হয়, তবে হিসাবে সবকয়টি সঠিক প্রমাণিত হবার সম্ভাবনা দাঁড়াবে $(১/২)^{৬০}$ অর্থাৎ, ১,০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০ এর মধ্যে ১ এরও কম। প্রসিদ্ধ একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন এক ধর্মগ্রন্থকে কেন্দ্র করে যার তথ্য-প্রমাণ কাকতালীয়ভাবে মিলে যাবার সম্ভাবনা নেহায়েতই নগণ্য, এ বিষয়টিতে আশ্চর্য হবার তেমন কিছু নেই। বরং আশ্চর্য হতে হয় তাদের দেখে যারা, এরকম একটি অনন্য বাস্তবতাকে অস্বীকার করে চোখ বুঁজে থাকবার ভান করেন।

সবরকম প্রমাণ উপস্থাপন করার পরও অনেক পশ্চিমা সমালোচক আপত্তি তুলে বলে যে, বাইবেলের চরণ ও রচনাভঙ্গী তাদের যেভাবে আকর্ষণ করে, কুরআনের ভাষা তেমনভাবে করে না। এ প্রসঙ্গে দু'টি বিষয় মনে রাখতে হবে। প্রথমতঃ যে সমস্ত বিশেষজ্ঞরা আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন এ ব্যাপারে তাদের মতামত গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখার যোগ্য। তাদের কয়েকজনের এ ধরণের কিছু মন্তব্য তুলে ধরা হল,

"যারা কুরআনের মূল আরবী ভাষার সাথে সুপরিচিত তারা এ ধর্মগ্রন্থটির সৌন্দর্যের প্রশংসায় একমত। এর রচনাশৈলী এত মহিমাময় যে, কোন ইউরোপীয় ভাষার অনুবাদ থেকেই কুরআনের চমৎকারিত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করা যায় না"।[143]

"সত্যি বলতে, এমন কোন বোধশক্তিসম্পন্ন লেখক আমার চোখে পড়েনি যিনি কুরআনের মহিমা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। একে অলঙ্কারপূর্ণ আরবী ভাষার আদর্শ নমুনা ধরা হয়..."।[144]

"মূল আরবী ভাষার কুরআনে আছে এক স্বতন্ত্র সৌন্দর্য ও আবেদন। এর সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থসম্ভারে সমৃদ্ধ চরণ এবং অত্যুচ্চ ভঙ্গীমা, ছন্দময় নাতিদীর্ঘ প্রগাঢ় বাক্যে রয়েছে প্রচন্ড মাত্রায় ভাব প্রকাশের শক্তি এবং বিস্ফোরিত উদ্দীপনা যা (অন্য ভাষায়) শাব্দিক অনুবাদের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার"।[145]

সুতরাং স্বাভাবিকভাবে বহু পশ্চিমা পাঠকের পক্ষে অনুবাদ থেকে মূল আরবী কুরআনের মহিমা ও ভাবালঙ্কার পুরোপুরি অনুভব করা সম্ভব না। এ সমস্যা আরো বেশী জটিল আকার ধারণ করে পশ্চিমা বইয়ের দোকানগুলোতে কুরআনের দুর্বল অনুবাদ গ্রন্থগুলোর সমারোহের কারণে। কুরআনের ইংরেজী অনুবাদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও সুপরিচিত হল আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী অনূদিত The Holy Qur'an, সহীহ ইন্টারন্যাশনাল অনূদিত The Qur'an, মুহাম্মদ আল হিলালী ও মুহাম্মদ মুহসিন খানের যৌথ উদ্যোগে অনূদিত (The Noble Qur'an) এবং মারমাদুক পিকথাল অনূদিত The Glorious Qur'an। এগুলো ছাড়া অন্যান্য অধিকাংশ অনুবাদে মুসলিম মনীষীদের যে উঁচুমানের পাণ্ডিত্য, তার ঘাটতি স্পষ্ট চোখে পড়ে। বস্তুনিষ্ঠ ও

---

143 Montet, Edward. 1929. Traduction Francaise du Couran. Paris. Introduction, p. 53.

144 Stubbe, Dr. Henry, M.A. 1975. An Account of the Rise and Progress of Mohamedanism, with the Life of Mahomet. Lahore; Oxford and Cambridge Press, p. 158.

145 Naish, John, M.A. 1937. The Wisdom of the Qur'an. Oxford. Preface, p. viii.

সাম্প্রতিক মত সম্পর্কে জানার ব্যাপারে আন্তরিক হলে কয়েকটি অনুবাদ এড়িয়ে চলা ভাল, যেমন, আলেকজাণ্ডার রস, জর্জ সেইল, রেভারেন্ড জে. এম রডওয়েল, এডওয়ার্ড হেনরী পামার ও রিচার্ড বেলের অনুবাদ।

তবে মনে রাখতে হবে যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অনুবাদও কুরআনের পূর্ণাঙ্গ মাধুর্য তুলে ধরবার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ পশ্চিমা পাঠকদের কাছে পরিচিত অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলোর সাথে কুরআনের পার্থক্য আছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক এ. জে. আরবেরীর উক্তি,

> "না, এ ত্রুটি যতটা না অনুবাদের, তার চেয়েও বেশী যে পদ্ধতিতে অনুবাদটি পড়া হয়ে থাকে তার। সমস্ত সমস্যার মূল হচ্ছে, সাধারণ পাঠক এমনকি বিজ্ঞ পাঠকও ভালমত জানে না ঠিক কিভাবে কুরআন পড়তে হবে।
>
> সবার আগে পশ্চিমা পাঠককে এ ভুল ধারণা থেকে মুক্ত হতে হবে যে, কুরআন আর বাইবেল একই রকম গ্রন্থ। এরকম ভুল ধারণা জন্ম নেয়া অস্বাভাবিক কিছু না, বিশেষ করে যখন কেউ (বাইবেলের মত) কুরআনের পাতায় দেখতে পায় আদম (ﷺ), ইব্রাহীম (ﷺ), মুসা (ﷺ), দাউদ (ﷺ), সোলায়মান (ﷺ), ইউনুস (ﷺ), ইউসুফ (ﷺ), আইয়ুব (ﷺ) - এ নামগুলো। ফলে ভুল বুঝাটা খুব স্বাভাবিক। তাছাড়া, বাইবেলের আঙ্গিকে করা (কুরআনের) অনুবাদগুলো এ ভুল শোধরানোর ব্যাপারে খুব একটা ভূমিকা রাখতে পারেনি। এ রকম ধারণায় প্রভাবিত হয়ে প্রথমদিকে পাঠকরা যখন কুরআন পড়া শুরু করে তখন নিদারুণ যেই ভুলটি করা হয় তা হল, তারা একসঙ্গে কুরআনের অনেকখানি বুঝে নিতে চায়। হয়তো কুরআনের কোন সুরাহ শুরু থেকে পড়া আরম্ভ করল, তারপর পরিচিত বিষয়বস্তু ও ভাবধারা দেখে মনে কোন রকম সন্দেহ উদ্রেক ছাড়াই সুরাহটি শেষ করল। এরপর এভাবে আরো কয়েকটি সুরাহ যখন পড়া হল তখন, আপাতদৃষ্টিতে কুরআনের বিষয়বস্তুর অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন এবং বিভিন্ন সুরাহ'য় কোন কোন নির্দিষ্ট প্রসঙ্গ ও অভিব্যক্তির পুনরাবৃত্তি দেখে ক্রমশঃ সে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। এতদিন ধরে বাইবেলে পড়ে আসা *Kings* অথবা *Samuel* এর যে বাচনভঙ্গী, *Psalms* অথবা *Isaiah* 'র যে গতিময়তার সাথে সে পরিচিত ছিল, মনে মনে তার অভাব বোধ করতে শুরু করে। কুরআনের

স্বতন্ত্র ও অনবদ্য ভাষা-ভঙ্গীমা সম্পর্কে কোনরকম ধারণা না থাকার ফলে অনভিজ্ঞ পাঠক ছোটবেলা থেকে অতি পরিচিত বাচনভঙ্গীর সাথে একে তুলনা করতে শুরু করে। আর পরিশেষে সে কার্লাইলের সাথে একমত হতে বাধ্য হয়,

'কাব্য রচনার সাথে নানা দিক দিয়ে সাদৃশ্যযুক্ত কুরআন একসঙ্গে অল্প-অল্প করে গ্রহণ করাটা বিজ্ঞোচিত। এ 'অল্প'টুকুই গভীর মনোনিবেশসহ চিন্তাভাবনার দাবী রাখে এবং বুঝার জন্য তা একান্ত জরুরীও।...অতীত ধর্মগ্রন্থগুলোর ধারক হবার যে দাবী কুরআন করেছে[146] তার সঙ্গে পাঠক ধীরে ধীরে নিজেকে মানিয়ে নিতে শুরু করে। ফলে সে দেখতে পায়, কিভাবে কুরআন অতীতের সেই সমস্ত গ্রন্থের জ্ঞান ও বিষয়বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর এভাবে কুরআনে বিচ্ছিন্নভাবে উল্লেখিত বর্ণনাগুলো পরবর্তী পর্যায়ে এক সূতায় গাঁথা হয়ে অবিচ্ছিন্ন কাহিনীতে রূপ নেয়। এ পর্যায়ে পাঠক একটু একটু করে অনুসরণ করতে থাকে আস্তে আস্তে ভাঁজ খুলতে থাকা নব্যুয়তী শক্তির পূর্ণপ্রতিফলন। আর যখন ধর্মীয় বিধান ও আদেশ-নিষেধের প্রশ্ন আসে তখন সেগুলো আয়ত্ত করতে এবং মেনে নিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যায়'। ধৈর্য ধরে এ গ্রন্থটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে শেষ করার পর যেন এটা মনে না করা হয় যে, সে এর সম্পর্কে সব জেনে গেছে ঠিক যেভাবে একজন মুসলিম কুরআন সম্পর্কে জানে। কিংবা একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি যেভাবে কুরআনকে উপলব্ধি ও মূল্যায়ন করে, সে-ও একইভাবে এর প্রকৃত মর্মার্থ উপলব্ধি ও মূল্যায়নে সক্ষম হবে। যেখানে পূণ্যবান মুসলিমরা শৈশব থেকে সম্পূর্ণ কুরআনকে কণ্ঠস্থ করার মত কঠিন

---

146 কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে (ভাবার্থ),

"আর আমি এ কিতাব (কুরআন)-কে তোমার প্রতি নাযিল করেছি যা হক্বের সাথে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরও সত্যতা প্রমাণকারী এবং ঐ সব কিতাবের সংরক্ষকও"। (মায়িদা:৪৮)

ইবন কাসীর (রহ) এ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, "এ কিতাব অর্থাৎ কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর আমনতদার। অর্থাৎ এতে যা কিছু রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে সেগুলোই ছিল।....এ কুরআন ঐ সব কিতাবের সত্যসাক্ষী এবং ঐগুলোকে আবেষ্টনকারী। যে সব মঙ্গলময় ও কল্যাণকর বিষয় ঐ সব কিতাবে মিলিতভাবে ছিল ঐ সমূদয়ই এককভাবে এ সর্বশেষ কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে"। - (অনুবাদক)

কাজে সংকল্পবদ্ধ ও নিষ্ঠাবান, সেকথা চিন্তা করে কোন অমুসলিমের শুধুমাত্র কুরআন পড়ে শেষ করেই এরকম ধারণা থেকে নিজেকে বিরত রাখা উচিত। যখন সে কুরআনের আয়াত পড়ছে অথচ একজন বিশ্বাসীর জন্য পড়বার দরকার পড়ে না, কারণ সেই আয়াত ইতোমধ্যে তার হৃদয়ে সংরক্ষিত আছে। এরকম অনভিজ্ঞ, অদীক্ষিত পাঠক যত নিষ্ঠাবান ও আন্তরিকই হোক না কেন, একজন বিশ্বাসীর হৃদয়ে কুরআন যেরকম প্রশান্তি তৈরী করে, তা থেকে সে বঞ্চিত থাকে। তার কারণ, কাগজ-কলম আর অপরিচিত প্রকাশভঙ্গী - এ দু'টি অন্তরালে সে আটকা পড়ে আছে। কুরআন হল আরবী ভাষায় অবতীর্ণ স্রষ্টার ওহী। সুদক্ষ অনুবাদের ক্ষেত্রেও মূল ভাষার আবেগ ও আবেদন প্রায় সবটুকু উধাও হয়ে যায়। মুসলিমদের কাছে কুরআন হল মুহাম্মদ (ﷺ) এর কাছে অবতীর্ণ স্রষ্টার প্রত্যাদেশ। আর সবসময়ই নিষ্ঠাবান ইসলামী প্রথা এ মনোভাব বজায় রেখেছে যে, কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ এবং অবিভাজ্য গ্রন্থ। কুরআন আগাগোড়া সবটুকু জুড়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ, আর এর প্রতিটা অংশ পুরো গ্রন্থ জুড়ে একই ধারা বজায় রেখেছে। কুরআন আরবী অভিব্যক্তিতে মানবজাতির প্রতি স্রষ্টার পাঠানো সর্বশেষ বার্তা।

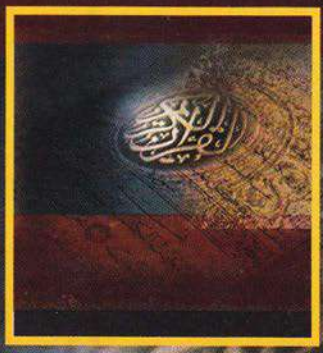
এ সমস্ত বিষয় মনে রেখে যখন কুরআনের মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করা হয়, তখন আগের এ অভিযোগ নিস্ফল হয়ে যায় যে - কুরআনে একই বিষয় অপ্রাসঙ্গিকভাবে বার বার এসেছে। সত্য বার বার উচ্চারিত হলে ম্লান হয় না, বরং পুনরাবৃত্তির ফলে প্রতিবার তা আরো স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আর যে গ্রন্থের সবটুকুই সত্যি সেখানে যুক্তিহীনতা ও অবোধ্যতা বিন্দুমাত্র অনুভূত হয় না"।[147]

উপরের বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে যারা কুরআন পড়ে এর মর্ম পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে চায় তাদের জন্য পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, বার্তা এবং বার্তাবাহক ওতপ্রোতভাবে জড়িত দু'টি বিষয়। তাই বার্তার অকাট্যতা পরীক্ষা করার পাশাপাশি যিনি[148] সেই বার্তা বহন করে এনেছেন, সেই ব্যক্তিত্বের জীবনী সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করে দেখা সত্য সন্ধানীদের জন্য অপরিহার্যরূপে একটি বিবেচ্য বিষয়।

---

147 Arberry, A. J. *The Holy Koran, An Introduction with Selections.* pp. 25-27.

148 মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব (N)



"মুসলিমরা দাবী করে কুরআন শুরু থেকে এখন পর্যন্ত অবিকৃত ও অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে। এখন যে কারো এ রকম দাবীর প্রামাণিক দলিল নিয়ে জিজ্ঞাসু হবার অধিকার আছে। তাছাড়া প্রমাণ ছাড়া কোন দাবী কখনও গ্রহণযোগ্য হয় না। .....

যারা সত্য অনুসন্ধানে আন্তরিক তারা খুঁজে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের চাদর, যা তাদের প্রত্যয়কে উষ্ণতা দেবে। এমন চাদর যা শুধু দূর থেকে আকর্ষণই করে না বরং ব্যক্তির আধ্যাত্মিক চাহিদাও পূরণ করে। এ বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে এমনই কিছু প্রমাণ অন্তর্ভুক্ত করে কুরআনের বিভিন্ন অলৌকিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা মুসলিমদের বিশ্বাসকে স্বস্তি ও উষ্ণতা দেবার জন্য যথেষ্ট হবে বলে আশা করি।"

ডঃ লরেন্স বি. ব্রাউন